শেষ রূপকথা

আবুল বাশার

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রকাশ কেন লুকিয়ে থাকে

ইরিথিজম। কৃষ্ণ জানে, এটি অতি ভয়ানক অসুখ। কিন্তু নই ধরনের কোনও অসুখের কথা ভাবে কেন সে? সে তার নিজের কারখানায় ঢুকতে ইদানীং বেশ ভয় পায়। লক্ষ করেছে, কারখানায় নিয়ম করে ঢুকে বেশিক্ষণ থাকলে এবং সপ্তাহখানেক এইভাবে কাটালে তার মাথার চুল সাদা হয়ে যায়।

একবার তো মাথার চুল সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গিয়েছিল। চুল সাদা হয়ে যাওয়ার ঘটনা সে সুদেব বা শংকর কাউকে বোঝাতে পারেনি। বোঝাতে চেষ্টাই করেনি। ওরা নিজে থেকে বুঝলে বুঝত, কিন্তু চুল দেখে চমকে ওঠার বান্দাই ওরা নয়। ওরা রসিকতা করে বলেছে, তুমি কিন্তু বুড়ো হয়ে যাচ্ছ শুভেন্দু। চুল পেকে গেল।

—হ্যাঁ। চুল কিন্তু খামোকা পাকে না সুদেব।

—হেঁ হেঁ। বয়েস হচ্ছে।

সুদেবের হাসির কেতা দেখে শুভেন্দু শরফে কৃষ্ণের ঘেন্না হল। কৃষ্ণের আর কথা বলতেই ইচ্ছে করল না। সে শুধু জানে, এদের বোঝানো যায় না। এরা নাফা বোঝে, জীবন বোঝে না।

কারখানায় তিনজনের অংশ আছে। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের বিনিয়োগ সমান নয়, শংকরের জমি ছাড়াও কিছু টাকাপয়সার পুঁজি রয়েছে, সুদেব ঢেলেছে বেশি অর্থ, শুভেন্দুর ভাগ সবচেয়ে কম। লাভের অংশ তাই তিনজনের সমান নয়। শুভেন্দুর বুদ্ধিবিদ্যা ছাড়া এ কারখানা হত না। ফলে বিদ্যার ভাগ দিয়ে সে বাকি দুই অংশীদারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কৃষ্ণ জানে, বিদ্যাই এখানে সবচেয়ে কমজোরি পদার্থ। মানুষ মনে করে না, জ্ঞান দিয়ে কোনও কিছু চলে। অর্থাৎ চললেও সে কথা সর্বক্ষণ মনে রাখার প্রয়োজন দেখে না।

চুল সাদা হয়ে গেল, এ তার বুদ্ধিজ্ঞানের পরিপক্ক পরিণাম নয়। এ যে ধাতব বিষের কাজ পার্টনাররা বুঝতেই চাইবে না। মার্কারি একটি কুখ্যাত ধাতু-গরল। তার ধারণা, এখানে প্রস্তুত যৌগটি, নাম যার মারকিউরাস ক্লোরাইড, তার বিষক্রিয়া চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে যেতেই পারে এবং জুডিসিয়াস চয়েস অর্থাৎ নির্ধারিত মাত্রা অতিক্রম করতেই পারে—করলে ধাতুবিষে মানুষ অবশ্যই আক্রান্ত হবে। মাত্রার তারতম্যে এ যৌগে ওষুধ প্রস্তুত হয়, নয়তো তা গরল হয়ে যায়। শুধু তাই-ই নয়, এখানে কীই না হয়! কত বিষ, কত ধোঁয়া এখানে! মানুষের যেকোনও বড় পাপের চেয়ে গভীর। কারখানা খুব ছোট, কিন্তু তার স্পর্ধা সাংঘাতিক। সুদেব বুঝলেও শংকর এসব বুঝবে না। রেমন্ড চাং-এর কেমিস্ট্রি সে পড়েনি, সে জানে না মার্কারি টক্সিসিটি কাকে বলে। অথবা লেড টক্সিসিটি (Lead Toxicity)- র কথাও কি সে

শুনেছে! এর প্রভাবে মানুষের মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রই ঢিলে হয়ে যায়। কৃষ্ণ নিজেকে বলল, আচ্ছা শুভেন্দু আমি কি পাগল হব? এই যে চুল পেকে গেল, এ কি খালি খালি, আমার রক্তও কি শুকিয়ে যাচ্ছে না! আমার রক্তের লোহিতকণা কি ঠিক আছে! একদিন কি আমার হাত পা খিঁচুনি দিয়ে উঠবে? আমার কিডনিতে ঢুকে পড়বে ক্যাডমিয়াম বিষ?

কেন এই সব ভাবব? যার ভাবার কথা সে তো ভাবতেই জানে না। প্রকাশ নামের বিহারি যাদব শুভেন্দুর সাদা চুল দেখে বলল—দাদার কী যেন হয়েছে, চুল পাকে।

—হ্যাঁ, প্রকাশ। পাকে। কষা জায়গা তো! তাছাড়া বয়সও হল কিছু। দু'দিন বিশ্রাম নেব, আবার চুল কালো হয়ে যাবে। তুমি কি ভয় পাচ্ছ?

—নহি নহি। ডর কিউ লগে গা! ডর করলে চলবে? কারখানার কাজ, বুকে ইতনা জোর লাগে দাদা। ইতনা...হাত প্রসারিত করে দেখায় প্রকাশ যাদব।

প্রকাশের সেই বুককে যক্ষ্মা ঝাঁঝরা করে দিল। তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে এল কৃষ্ণ। ডাক্তারের চেম্বারে বসে থাকতে থাকতে প্রকাশের মুখের দিকে চেয়ে শুভেন্দুর কেবলই মনে হচ্ছিল, একটি ধাতুবাষ্পের অদৃশ্য সূক্ষ্ম পর্দা ছেলেটাকে বেড়ে রয়েছে, যা খালি চোখে ডাক্তারও দেখতে পাবেন না—কিন্তু কৃষ্ণ দেখতে পাচ্ছে। ছেলেটার মুখটা কী করুণ! কেমন একটা কাহিল পবিত্র হাসি হাসে। যেন হাসিটা অদৃশ্যবাষ্পে টুপ করে ডুবেও যায়। হঠাৎ কৃষ্ণের মনে হল, প্রকাশের হাড়গুলো ভঙ্গুর হয়ে গেছে বিষদাঁতের কামড়ে, কখন মচ করে ভেঙে পড়ে যাবে ছেলেটা।

—গোড়াতে আমি পার্টনারদের বলেছিলাম প্রকাশ, আমরা ছোট করেই করি, প্রথম এক বছর রি-প্যাকিং হত, পরে খালি অ্যালকোহল দিয়েই তো শুরু। শিশিতে লেবেল থাকবে না, কম রেটে সাপ্লাই দিয়ে যাব। কাজটা বেআইনি হবে। হোক। সোসাইটির বড় ক্ষতি তো হবে না। মালটার নাম দিয়েছিলাম স্পেশাল সলভেন্ট। বিশেষ দ্রাবক। কিন্তু এই দ্রাবক শুধু ল্যাবগুলোকেই দিয়েছি। সরকারের ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছি। নাফা কি হয়নি তাতে? কিন্তু মানুষ শুনল না। মানুষ...বলে থেমে গেল কৃষ্ণ।

'মানুষ' বলতে সে সুদেব আর শংকরকেই ইঙ্গিত করে। শংকরকে প্রায় স্লিপিং পার্টনারই বলা যায়। কারখানায় আসে কম, কারখানার জন্য জমি দিয়েই খালাস। কাঁচামাল কেনার সময় টাকা অবশ্য দিয়েছে গোড়ার দিকে। কাঁচামাল শুধু না, যন্ত্রপাতি কেনার জন্যও একটা পুঁজির বেশ দরকার হয়েছিল। সুদেবের পুঁজির ভাগই বেশি। কৃষ্ণ প্রায় কিছুই দিতে পারল না। এ ঘটনা বারংবার মনে করে কৃষ্ণ। এ নিয়ে তার হীনম্মন্যতা রয়েছে হয়তো।

কারখানার মাথায় অ্যাজবেস্টস দিয়েছে। ইট গেঁথে সিমেন্টের পলেস্তরা হয়েছে, কিন্তু কোনও রং পড়েনি। মেঝেয় সিমেন্টের হাল্কা পোচ দেওয়া, খরখরে। বালি সিমেন্ট ওঠে। মাত্র দেড় কাঠা জমির উপর কারখানা। ডিস্টিলেশন সেট, সেন্ট্রিফিউজ, ড্রায়ার, ফ্লাস্ক, বিকার, টেস্টটিউব, কন্ডেন্সার। থার্মোমিটার, হাইড্রোমিটার। সবই বসেছে। অল্পই যন্ত্রপাতি। কারখানার নামটি কিন্তু গালভরা। দি কেমিলিঙ্ক ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল। এস.এস.আই (স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি) স্কিমে এই

BanglaBook.org

কারখানার জন্ম। যাকে বলে 'পিউরিফিকেশন অ্যান্ড ডিস্টিলেশন', এ কারখানার কাজ প্রধানত সেটাই। সেই কারণে বড় বড় কেমিক্যাল কোম্পানিগুলি এই ক্ষুদ্র কারখানার উপর যথেষ্ট নির্ভরশীল। গোড়ায় এই অবস্থা ছিল না। বড় কোম্পানির সঙ্গে লেনদেন করার কোনও আকাঙ্ক্ষা শুভেন্দুর ছিল না।

কিন্তু গোড়ার মাত্র দু'টি বছর কারখানার প্রোডাক্ট ছিল বিষহীন। নির্বিষ। শুভেন্দুর ইচ্ছেমতো চলেছে কারখানাটি। প্রথম দিকে অ্যালকোহল, ডিস্টিল্ড ওয়াটার তৈরি করত। বড় জোর পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট, পটাশিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম আয়োডাইড, সোডিয়াম ক্লোরাইড, সিলভার নাইট্রেট ইত্যাদি হত, যা স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ল্যাবে গবেষণার কাজে লাগে, তার বেশি নয়—তার বেশি ভাবেনি শুভেন্দু। স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই ছিল তাদের কেমিক্যালসের খদ্দের। তারা তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের নাম ও মূল্যতালিকা প্রকাশ করেছিল ছেপে এবং সেই পুস্তিকায় স্পষ্ট ঘোষণা করেছিল— All chemicals listed in this price list are for laboratory use only. No responsibility is accepted if these are used for medicinal or pharmaceutical applications.

এ ঘোষণা শুধুমাত্র ঘোষণাই ছিল না। শুভেন্দুর কাছে এ ছিল প্রায় অঙ্গীকারের মতো।

ডাক্তার মণ্ডল বেশ সময় নিয়ে প্রকাশের বুক পরীক্ষা করেন। স্টেথো লাগিয়ে ঝাঁঝরা বুকটার শব্দ শোনেন। তাঁর বুঝতে কিছুই বাকি থাকে না। চুপচাপ পরীক্ষা করার পর হঠাৎ প্রকাশকে জানতে চান— রক্ত ওঠে?

—উঠেছে ক'দিন।

—কবে-কবে?

—পর পর চাররোজ। আজ ভি। এক মহিনা পিছে ভি উঠেছিল।

—ঠিক আছে। তুমি বাইরে গিয়ে বসো। আমি প্রেসক্রিপশনটা কৃষ্ণের হাতে দিচ্ছি, কেমন? যাও, চিন্তার কিছু নেই।

প্রকাশ যাদব কোনও কথা না বলে বাইরে চলে যায়। এমনিতে সে কথাই বলে কম। অসুখে ধরার পর কথা আরও কমে গেছে। ও বেরিয়ে চলে যেতেই সীতানাথ মণ্ডল অর্থাৎ ডঃ এস. এন. মণ্ডল বলে উঠলেন—টিবি।

সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণের চাপা জিজ্ঞাসা—আর কিছু?

—তুমি কি আর কিছু সন্দেহ করো? কী সেটা?

—জানি না। তুমি টিবিই দেখলে। তাই তো? অন্য কিছু নেই।

—কতদিন কারখানায় আছে?

—আট বছর।

—একটানা?

—হ্যাঁ, মাঝে মাঝে দেশে যায়। বাপ-মার কাছে।

—আগে কোথায় ছিল?

—খাটালে।

BanglaBook.org

—খাটাল? কোথায় সেটি?

—কারখানার পাশে যে পুকুরটা, তারই পাড়ে। ছিল, এখন নেই।

—কী হল সেটার?

—উঠে গেল।

—কেন?

কৃষ্ণ চুপ করে রইল। ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে কলম থামিয়ে চোখ তুলে কৃষ্ণের মুখে চেয়ে থেকে শুধোলেন— কেন উঠে গেল?

চুপ করেই থাকে কৃষ্ণ। ডাক্তার চোখ নামিয়ে প্যাডের নাম-টাইটেল মুদ্রিত কাগজে কলম চালাতে চালাতে প্রশ্ন করেন—বলছ না কেন?

—কী বলব!

—খাটালটার কী হল বলো?

—উঠে গেল, মানে আর চলল না। দ্যাখো সীতানাথ আমি সব কথা বলতে পারব না।

আবার ডাক্তার লেখা থামিয়ে কৃষ্ণের মুখের দিকে চোখ তুললেন। তাঁর চোখে সচকিত বিস্ময়। হঠাৎ তাঁর মনে হল, কৃষ্ণ কিছু একটা গোপন করতে চাইছে এবং বিরক্তও। গলায় ডাক্তার বিস্ময়ের সুর খেলিয়েই বলে উঠলেন—নাকি তুমি বলবে না। আচ্ছা তোমার কারখানার লাইসেন্স আছে তো?

কৃষ্ণ গলায় একটা কড়া করে ঢোঁক গিলে বলল—ছোট কারখানার সব লাইসেন্স লাগে না সীতানাথ। লাগবে না বুঝেই লাইট কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিটা গড়েছিলাম। সন্দেহ যখন করছ, তখন বলি, অন্য কোম্পানির জিনিস গোড়ার দিকে আমারা রি-প্যাকিং করতাম। এখনও করি। একটু আধটু পিউরিফিকেশনের কাজ আছে। আমার স্যার, প্রফেসর অমরেন্দ্র বসু এই কারখানার মতলবটা দিয়েছিলেন।

—ও, আচ্ছা।

—হ্যাঁ সীতানাথ। শংকর খুদেবকে সঙ্গে না নিলেও হত না। সত্যি বলতে কী, কারখানার আসল মালিক ওরাই।

—তাই নাকি!

—একা করতে চাইলে, সরকার আমাকে লাইসেন্স দিতই না। আমি জেল খেটেছি। আমার চরিত্রের অনেক ঘাট আছে। [বস্তুত শুভেন্দুরা লাইসেন্স নিয়ে গোড়ায় মাথা ঘামায়নি।]

—তুমি কি সত্যিই তাই মনে করো?

কৃষ্ণ এবার কিছুক্ষণ একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। জেলখাটার প্রসঙ্গটা এসে পড়ায় সে নিজেই এখন অস্বস্তিবোধ করে। যদিও তারই মুখ থেকে সেকথা বেরিয়ে এসেছে, তবু এই একটা প্রসঙ্গ না এলেই ভাল হত। তাছাড়া লাইসেন্সের ব্যাপারটা তাকে কিছুতেই আরাম দেয় না।

সে হঠাৎ বলে ওঠে—আমাদের কিন্তু ফায়ার লাইসেন্স আছে সীতানাথ। টালিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস থেকে দরখাস্ত করে সেই লাইসেন্স করিয়েছি। আচ্ছা, তুমি

BanglaBook.org

কি বলছ...

মুখ নামিয়ে চুপচাপ লিখে যেতে থাকেন ডাক্তার মণ্ডল। যেন তিনি আর কিছুই শুনতে চাইছেন না। কৃষ্ণ মনে মনে ভাবে, তার কথার মধ্যে কিছু একটা গোঁজামিল টের পাচ্ছেন ডাক্তার। সে ভাবে, সব কথাই কি এই বন্ধু-ডাক্তারটিকে বলে দেওয়া যায়?

—আমি বলছিলাম...বলে কিছুই আর বলতে পারে না কৃষ্ণ। কেমন খানিকটা দমে যায়।

ফের কিছুক্ষণ বাদে—বলছিলাম কোনও হ্যাজার্ডাস কেমিক্যাল...বলেই কৃষ্ণ পূর্ববৎ থেমে পড়ে।

মুখ তুলে পাতলা একটুখানি হাসি ফুটিয়ে তুলে সীতানাথ কৃষ্ণের দিকে চাইলেন। তারপর চোখ নামিয়ে প্রেসক্রিপশনের লেখাগুলো দেখতে থাকলেন। মাথাটা মৃদু মৃদু নাড়তে থাকলেন নিজেকেই নিজে সমর্থন করার ভঙ্গিতে।

আবার একই কথা বলে ওঠে কৃষ্ণ—তুমি কি বলছ...

সীতানাথ পাতলা হাসিকে খানিকটা ঘন করে তোলেন প্রেসক্রিপশনে চেয়ে থাকতে থাকতে। তারপর চোখ তোলেন।

—খাটালটা...বলেই থেমে যান।

—হ্যাঁ...বলে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে শুভেন্দু।

সীতানাথ তাঁর হাসিকে নিঃশব্দেই আরও শোণিত করে তুলে বলেন—আমি কিছুই বলছি না কৃষ্ণ।

ডাক্তার এই কথা বলেই অসম্ভব গম্ভীর হয়ে যান। তারপর সটান প্রেসক্রিপশনটা কৃষ্ণের সম্মুখে এগিয়ে ধরেন। কৃষ্ণ সেটা ভারী সংকোচের সঙ্গে হাতে নেয়। তাকে বিশেষ অপরাধীর মতো দেখায়।

ডাক্তার হঠাৎ-ই বলে ওঠেন—আমি খাটালটা দেখেছি।

—দেখেছ? কবে?

—আমাদের এখানে কেউ নেয় না। কিন্তু আমাদের পাশের বাড়ির মাধবকে দেখেছ তুমি। ও গিয়ে দুধ আনত ওখান থেকে। মাধবকেই দেখতাম, মাঠ খানেক ধরে, ভোরবেলা ঘটি হাতে করে যাচ্ছে। তা ওই খাটালটা উঠে যাওয়ার ক'দিন আগে মাধব খালি পাত্র হাতে ফিরে এল। দুধ পায়নি। বললে, গাইগুলোর বাঁটে ঘা হয়েছে, বাঁটগুলো ফেটে গেছে। দুধ নেই। দুইতে গেলে রক্ত আসছে। আমি জিগ্যেস করাতে এই সব বললে ও।

—হ্যাঁ, আমিও শুনেছিলাম। বলতে কী, আমি দেখেছি সেসব। তবে হ্যাঁ, দত্তদের বাড়ি ছাড়া, আমাদের ওখানেও, খাটালে গিয়ে দুধ কেউ নিত না। সব দুধ বাইরে চালান হত। একটা ম্যাটাডরে ড্রামভর্তি হয়ে ভোর-ভোর সব দুধ চলে যেত, দেখেওছি চোখে। এখন আমি আসি সীতানাথ।

—আমি ওই ঘটনা শুনে মাধবকে সঙ্গে করে খাটালটা দেখে আসি। সেদিন গরুর ডাক্তার এসেছিল ওখানে। তুমি কি জানতে?

BanglaBook.org

—না।

—তাহলে শোনো কৃষ্ণ। আমি তখনই তোমাদের কারখানাটা দেখি। আমার সন্দেহ হয়।

—কী সন্দেহ হয় তোমার? প্রায় যেন আর্তনাদ করে ওঠে শুভেন্দু। চাপা বলেই সেই আর্তনাদ বেশি করে কানে লাগে সীতানাথের। সীতানাথ পানসে করে হেসে ফেলেন।

এক মিনিট ডাক্তার কী যেন হাতড়াতে থাকেন টেবিলের কাগজপত্রের মধ্যে। পান না। না পেয়ে প্রেসক্রিপশনটা কৃষ্ণের হাতে গুঁজে দিয়ে বলেন—সন্দেহ হয়। ল্যাকটেটিং হরমোন ইঞ্জেকশন দিলেও গাইগুলো দুধ দিতে পারবে না। ডাক্তারকে বলি ওই ইঞ্জেকশন আপনি দেবেন না। দিলে, মারাত্মক কিছু হতে পারে। শুনে খাটালঅলা বিহারি মানুষটা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। এখন মনে পড়ছে, প্রকাশকে আমি ওখানেই দেখেছি। আচ্ছা, এসো।

একটা কেমন আশ্বাসের শ্বাস ফেলে বাইরে বেরিয়ে চলে আসে কৃষ্ণ। তাদের চেম্বার ছাড়ার মুহূর্তে ডাক্তার বেরিয়ে এসেছিলেন। কৃষ্ণের নাম ধরে ডেকে উঠে বললেন—তোমাদের কারখানায় ড্রেনেজ বলে কিছু নেই। সোকপিট উপচে জল চলে আসে রাস্তার উপর।

—হ্যাঁ, কখনও কখনও।

—প্রকাশ তো কারখানার ভিতরেই রাতদিন থাকে। ঠিক নয়। আপাতত কিছুদিন কারখানায় রেখো না। কারখানার ভিতরেই খাওয়া-দাওয়া, শোয়া—বন্ধ থাক মাস খানেক। ওষুধ চলুক। ইঞ্জেকশনও চলবে। ভালমন্দ খেতে দাও। ঠিক আছে? ইঞ্জেকশন কিনে কোথাও করিয়ে নিও। আচ্ছা, যাও।

শুভেন্দু আর একদণ্ড দাঁড়ায় না। প্রকাশকে সঙ্গে করে রাস্তায় এসে রিকশা ডেকে নেয় এবং ওষুধের দোকানে চলে আসে। ওষুধ-ইঞ্জেকশন কেনে। খুবই চুপচাপ। একটাও কথা বলে না। চোখ তুলে ভাল করে প্রকাশের মুখের দিকে চাইতেও পারে না। কেবলই সে মনে মনে ভাববার চেষ্টা করে, তাহলে সীতানাথ কেমিলিঙ্ক ইন্ডিয়াকে সন্দেহ করেনি। নাকি করেছে। বলল না মুখে। চেপে গেল?

সোকপিট উপচে জল চলে আসে রাস্তায়। রাস্তার দু'পাশে বাড়িঘর। কারখানার গা-লাগা দত্তদের বাড়ি। রাস্তার এপাশে কৃষ্ণের বাড়ি। বাড়ির উঠোনে বারোমেসে আমগাছ। মুকুল হয়, বোল ধরে, আম আসে। কিন্তু মুকুল, বোল ইদানীং ঝরে যাচ্ছে। ফল যা দাঁড়ায়, শেষ পর্যন্ত পেকে উঠলে পানসে স্বাদ। পাতাগুলো কুঁকড়ে গেছে। গাছটি কি কোনও পাওয়ারফুল হার্বিসাইডের কবলে পড়ল? মরে যাবে?

রাস্তার জল বাড়ির ভিতে নেমে উঠোন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কিছু জল গড়াতে গড়াতে পুকুরে গিয়ে পড়ে। পুকুরের পাড়ে গজানো ঘাসে টক্সিক পদার্থগুলি জমে। গাইগুলো দিনের পর দিন সেই ঘাস খেয়েছে। তাছাড়া খাটালঅলা বাহকে করে পুকুরের জল তুলে নিয়ে গিয়ে গামলায় ঢেলে গোরুদের জাবনা খাওয়াত। ফলে গাভির বাঁটে গিয়ে জমেছে ধাতুবিষ এবং টক্সিক লিমিট ছাড়িয়ে গেছে। দুধ ধীরে

ধীরে বিষে পরিণত হয়েছে। বিষাক্ত সেই দুধ খেয়েই কি দত্তদের বাড়ির শিশুটি অন্ধ হয়ে গিয়েছে? কারখানা প্রথম শিকার করে একটি শিশুকে। এইভাবেই কি ভাববে শুভেন্দু? এই সবই কৃষ্ণের অনুমান। কিন্তু গাছটা যে মরে যাচ্ছে, এ তো অনুমান নয়। গাভির বাঁট ফেটে গিয়েছিল, তা-ও অনুমান নয়। কিন্তু এই সব ঘটনা পৃথিবী প্রমাণ করতে পারবে না।

পৃথিবী অনেক কিছুই প্রমাণ করতে পারে না। যেমন শুভেন্দু যে মানুষ খুন করেছিল, রাজনৈতিক সেই খুন প্রমাণ হয়নি। প্রমাণ এই জন্যেই হয়নি যে, সে সত্যিই খুন করেনি। কিন্তু সীতানাথ কি বিশ্বাস করে কৃষ্ণ সত্যিই খুনি নয়? পৃথিবীর কোনও খুনের ঘটনার সঙ্গেই শুভেন্দু জড়িত ছিল না। তবু নকশাল আমলে তাকে পুলিশ আচমকা ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে আটক করে রেখেছিল।

বাড়ির কাছে এসে রিকশা থেকে হাত ধরে প্রকাশকে নামায় কৃষ্ণ। কৃষ্ণের বুকে সাপটে ধরা পলিথিনের ব্যাগে ওষুধপত্র। দত্তদের বাড়ির লম্বা সংকীর্ণ বারান্দায় ঝাড়ন হাতে দাঁড়িয়ে থাকা বউটা তাদের লক্ষ করছে। কারখানার একেবারে গা-ঘেঁষা বাড়ি। ওই বারান্দা থেকে সহজেই কারখানার ভিতরে দৃষ্টি চালিয়ে দেওয়া যায়। প্রাচীর মানুষের গলা অবদি উঠেছে, দৃষ্টিকে আড়াল করতে পারে না। ভেতরের টিনের দরজাটা খুলে রাখলে ডিস্টিলেশন সেট পুরোটাই চোখে পড়ে। ফ্লাস্ক ইত্যাদি দেখা যায়। কাজের সময় কৃষ্ণ দেখেছে বউটা কেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এদিকে চেয়ে আছে। তখনই দরজাটা টেনে দেয় শুভেন্দু।

বউটার নাম সবিতা। ওর স্বামী মানিকতলায় তাদের একটি পুরনো লেটার প্রেস চালায়। সকাল আটটার দিকে বেরিয়ে যায়, ফেরে রাত দশটা নাগাদ। বাড়িতে বৃদ্ধ শ্বশুর থাকেন। শুভেন্দু জানে সবিতার বাচ্চা মেয়েটির দৃষ্টি আজও ফেরেনি। অল্পই দেখতে পায়। সেই অন্ধপ্রায় শিশুটিকে কোলে করে চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকেন বৃদ্ধ মানুষটি। বসে থাকতে থাকতে তিনি তাঁর কোলে বসা নাতনিকে ইংরেজি এবং বাংলা বর্ণ-পরিচয় আওয়াজ করে শেখাতে চেষ্টা করেন। সেই আওয়াজের নকল করে চলে নাতনি। নাতনির নাম মৌ।

—বলো মৌ, অ-এ অজগর আসছে তেড়ে, আ-এ আমটি খাব পেড়ে। হ্রস্ব ই-তে ইঁদুর ছানা ভয়ে মরে, দীর্ঘ ঈ-তে ঈগল পাখি পাছে ধরে। অজগর, আম, ইঁদুর ছানা এবং ঈগল, কাউকেই হয়তো কখনও মৌ দেখতে পাবে না। চিনবে না। অজগর এবং ঈগল কাউকেই কখনও সে ভয় পাবে না। একদিন সে একটি অন্ধ-স্কুলে ভর্তি হবে। তখনও বুঝবে না, হ্রস্ব উ-তে উটের সারি দেখতে কেমন এবং দীর্ঘ ঊ-র ঊষাই বা কী। তার আগে আর কতদিন, এইভাবে মৌ ঠাকুরদার কোলে বসে বিদ্যাভ্যাস করবে?

কিন্তু যেটি সবচেয়ে আশ্চর্যের, তা হল, বৃদ্ধ নিজেও দেখতে পান না। বয়সের কারণেই পান না। সবিতা প্রথমে তাঁকে হাত ধরে টেনে এনে সকালে চেয়ারে বসিয়ে দেয় এবং তারপর একটু একটু করে অন্ধ হতে থাকা মৌকে বুড়োর কোলে বসিয়ে

BanglaBook.org

দিয়ে অন্যত্র চলে যায়। ঘরের কাজে ব্যাপৃত থাকে। তখন পুরো-অন্ধ বৃদ্ধ প্রায়-অন্ধ নাতনিকে বর্ণ পরিচয় করাতে থাকেন। ওদের গলার সুরেই সকালে নিঃশব্দ ঘাতক কারখানাটি চালু হয়ে যায়। দুর্গন্ধ ছড়ায়। বর্জ্য পদার্থযুক্ত জল উপচে পড়ে রাস্তা দিয়ে পুকুরে গড়াতে থাকে।

পুকুরের জলে এসে মিশে যায় কারখানা ধোয়া জল। মাছের পেটে বিষ জমে। পুকুরের মালিক যাদবপুরে থাকে। কখনও এখানে আসে না। ফলে কেউ কারখানাটিকে অভিযুক্ত করেনি। পুকুরের জল বিষাক্ত এ কথাও তেমন করে কেউ বোঝেনি। পুকুরের জল গ্রীষ্মকালে মরে গিয়ে তলায় এসে ঠেকে। কাঠ মাছগুলি থকথকে কাদাজলে লুকিয়ে বেঁচে থেকে যায়। পুকুরের কোলে ঘাস থাকে ঘন হয়ে, জল পর্যন্ত। সেই ঘাস খায় খাটালের গোরুরা। খাটালের মালিক কখনও বোঝেনি, গাভিরা কী ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছে।

কৃষ্ণ সবই দেখতে পেয়েছিল। সে খালি চোখেই গ্যাস দেখতে পায়। শীতকালে কুয়াশায় মেশে কারখানার গ্যাস। মিশে যে যাচ্ছে দেখতে পায় কৃষ্ণ। গ্যাসমাখা কুয়াশা মাটিতে নামে। ঘাসের উপর নেমে বসে থাকে। বসে থাকে মূর্তির মতো। সাদা সাপের মতো। বাতাসে তার ফণা তোলা, চেরা জিভের মুণ্ড নড়েচড়ে, লেজটা ঘাসের উপর কাত হয়ে কাঁপে। দীর্ঘ একটা অজগরের মতো হয়ে যায়। ওখানে যে বকনাটা চরছিল, সেই সাপটা অতঃপর সেটাকে গিলে ফেলে। কুয়াশার ধবল খোলস পড়ে থাকে চারিধারে। চোখের ভুল ভেবে পুকুর পাড়ে কতদিন পাগলের মতো ছুটে গিয়েছে কৃষ্ণ। সেখানে ছুটে এসে দেখেছে, বকনাটা নেই। গায়েব হয়ে গেছে।

কুয়াশার অবয়ব নিয়ে কত রকমের মূর্তি তৈরি হয়। কারখানার গ্যাসই ওগুলো। এ জিনিস কখনও অন্য কেউ দেখেনি। কারণ কুয়াশার চরিত্র সম্বন্ধে তাদের ধারণা নেই। গ্রীষ্মে বাতাস গরম হয়ে কারখানার গ্যাসকে আকাশে ঠেলে তুলে নিয়ে যায়, কুয়াশার শরীর এবং ঠাণ্ডা ভারী হাওয়া, যা স্থির, না পেলে গ্যাস মাটিতে মূর্তির মতো বসতে পারে না। তাই একটি কারখানা শীতকালে অনেক বেশি বিপজ্জনক। গ্রীষ্মে অবশ্য আগুনের ভয় আছে।

বউটা ওদের দিকে কেমন সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে রয়েছে। কোনও প্রশ্নও কি করতে চায়? যদি শুধায় প্রকাশের কী হয়েছে, কী জবাব দেবে কৃষ্ণ। বলবে, কিছু না, একটু জ্বর মতন। মানুষের কি জ্বর হতে পারে না?

—রিকশার ঘণ্টি বাজল বউমা? হঠাৎ চেয়ারে বসা বুড়ো জানতে চাইলেন।

—হ্যাঁ বাবা।

—কে?

—কারখানার লোক। বিহারি ছেলেটার কিছু হয়েছে। ডাক্তারের কাছ থেকে এল।

বুড়ো আপন মনে বলে উঠলেন—হবে না। কারখানার মধ্যেই পড়ে থাকে, বাইরে তো আসে না। খেলাধুলা নাই, মেলামেশা নাই, কিছুই নাই। কী হয়েছে, শুধাও দিকিনি।

বউটা কিছু প্রশ্ন করবার আগেই প্রকাশকে সঙ্গে করে দ্রুত কৃষ্ণ বাড়ির মধ্যে ঢুকে

BanglaBook.org

পড়ে। মা ওদের দু'জনকে রান্নাঘর থেকে উঠোনে দেখতে পান। বেরিয়ে আসেন ঘরের লম্বা বারান্দায়। তিনখানা শোবার ঘর আছে বাড়িটাতে। তার মধ্যে ক্ষুদ্রতম ঘরটি প্রকাশের জন্য বরাদ্দ হয়। বাড়িটা উত্তরমুখো। দক্ষিণে রাস্তার ওপারে কারখানা। রাস্তাটা দশ ফুটের বেশি চওড়া নয়। দক্ষিণে রয়েছে জানলা। সব জানলা সব সময় বন্ধ।

ক্ষুদ্র ঘরটিতে প্রকাশকে নিয়ে আসা হয়। ভিতরে দিনের বেলাতেও হলুদ রঙের আলোর বাল্‌ব জ্বলছে। বোঝা যায় ওই বাল্‌ব না জ্বললে ঘর অন্ধকার দেখায়।

কৃষ্ণ বলল— প্রকাশ, তুমি এই ঘরে থাকবে। সব সময় আলো জ্বালার দরকার নেই। কপাট খুলে রাখারও দরকার নেই। খালি অন্ধকারে তক্তাপোশে শুয়ে থাকবে। দরকার হলে মাকে ডাকবে। খাবে আর শুয়ে থাকবে। শোনো, দক্ষিণের জানলা কখনও খুলবে না। লোকজন এলে হুট করে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়ো না।

—না। কেবল একটি ঠাণ্ডা 'না' ছাড়া আর কিছুই বলে না প্রকাশ। ঘরে সেঁধিয়ে পড়ে। তক্তাপোশের একটি কোণে গিয়ে হালকা পাখির মতো বসে। ঘরের ভিতরটা দৃষ্টি বুলিয়ে দেখতে থাকে। খুবই ছোট ঘর। জেলের একটি সেল বললেও চলে। বাল্‌বটাও মাথার উপর ঝুলছে একটি তারের দড়িতে। এই ঘরটারই মাথার ছাদে ডালপালা মেলে রয়েছে বারোমেসে আম গাছটা। ফলে ছায়া এখানে বেশি গাঢ়।

—দক্ষিণের ওই কোণে, পুব-দক্ষিণ কোণটায় মাটির একটা পিকদানি আছে। তাতে জল মেশানো কার্বোলিক অ্যাসিড আছে। থুতু ফেলবে। রক্ত উঠলে ফেলবে। মাছি বসলে মাকে ডাকবে। [প্রকাশের যে যক্ষ্মা হয়েছে, আগেই বুঝে ফেলেছিল কৃষ্ণ, তাই পিকদানির ব্যবস্থা করে তবে ডাক্তারের কাছে গেছে।]

—হ্যাঁ। একটি ঠাণ্ডা 'হ্যাঁ' উচ্চারণ করে প্রকাশ।

কৃষ্ণ দরজার কাছ থেকে সরে চলে আসে। মা তাকে চোখের ইশারা করে অন্য একটি ঘরে ডেকে নিয়ে চাপা গলায় বলেন—একেবারে বাড়িতে এনে তুললি? সুদেব শংকর জানে?

—জানবে না কেন! ওরা দায়িত্ব নেবে না। খালি চিকিৎসার পয়সা দেবে। দ্যাখো মা, দায় আমার। কারখানা আমারই মাথা খাটানো জিনিস। ওরাও তাই-ই মনে করে। ফলে এর থেকে যত ক্ষয়ক্ষতি হবে, আমিই দায়ী হব। লাভ যা হয়, তার তিনটি সমান ভাগ তো হয় না। লোকসানের বেলা? মিউনিসিপ্যালিটিকে যে ঘুস দিই, সেই টাকাও আমার হাত দিয়ে যায়। ওরা হাতে করে দেবে না। ওরা সাধু, আমি পাপী। খাটাল উঠে যাওয়ার সময় গোরুগুলো কী-কষ্ট পেয়েছিল, তোমার মনে নেই?

—হ্যাঁ, আছে। আচ্ছা খোকা, গোরুর বাঁট দিয়ে যে রক্ত বেরিয়েছিল তা কি সত্যিই কারখানার কারণে?

—আমি কী করে বলব মা! তত বিদ্যে তো আমার নেই।

—অমরেন্দ্রবাবু কী বলেছেন?

—পুকুরের জল পরীক্ষা করে হয়তো বলা যায়। কে করবে সেই পরীক্ষা! তাছাড়া শুধু জল পরীক্ষা করেই হবে না। আক্রান্ত গাইগুলোকেও পরীক্ষা করতে হবে।

BanglaBook.org

সীতানাথ বারবার জানতে চাইছিল, খাটালটা কেন উঠে গেল!

—তুই কী বললি?

—বললাম, আমি জানি না। [শুভেন্দু কৃষ্ণকে চাপা অস্ফুট গলায় জানতে চাইল সত্যিই কি তুমি জান না?]

—কেন বললি?

এবার অত্যন্ত কাতর অসহিষ্ণু গলায় প্রায় আর্তনাদ করে উঠল কৃষ্ণ—সত্যিই আমি জানি না মা। আমাকে প্রশ্ন কোরো না। বলে ঘর ছেড়ে ছিটকে বাইরে বার হয়ে চলে এল শুভেন্দু। এসেই চমকে উঠল উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে দেখে।

—আসুন পরেশবাবু। কী খবর?

এই সেই পরেশ সামন্ত, মিউনিসিপ্যালিটি থেকে যিনি কারখানা দেখতে আসেন এবং ঘুস নিয়ে ফিরে যান। এখনই হয়তো পাঁচশো টাকা চেয়ে বসবেন।

পরেশ সামন্ত মুখে কৃতার্থের নিঃশব্দ হাসি ছড়িয়ে বারান্দায় উঠে আসেন। তাঁর উঠে আসার আগেই কৃষ্ণ ছুটে যায় প্রকাশের ঘরে। আলো নিবিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আসে। বলে আসে, চুপ করে শুয়ে থাক প্রকাশ। এখন কিছু চেয়ো না। লোক এসেছে।

সামন্ত এবার মুখের হাসি মুছে ফেলে বললেন— গত পরশু দত্তদের বাড়ি ইঞ্জিনিয়র এসেছিল। বাড়ির দেওয়াল পরীক্ষা করিয়েছে ওরা। জানেন কিছু? সেই ইঞ্জিনিয়র আমার চেনা লোক।

—পরশু আমি ছিলাম না পরেশবাবু। [কৃষ্ণ শুভেন্দুকে নিঃশব্দে বলল, সত্য বললে না কৃষ্ণ।]

—শুনুন। ইঞ্জিনিয়রের রিপোর্ট আমার দফতরেই জমা পড়েছে। আমার সঙ্গেই আছে সেটা। ওই রিপোর্টের সঙ্গে একখানা দরখাস্তও এসেছে। বাড়ির দেওয়াল অ্যাফেকটেড, তবে এ অঞ্চলে আপনা থেকেই বাড়িতে নোনা ধরে। বাড়িটাকে কেমিক্যালে খেয়ে নিচ্ছে, এই যুক্তি দেখানো হয়েছে। আমি এই রিপোর্ট চেপে দেব।

—দেখুন পরেশবাবু, কারখানাটা যখন এখানে হয়, তখন চারপাশে কোনও বাড়িঘরই ছিল না। গাছপালা ছিল, পুকুর-ডোবা ইত্যাদি ছিল। দত্তরা ওই জমি না কিনলেই পারত।

—এ যুক্তি চলবে না আপনার। কারণ কারখানার কোনও উপযুক্ত লাইসেন্স নেই।

—আছে। ফায়ার লাইসেন্স আছে।

—শুনুন, ও দিয়ে হবে না। নতুন করে লাইসেন্স করাতে গেলেও বিপদে পড়বেন।

—তা হলে কী করতে বলেন?

—যে ভাবে চলছে, তাই-ই চলুক। আমি উপরে লিখে জানাব, এখানে নটরিয়াস কোনও কেমিক্যাল তৈরি হয় না। খুবই ছোট কারখানা। লিখে দেব আপনারা নন-ফসফেট ডিটারজেন্ট তৈরি করেন। বলতে বলতে বারান্দা ছেড়ে নেমে চলে গেলেন সামন্ত। বাইরে বেরিয়ে কোথাও আর দাঁড়ালেন না।

কৃষ্ণ বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। কারখানায় ঢুকবে

BanglaBook.org

কি না ভাবছিল, এমন সময় লক্ষ করে সামন্তবাবু ফিরে এদিকেই আসছেন। নিঃশ্বাস টানতেই অদ্ভুত গন্ধটা নাকে এসে লাগে। বেঞ্জিনের গন্ধ। কারখানায় সুদেব রয়েছে। গন্ধটা উগ্রভাবেই যেন তেড়ে তেড়ে আসছে। পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন সামন্ত।

মৃদু কণ্ঠে পরেশ সামন্ত বললেন—না বলে পারছি না শুভেন্দুবাবু। তেজালো ঝাঁঝ পাচ্ছি, এ বিষাক্ত গ্যাস। পি. সি. বি-কে আমি রিপোর্ট করতেই পারি। পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড এই কারখানা বন্ধ করে দেবে। করি না শুধু আপনার কথা ভেবে। আমি এ পর্যন্ত জানি, আপনাদের এখানে আপনারা ক্লোরোফর্ম ডিসটিল্ড করেন। আপনি নিশ্চয় জানেন, ভোপালে যে ভয়াবহ গ্যাস দুর্ঘটনা হয়েছিল, সেটা ছিল মিক (MIC) গ্যাস। এই ক্লোরোফর্ম ওই মিক গ্যাস ম্যানুফ্যাকচার করতে লাগে।

—আমাকে এই সব বলছেন কেন সামন্তবাবু! এইটুকু কথা বার হবার সময় কৃষ্ণের গলাটা কেমন ভিজে গেল। সে ভিতরে ভিতরে যথেষ্ট বিচলিত হয়ে পড়েছিল। সে অত্যন্ত করুণ দৃষ্টিতে পরেশ সামন্তকে দেখবার চেষ্টা করে।

সামন্ত বললেন—বলছি এই জন্যে যে, প্রত্যেক কারখানার জন্য কতকগুলো সেফটি রুলস থাকে। এখানে তার কিছুই নেই। কখনও যদি গ্যাসের ভায়োলেন্ট রিঅ্যাকশন হয়, কী করবেন? কোনও সেফটি ডিভাইস আছে কী? কন্ডেন্সার ঠাণ্ডা রাখেন জল ছেড়ে ছেড়ে।

কৃষ্ণ ভিতরে ভিতরে কাঁপছিল। সামন্ত বললেন— ভোপালের মিক গ্যাস দুর্ঘটনায় ইউনিয়ন কার্বাইড কর্পোরেশন দশ হাজার মানুষকে মেরে ফেলেছিল। রাস্তায় পড়ে পড়ে মানুষ মরেছে, তাদের পেটের নাড়িভুঁড়ি সব পচে গিয়েছিল। রাস্তায় ঘরে পোষা জীবগুলো মরেছে। একটি গোরু পচে ফুলে ফেঁপে একটি হাতির সমান প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছিল।

—এই সব কেন শোনাচ্ছেন সামন্তবাবু? গলাটা আরও ধরে আসে শুভেন্দুর।

সামন্ত কিন্তু বলতেই থাকেন—ভোপালের হামিদিয়া হাসপাতালে পেশেন্টের জন্য সিটের ক্যাপাসিটি মাত্র এক হাজার দুশো। সেখানে গ্যাস অ্যাফেক্টেড মানুষের ভিড় হয়েছিল পঁচিশ হাজার। সারা হাসপাতাল চাতাল বমি আর রক্তে ভেসে গিয়েছিল। এক সপ্তাহে মরে যায় দশ হাজার। অন্ধ হয়ে যায় এক হাজার। এক লক্ষ মানুষ সেই গ্যাসের কামড়ে নানা অসুখে ভুগতে থাকে।

—এক হাজার অন্ধ হয়ে গিয়েছিল? অর্ধস্ফুট কাতরতায় বলে ওঠে কৃষ্ণ।

—আপনার তা হলে জানা নেই। শুনুন, এখানে তো একটা দশ সিটের হাসপাতালই নেই মশাই। আপনার কারখানা ছোট, তা হলে ছোট একটা হাসপাতাল তো থাকবে। কী আছে এখানে? আদি গঙ্গা। নাম গঙ্গা, আসলে মরা একটা ডোবা। ডোবা বললে রাগবেন। বলি কতকগুলো পচা ডোবা পুকুর। তা দেখিয়ে বলেন, এই হল আপনার আদি গঙ্গা। ক্লাস্টার অফ পন্ডস। নদীর বুকে বাড়ি, বাড়ির গা-লাগা ডোবা বা পুকুর। চারটে বাড়ি, একটা ডোবা। তারপর বাড়ি দু'টা, একটা পুকুর। এইভাবে চলেছে। তারপর বদ্ধ জলের একটি শ্মশানঘাট। এবং ...বলে আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন পরেশ সামন্ত।

BanglaBook.org

কৃষ্ণ দু' চোখ বন্ধ করে বলল—থামুন সামন্তবাবু। আপনি এখন কত চাইছেন বলুন।

পরেশ বললেন—সে কথা পরে হচ্ছে। দু'টি কথা আপনাকে আরও শুনতে হবে। প্রথমত ভোপালের কার্বাইড কারখানায় যে মিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল, তার স্পষ্ট চিহ্নিত কারণ আজও জানা যায়নি। মিকের চরিত্র আজও মানুষের কাছে অস্বচ্ছ। আপনার কারখানা আছে, আপনাকে জেনে রাখতে হবে, সমস্ত গ্যাসকে আমরা প্রকৃতপক্ষে চিনি না। তাদের হিংস্র চরিত্র কত দূর জানা নেই। তবে হ্যাঁ

—বলুন। বলে শরীরের ভেতরের চাপে ক্লান্ত দৃষ্টি সামন্তের মুখে মেলে ধরে কৃষ্ণ। তার ভেতরটা কেমন শুকিয়ে যেতে থাকে। সামন্তের এই আচরণ তার কাছে অদ্ভুত ঠেকে। কী চায় লোকটা? টাকা? কত টাকা?

সামন্ত বলে ওঠেন—তবে হ্যাঁ। ভোপালের ওই প্ল্যান্টের দু'টি প্রধান সেফটি ডিভাইস ছিল। একটি হল, স্ক্র্যাবার, হুইচ নিউট্রালাইজেস দি গ্যাস উইথ কস্টিক সোডা। দ্বিতীয়টি হল ফ্লেয়ার টাওয়ার, হোয়ার দি গ্যাস ক্যান বি বার্ন্ট অফ। মিক গ্যাসকে কিন্তু সোডা দিয়ে জব্দ করা হয়নি, অথবা ওই টাওয়ারের সাহায্যে পুড়িয়ে মারাও যায়নি। মনে রাখবেন, বোথ দি সেফটি ডিভাইসেস ফেল্ড টু ওয়ার্ক অন ডিসেম্বর থ্রি, 1984. ডিসেম্বরের কড়া শীতের রাতে, ওই দুর্ঘটনা ঘটে আরও এ কারণে যে, রেফ্রিজারেশন সিস্টেমও বিকল হয়ে ছিল জুন মাস থেকে। যন্ত্র কেন যথাসময়ে কাজ করে না, এর জবাব হয়তো মিলবে, কিন্তু মিক ...

—আপনি কি এবার সত্যিই থামবেন মিঃ সামন্ত? আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন কেন? বলে খানিকটা চিৎকার করে ওঠে কৃষ্ণ।

সামন্ত শুভেন্দুর কথায় তত আমল না দিয়ে বলে ওঠেন—আপনাদের রেফ্রিজারেশন সিস্টেমটা কী? কন্ডেন্সারের গা দিয়ে শুধু জল পাশ করানো? তাইই কি যথেষ্ট? শুনুন, আরও একটি কথা। দুর্ঘটনা যখন হল, মাত্র দু' সপ্তাহের মধ্যেই ওই প্ল্যান্টের ওয়ার্কস ম্যানেজার কী বলে বিবৃতি দিয়েছিলেন জানেন? তখনও মানুষ মরে চলেছে, হাজারে হাজারে। উনি ঘোষণা করলেন। মিক ইজ নট হার্মফুল। ইট ইজ লাইক টিয়ার গ্যাস, ইউর আইজ স্টার্ট টিয়ারিং ...ব্যস, তোমাদের চোখে জল আসে কেন? কেন আসে কৃষ্ণ? আপনার আর একটি নাম যে কৃষ্ণ, তা-ও আমি জানি শুভেন্দুবাবু। ম্যানেজার বলেছিলেন, মিককে ভয় করবেন না। মিক নিরীহ। কৃষ্ণ আপনিও কি বলবেন ছোট কারখানা, আমাদের গ্যাস মানুষের চোখে জল আনবে না কখনও?

কণ্ঠস্বর শক্ত করে এবার শুভেন্দু জিজ্ঞাসা করল—কত লাগবে আপনার?

গম্ভীর গলাতেই সামন্ত বললেন—স্ত্রীর অপারেশনের জন্য চল্লিশ হাজার টাকা দরকার। অন্তত অর্ধেকটা দেবেন আপনারা। আমি ২৫ তারিখ আসব। মাফ করবেন, এ ছাড়া আমার উপায় ছিল না। একটি কথা আপনাকে বলে যাই, আপনাকে এতক্ষণ আমি মিথ্যা বলিনি, ভয় দেখাতেও চাইনি। চলি, কেমন?

সামন্ত চলে গেলেন। দ্রুতই হেঁটে যেতে লাগলেন। পথের উপর দাঁড়িয়ে রইল

BanglaBook.org

কৃষ্ণ। তার মাথার শিরা দপদপ করছিল। তার চটি ভিজে যাচ্ছিল কারখানার বিষাক্ত দূষিত জলে। তার চিৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করছিল। এই লোকটা একটি মিকম্যান (MICMAN) এ রহস্যময়, মানুষের আতঙ্ক স্বয়ং, মানুষের সর্বনাশের কাহিনী শুনিয়ে পয়সা চায়, এ ভিখিরির অধম এবং মিকের চেয়ে নিষ্ঠুর। কাহিনী শোনাতে শোনাতে সামন্ত নিজের চোখে অবধি জল টেনে এনেছিলেন।

হাম্বা

একটি বড় কোম্পানির লোভনীয় ভার্বাল অর্ডার এনেছে সুদেব। ইউরিন স্যাম্পল ডিস্টিল করার বরাত। দুশো লিটার পলিথিন ড্রামে ভর্তি হয়ে এসেছে পাবলিকের পেচ্ছাব। একটি ম্যাটাডর বোঝাই হয়ে চলে এল। সঙ্গে পাইওনিয়ার ইন্ডিয়া কেমিক্যালসের ডিলার একজনকে পাঠিয়ে দিয়েছে, তার সঙ্গে কাজের দরদস্তুর সম্বন্ধে কৃষ্ণ কথা বলে নিতে পারবে। যদিও সব কথাই সুদেবের সঙ্গে আগেই পাকা হয়ে গিয়েছে। কাজটা কী, না স্বচ্ছ ক্রিস্টালাইন পদার্থ বার করতে হবে। একে বলা যেতে পারে ওয়েস্ট রিসাইক্লিং, অর্থাৎ বর্জ্য পদার্থ থেকে প্রয়োজনীয় অংশের পুনরুদ্ধার। এই কাজ পাইওনিয়ার ইন্ডিয়া নিজেই কেন করল না?

এ কথা ভেবে কৃষ্ণের মাথাটা কেমন গরম হয়ে উঠল। পাইওনিয়ার ইন্ডিয়ার ডিলারের প্রতিনিধি ললিত নস্কর বারুইপুরে থাকে, তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কৃষ্ণ হঠাৎ বলে ফেলল— কারখানা গরিব, আমরাও ছোটলোক, মানুষের পেচ্ছাব ঘাঁটতে বাধা কোথায়, তাই না ললিতবাবু।

—ঠিকই বলেছেন শুভেন্দুবাবু। ইনফার ইন্ডিয়ার কর্মীরা এ কাজ করবে না। করবে না বলেই অর্ডারটা পাচ্ছেন। ধরেছেন ঠিক। মাথা নাড়ে ললিত নস্কর।

—কাজটা তো আমাকেই করতে হয়। কেউ তো হাত লাগাতে পারে না। সত্যি বলতে কী, করি আমি, সঙ্গে থাকে প্রকাশ। সুদেব তো অর্ডার ধরে দিয়েই ভাবে, সব হয়ে গেল। শংকর কাজ বোঝে না, বুঝতেও চায় না। বলে ওঠে কৃষ্ণ। কথা শুনে গা নড়িয়ে কেমন একটু অস্বস্তির ভঙ্গি করেন চেয়ারে বসা ললিত। মানুষটির কাঁচাপাকা গোঁফ, খোঁচাখোঁচা দাড়িরও প্রায় অর্ধেক পেকে উঠেছে। কানের লতির চুলে পাকধরা। বেঁটেখাটো মানুষ, পেটা কালো গতর। গায়ে বাংলা নীল ফুলশার্ট। পরনে ধুতি। পায়ে কোলাপুরি স্যান্ডেল। জামার হাতা ভাঁজ করে গুটানো। কব্জিতে পুরনো মোটা ডায়ালের ঘড়ি। ভুরুর চুলও সাদা হয়ে উঠতে চাইছে। কষে শ্বেতীর দাগ।

সুদেব লম্বা গলা বকের মতন সোজা করে টেনে বলে উঠল— তুমি তো হাতে গ্লাভস গলিয়ে মুত ঘাঁটবে, ঘেন্নার কী আছে। তা ছাড়া গ্যাসমাস্ক থাকবে নাকের উপর। গন্ধ তো লাগবে না।

—কে বলল গন্ধ লাগবে না। তুমি জান? তুমি কী জান সুদেব, কতটুকু থাকো কারখানায়? আজ পর্যন্ত আমাদের আইপ্রোটেকটিং গ্লাস নেই। কী করে কী হয় কখনও বুঝে দেখেছ?

BanglaBook.org

—আমাদের তো বোঝার কথা ছিল না কৃষ্ণ!

—মানে! বলে একটা ক্ষুদ্র আর্তনাদ বেরিয়ে আসে শুভেন্দুর গলা থেকে।

সুদেব কথা না থামিয়ে একবার নস্করের দিকে চেয়ে দেখে নিয়ে বলে— মানে আর কী! তুমি জেল থেকে বেরিয়ে মতলব আঁটলে একটা কারখানা করবে। চাকরির বয়স পার করে এসেছ জেলে। তা ছাড়া মুচলেকা দিয়ে বার হয়েছ, 'মানুষ খুন করবে না'। আমাকে আর শংকরকে ধরে পড়লে, কারখানায় সলভেন্ট তৈরি হবে, নাফা আছে।

—কী বলছ সুদেব! আমি মুচলেকা দিয়ে জেল থেকে বার হয়েছি! শোনো, এই সব কথা কোথা থেকে পেলে তুমি? উত্তেজিত হয়ে ওঠে কৃষ্ণ।

কৃষ্ণের উত্তেজনায় সামান্য আমল না দিয়ে সুদেব আরও আক্রমণ করে বসে বন্ধুকে— জেলখাটার অহংকার আর মানায় না তোমার। মুচলেকা দাও না দাও, তোমার ওই অ্যান্টিভিস্ট ইগোর আজ আর কোনও মূল্য নেই শুভেন্দু। সমাজ অনেক বদলে গিয়েছে। বাঁচার জন্য মানুষকে সব করতে হয়। অর্ডার যখন অ্যাকসেপ্ট করেছি, তখন...

—আমি পারব না। বলে ওঠে রাগে কুঁকড়ে যাওয়া শুভেন্দু। তারপর নস্করের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলে— মাফ করবেন ললিতবাবু।

শুভেন্দুর নিঃশ্বাস ঘন হয়ে আসে। কপাল ঘেমে ওঠে। রাগত গলাতেই সে বলে— আমাদের সেন্ট্রিফিউজ সেকেন্ড-হ্যান্ড। মডেল অত্যন্ত পুরনো। কলকাতার একটি সায়েন্স কলেজের বাতিল মাল। মাত্র দশ হাজার টাকায় আমিই কিনেছিলাম। টাকা অবশ্য শংকর দিয়েছিল। এটাকে ম্যানুয়ালি অপারেট করতে হয়। প্রকাশকে আমি দাঁড় করিয়ে রেখে সময়, ডিগ্রি মাপ করে কাজ করি। এর কী হ্যাপা তুমিও বুঝবে না সুদেব। এভাবে চলে না। আমাদের একটা আধুনিক অটোমাটিক সেন্ট্রিফিউজ দরকার। কই, তা কেনা হল কোথায়?

—হবে। শংকরকে বলেছি... বলে ওঠে সুদেব।

—ওই বলা পর্যন্ত... যে-কোনও সময় অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে। কে কান দেয় তাতে! শুধু লাভটাই বুঝলে সুদেব, মানুষের প্রাণটা বুঝলে না!

সুদেব তার মুখটা একটুখানি বাঁকা করে বলল— এসব বোঝার কথা, একদা বিপ্লবী কৃষ্ণের, রাগ কোরো না, আমি তোমাকে ঠাট্টা করছি না। আমরা সাধারণ মানুষ, আমাদের কাছে লাভনাফাই সব।

— বেশ তো, তার জন্যও তো আধুনিক অ্যাপারেটাস দরকার সুদেবসুন্দর।

— কী করে হবে, তুমি তা হলে অর্ধেক টাকা দাও। দেবে? আমি আর শংকর বাকি অর্ধেক দিচ্ছি।

—ও, বুঝেছি। তা হলে হবে না?

— কেন হবে না? তুমি দিলেই হবে। দাও অর্ধেক।

—অর্ধেক দেব কী হিসেবে বুঝিয়ে বলো। আমি তো লাভের সমান ভাগ পাই না। আমি এক সিকি মালিক, বারো আনা ওয়ার্কার। তাই না?

BanglaBook.org

—হ্যাঁ, সেই রকমই তো কথা হয়েছিল শুভেন্দু। তুমি অল্পেই সন্তুষ্ট, এখন ফের অঙ্ক কষছ! যাক গে, অর্ডার পেয়েছি, কাজ তোমাকে উঠিয়ে দিতে হবে। দেশোদ্ধার, সর্বহারা বিপ্লব এই সবে বিশ্বাস রেখে কেমিক্যালের কাজ কেউ করে না। তুমিও করনি।

—আমি জানি, আমি কী করেছি। তোমার বুঝে কাজ নেই সুদেবসুন্দর। তবে দু'টি কথা তোমাকে শুনতে হবে। ইউরিনের কাজ করার পর কাচের অ্যাপারেটাসগুলো ফেলে দিতে হবে। ওই সব জিনিস প্রকাশকে দিয়ে ধোয়াতে পারব না। ও অসুস্থ। তা ছাড়া মুতমাখা অ্যাপারেটাস অন্য কেমিক্যাল প্রোডাক্টে ব্যবহার করা যাবে না। ডিলারকে গিয়ে বলুন ললিতবাবু, কাচের পুরো অ্যাপারেটাস সেট যেন উনি নতুন করে কিনে দেন।

ললিত, দেখা গেল, রাজি হয়ে গেল আমতা আমতা করে এবং বলল— ঠিক আছে, আমি গিয়ে বলছি। আপনি কাজটা করে দিন।

সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ বলে উঠল— আমি জানতাম, এই প্রস্তাবেও আপনারা রাজি হবেন। আর হ্যাঁ, ছোটলোকের এই কাজ আমি আর একটি শর্তে করে দিতে পারি সুদেবসুন্দর।

—বলো।

—আমি কোথাও কোনও মুচলেকা দিইনি, আমি খুন করিনি, খুনের সবুদ আদতে ছিল না বলেই আমি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি, একথা তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে। বিশ্বাস করতে হবে আমি নির্দোষ। বলেই কৃষ্ণ প্রকাশের বন্ধদ্বার ঘরের দিকে চাইল। সুদেব তাই দেখে প্রচণ্ড বেগে হাহা করে হেসে উঠল, মনে হল তার হাসি মানুষের মুতের চেয়ে নোংরা এবং তা সব কাচ পাত্রগুলিকে ফাটিয়ে দিতে পারে।

সুদেবের হাসি থামলে বিস্ময়-পীড়িত গলায় শুভেন্দু বলে উঠল— তুমি এইভাবে হাসলে কেন সুদেবসুন্দর? ব্যঙ্গ করলে, তাই না? আমি তোমার চোখে হাসির পাত্র! দুঃখ হয়, সরকার কেন আমাকে জেল থেকে ছেড়ে দিল! সত্যি বলতে কী, আমি আজও বুঝতে পারি না, কেন আমাকে জেলে ঢোকানো হয়েছিল, কেনই বা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কোনও প্রমাণ তো ছিল না। তবে হ্যাঁ, জেল থেকে বেরিয়েই আমার পাপের জীবন শুরু হয়েছে... কথাটা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি সুদেব, আমি নির্দোষ নই। না, নই। আপনি এখন আসুন ললিতবাবু। আমি ভেবে দেখি...

—আবার তুমি ভেবে দেখতে চাইছ শুভেন্দু? অবাক হয়ে প্রশ্ন করে সুদেব।

—হ্যাঁ। জবাব দেয় কৃষ্ণ।

—কারণ? ফের বিস্ময় মেশানো গলায় জানতে চায় পার্টনার সুদেব।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শুভেন্দু বলে— একা তো এই কাজ পারব না। মগে করে পেচ্ছাব ঢালার কাজ প্রকাশকে করতে হবে। ওর এখন কারখানায় ঢোকা মানা আছে।

—তুমিই তা হলে ঢালবে। আমাদের সঙ্গে থাকতে হলে, তোমাকে এই সব করতে হবে কৃষ্ণ।

BanglaBook.org

—হুকুম করছ?

—ধরো তাই।

—ও, আচ্ছা! বলে উঠে কৃষ্ণ অনুভব করে তার ভেতরটা ঠকঠক করে কাঁপছে। বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাড়িয়ে পড়ে সে। তার হাত পায়ে কেমন একটা অস্বাভাবিক খিঁচুনি এক মিনিটের মতো আঁকড়ে ধরে। মনে হল, এখনই সে কাঁপতে কাঁপতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। এই কাঁপুনি এবং খিঁচিয়ে ওঠা অভূতপূর্ব। তার কি তাহলে সত্যিই কিছু হচ্ছে! সে হঠাৎই খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে টয়লেটের দিকে এগিয়ে যায়। ভিতরে ঢুকে পেচ্ছাব করতে গিয়ে বুঝতে পারে, জলবিয়োগ করতে তার কিছু কষ্ট হচ্ছে। একটি ভয় তার শরীরে বিদ্যুতের মতো বয়ে যায়। একটি তীব্র গ্লানিতে মনটা ভার হয়ে আসে।

ললিত নস্কর সুদেবকে বলে— এইভাবে বলাটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। আপনি ঠিক করলেন না সুদেববাবু! এই একটি কথাতেই কেমন হয়ে গেল সুদেবসুন্দর। কৃষ্ণ টয়লেট থেকে বার হয়ে আসতেই কৃষ্ণের দুটি হাত জড়িয়ে ধরল সে। তারপর ফ্যাসফেসে গলায় বলল— আমাকে মাফ করো কৃষ্ণ। আমি তোমাকে হুকুম করতে পারি! তুমি আমাদের বন্ধু! কাজটা দয়া করে উঠিয়ে দাও এবারের মতো। প্রকাশের জন্য আমারও দুঃখ আছে। তুমি আমাকে ক্রুয়েল ভেব না। আমি মায়ের জমি বেচে কারখানায় টাকা লাগিয়েছি। তাই মাথার ঠিক থাকে না। মাফ করলে তো?

ঘৃণায় গা শিরশির করে ওঠে শুভেন্দুর। সে কোনও কথা না বলে চুপ করে থাকে এবং সুদেবের মুঠোয় ধরা হাতটাকে ছাড়িয়ে নেয়। তারপর অবসন্ন ভঙ্গিতে দেওয়াল-ঘেঁষা বেঞ্চে বসে পড়ে। কেউই আর কথা বলতে পারে না। ললিত নস্কর উঠে দাঁড়ায় এবং বাইরে চলে যায়।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে সুদেবও চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছিল, তখনই শ্লথ গলায় কৃষ্ণ বলে উঠল— কুড়ি হাজার টাকা চেয়েছে সামন্ত। জোগাড় রেখো। এবং বলে যাও, ঘুসের ওই টাকায় আমার ভাগ কতটা, কত দেব আমি।

—কেন কী হয়েছে, এত টাকা কেন? চাইলেই আমরা দিয়ে দেব! পাব কোথায়? কী বলছ তুমি শুভেন্দু! কবে চাইল এত টাকা? উত্তেজিতভাবে গড়গড় করে বলে উঠল সুদেব।

কৃষ্ণ ঠাণ্ডা গলায় শুধু বলল— পরশু এসেছিল।

—আমরা পারব না, বলে ওঠে সুদেব।

—পারতে হবে। দত্তরা মিউনিসিপ্যালিটিতে দরখাস্ত করেছে। মনে হচ্ছে, দত্তদেরকে নাগরিক সমিতি উসকে দিয়েছে, কারখানা তুলে দিতে চাইছে।

—বললেই হল!

—কারখানা চালাতে হলে, সরকারের 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' লাগে সুদেবসুন্দর। সামন্তর খপ্পরে পড়ে গিয়েছি আমরা। লাইট গ্রিন ক্যাটেগরির কেমিক্যাল নিয়ে আজ আমরা কাজ করি না। আমরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অনেক হেভি কেমিক্যালের কাজ এখানে হচ্ছে অথচ আমাদের কোনও ম্যানুফ্যাকচারিং লাইসেন্স

BanglaBook.org

নেই। দত্তরা মামলা করলেই কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। আমি এসব চাইনি।

—সামন্ত কী বলেছে?

—টাকা পেলে সব সামাল দেবে।

—ঠিক আছে, তুমি পাঁচ হাজার দিও। বলেই চুপচাপ বেরিয়ে চলে যায় সুদেব।

সুদেব চলে যেতেই মা শুভেন্দুর কাছে আসেন এবং বলেন— এসব কী হচ্ছে কৃষ্ণ!

—সবই তো দেখলে মা। কীভাবে সুদেবসুন্দর আমাকে চাকরের মতো করল।

—তুই কর্মচারী, সে কথা ভুলে যাস কেন!

—তুমিও তাই বলছ।

—বলছি কী সাধে! আমার অত্যন্ত লেগেছে বাবা। যা নয় তাই বলে যাবে আর তুই মুখ বুজে সহ্য করবি। যেখানে যা অর্ডার পাবে জুটিয়ে আনবে, মানুষের গুমুত সব ঘাঁটতে হবে তোকে!

—ইউরিন থেকে মেডিসিন তৈরি হয়, জান মা!

—নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছিস খোকা?

—উপায় কী। বলে কব্জির ঘড়িতে সময় দেখে কৃষ্ণ। ন'টা প্রায় বেজে গিয়েছে। সে সহসা উঠে ঘরের মধ্যে এসে দক্ষিণের একটি জানলা অল্প খুলে দেখতে পায় মাল নামছে ম্যাটাডর থেকে। সেই মাল কারখানায় গিয়ে ঢুকছে। তদারক করছে সুদেব। ওখানে শংকরও এসেছে। ললিত নস্করের সঙ্গে কথা বলছে একতালে। জানলাটা বন্ধ করে দেয় শুভেন্দু। তারপর বারান্দায় মায়ের কাছে ফিরে আসে। মা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে খুব অন্যমনস্কভাবে বসে রয়েছেন বেঞ্চের উপর। মা বোধ হয় কাঁদবার চেষ্টা করছেন। দৃষ্টি দূরে চলে গেছে, কিন্তু তা তীব্র। চোখের ডিমে অশ্রু হালকাভাবে জড়িয়ে পড়েছে।

কৃষ্ণ মাকে দেখে নিয়ে বেঞ্চে মায়ের পাশে বসে। ছেলের একটুখানি ছোঁয়া পেয়েই মহিমা অর্ধস্ফুট স্বরে ডুকরে ওঠেন—কী কপাল আমার। অসময়ে স্বামীকে খেলাম, বড় মেয়ে বিধবা হল। ছেলে গেল জেলে। পরপর সব ঘটে গেল। ভাবি কীসের জোরে বেঁচে আছি।

—তুমি কৃষ্ণের জোরে বেঁচে আছ মহিমা!

ছেলের মুখে এই রকম নৈর্ব্যক্তিক একটি সৎ উচ্চারণে মহিমার বুকের ভেতরটা আরও মোচড় দিয়ে উঠল। খুব কাতর গলায় তিনি বলে ওঠেন— শুধু জোর নয় শ্রীকৃষ্ণ, তোকে শুষে শুষে শেষ করে দিচ্ছি আমরা। আমি, জিতু, সুমি, বিদিশা— সব্বাই। একদিক থেকে কেমিক্যাল তোকে খেতে আসছে, অন্যদিক থেকে আমরা। কত খারাপ, না রে।

মায়ের কণ্ঠস্বরে আজ অদ্ভুত নাড়া খেয়ে ওঠে কৃষ্ণ। যদিও মা যখনই এইভাবে নিজের কপালকে দুষতে থাকেন এবং চোখে অবাধ্য অশ্রু এসে পড়ে মায়ের, তখনই কৃষ্ণ অত্যন্ত অসহায় বোধ করে। সে এই পরিস্থিতি সহ্য করতে পারে না। আজ মায়ের সেই একই কান্না এমনই ভাষায় প্রকাশ পেল যে শুভেন্দুর ভেতরটা অব্যক্ত

BanglaBook.org

পীড়ায় এবং আশ্চর্য মায়াতে বারবার পূর্ণ ও শূন্য হয়ে যেতে থাকল।

অত্যন্ত বিচলিত ভঙ্গিতে শুভেন্দু বলে উঠল—তুমি এসব কী বলছ মা। এভাবে ভাবতে নেই! তুমি একবার প্রকাশের কথাও ভাবো। যক্ষ্মা হয়েছে বুঝে বাড়িতে থাকতে পারেনি। হয় ওকে বাড়ির লোক কারখানায় ফিরে আসার জন্য চাপ দিয়েছে, নয়তো ও নিজেই পালিয়ে চলে এসেছে। এই বয়সে ওদের ওখানে কেউ অমন আইবুড়ো থাকে না। আমার মনে হচ্ছে, বিয়ে করতে প্রকাশ ভয় পাচ্ছে। নয়তো বিয়েতে বেচারির উৎসাহই নেই। কেন নেই?

—কেন? বলে মহিমা শঙ্কিত হয়ে ওঠেন।

—তাই ভাবছি। বলে কৃষ্ণ চুপ করে যায়। তারপর আবার সে দ্রুত টয়লেটে ঢুকে পড়ে। পেচ্ছাব করতে গিয়ে মূত্রদ্বারে জ্বালা অনুভব করে। তার কি সত্যিই কিছু হচ্ছে?

পেচ্ছাব কিছুই প্রায় হয় না। কারণ একটু আগেই সে পেচ্ছাব করেছে। দ্বিতীয়বারে শুধু জ্বালা। টয়লেট থেকে ছিটকে বেরিয়ে চলে আসে কৃষ্ণ। তার চোখমুখ কেমন বদলে গেছে।

শুভেন্দু হঠাৎ মাকে বলে ওঠে—দ্যাখো মা। আমরা প্রকাশকে লুকিয়ে রেখেছি। দত্তদের বাড়ির বউটা তোমার কাছে জানতে চায় যদি, কী বলবে?

—কী বলব। মহিমা জানতে চান।

কোনও জবাব দিতে পারে না শুভেন্দু। চুপ করে থাকে। হঠাৎ সে প্রকাশের ঘরে ছুটে যায়। ডাক দেয় চাপা গলায়—প্রকাশ।

ঘর অন্ধকার। আবার ডাকে—প্রকাশ। ও প্রকাশ।

সাড়া না পেয়ে কৃষ্ণ নিজেই ভিতরে ঢুকে সুইচ অন করে দেয়। ঘরে আলো হয়। শুভেন্দু খানিকটা চমকেই ওঠে। ঠিক মিটমিটে আলোর বাল্‌বটার তলায় একটা চেয়ারে মাথা এলিয়ে পড়ে রয়েছে প্রকাশ। শরীরটাও এলানো। এইভাবে থানার সেলে মার খেয়ে পড়েছিল কৃষ্ণ। মার খেয়ে খেয়ে নেতিয়ে পড়ার পর তাকে পুলিশ কালো গাড়িতে তোলে এবং জেলে নিয়ে যায়। সেখানেও মাথার উপর এই রকম একটা বাল্‌ব জ্বলত সর্বক্ষণ।

শুভেন্দু এবার প্রকাশের গায়ে একটুখানি ধাক্কা দিয়ে ডাকে। প্রকাশ বেশ কষ্ট করে চোখ মেলে।

—তুমি এইভাবে ঘুমোচ্ছ কেন? ন'টা বাজছে। ইঞ্জেকশন দেব। উঠে বসো।

—হ্যাঁ। বলে গা নাড়ায় প্রকাশ একটুখানি।

পার্টিজীবনে এক ডাক্তার নেতার কাছে কৃষ্ণ ইঞ্জেকশন করার বিদ্যেটা শিখেছিল। কারণ ওই ডাক্তারকেই কঠিন দীর্ঘস্থায়ী একটি রোগের জন্য ইঞ্জেকশন দিতে হত শুভেন্দুকে। বহরমপুর শহরে তিন মাস ছিল কৃষ্ণ। একটি গোপন শেলটারে থাকতেন ডাক্তারদা। ডাক্তারদার আসল নাম আজও জানে না শুভেন্দু। ডাক্তারদা ছিলেন বন্ধু অরুণাংশুর মামা। অরুণাংশুই কৃষ্ণকে নিষিদ্ধ রাজনীতির কেন্দ্রে খুব অল্প সময়ের জন্য টেনে নিয়ে যায়। ডাক্তারদার সঙ্গেই তিন মাস কেটেছে কৃষ্ণের, ওই ইঞ্জেকশন

BanglaBook.org

দিয়েই মানুষটাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল। যখনই ইঞ্জেকশন হত, ডাক্তারদা সচেতনভাবে তাঁর নিজের হাতের শিরাটি চিনিয়ে দিতেন কৃষ্ণকে, বলতেন, করো, কোনও ভয় নেই। তারপর দু' মাস মতন কৃষ্ণ অন্যত্র চলে গিয়েছিল। ছ' মাস পর বাড়ি ফিরে আসে, মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। ভোররাতে যাদবপুরের এক বন্ধুর বাড়ি থেকে পুলিশ তাকে অ্যারেস্ট করে। সেদিন সে মায়ের কাছে ছিল না।

শুভেন্দু শুধাল—তুমি কি কাজ করতে পারবে? শোনো, কাজ কিন্তু করতে হবে। হেভি অর্ডার এসেছে প্রকাশ। রক্ত উঠছে?

—না।

—তা হলে বেরিয়ে এসো, লোকে দেখে দেখুক, তোমার কিছু হয়নি। বেঞ্চিতে বসবে বারান্দায়। ইঞ্জেকশন হবে। তারপর কাজ শুরু করব আমরা।

—জি। একটা স্বপ্ন দেখলাম কৃষ্ণদা।

—স্বপ্ন?

—পাঁচটা গাই ব্রিফ রোতি হ্যায়। বহুৎ রোতি হ্যায়। মা মা করকে রোতি হ্যায়। কান্নার চেয়ে করুণ শোনায় বিহারি যাদবের কণ্ঠস্বর। সে জিভ দিয়ে আঠা আঠা ঠোঁট চাটে।

প্রকাশের চোখে জল। অবাক হয়ে ওই অশ্রুর দিকে চেয়ে থাকে কৃষ্ণ। হাত ধরে। চেয়ার থেকে টেনে তোলে। উঠে দাঁড়িয়ে থর থর করে কেঁপে ওঠে প্রকাশ, যেন সে পারদের মতো কোথায় গড়িয়ে চলে যেতে চাইছে। মুখ শুকনো, চোখের তলায় কালি। জিভে জল নেই। মুখ হাঁ করে রেখেছে পুকুরের কাঠ মাছের মতো, দৃষ্টিও ঘোলাটে, সে তার নিজেরই অনুভূতির কাদার মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে।

হাত ধরে প্রকাশকে বাইরে বার করে আনে কৃষ্ণ। গায়ে স্থির তাপমাত্রার জ্বর, ঘুসঘুসে শুকনো কাশি দিল দু'বার, তারপর চকচক শব্দে জিভ নাড়ল মুখের মধ্যে। জিভে সাদা ছত্রাক। বেঞ্চে বসল বাষ্পের শরীরের মতো। তারপর কৃষ্ণের চোখে ঠাণ্ডা দৃষ্টি রেখে বলল—লালি গাই বহুৎ রোতি হ্যায় শিউজি। কালি গাই ভি রোতি হ্যায়। তালাব সে পানি ভর লে আও। ধলি গাই দুধ নহি দেগি, উসকি তবিয়ত আচ্ছি নহি, দুধকে বদলা খুন নিকলতা। খুন কিঁউ কৃষ্ণদা, রক্ত কেন মাইজি। গাই মুঝে পুকারতি। কেন ডাকে? সারি দুনিয়া ভরকে হাজারোঁ গাই মুঝে পুকারতি একসাথ। আও পরকাশ, চলে আও। কঁহা জাউঙ্গা, কঁহা? হে রাম! বলে চোখ বন্ধ করে প্রকাশ যাদব।

সিরিঞ্জ প্রস্তুত করে কৃষ্ণ। নিজেদের কারখানার ডিস্টিল্ড ওয়াটার নেয়। সূঁচ বেঁধায় প্রকাশের শরীরে। 'অক্' করে প্রকাশ একটা শব্দ করে মুখে। তারপর ওষুধ শরীরে নিতে নিতে বলে—শিউশরণ যাদব, মেরা গাঁও কা আদমি থা। উসকা খাটাল জব চলা গয়া, তব্ ওহ্ পাগল হোকর গাঁওমে লোটা। অব ওহ্ ক্যা করতা শুনবেন কৃষ্ণদা। গোরুর ডাক ডাকে। হাম্বা—গোঁ-ও-ও, হাম্বা...

শুনে কৃষ্ণ কেমন চমকে উঠল। এবং তখনই তার মনে হল, প্রকাশের শরীরে সে বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। প্রকাশকে বিষের ধীর ক্রিয়ায় মেরে ফেলবে।

BanglaBook.org

—চুপ করো প্রকাশ। কথা বোলো না।

—জি। লেকিন গাই কিঁউ রোতি হ্যায়? দুধকে বদলা খুন কিঁউ নিকলতা হ্যায়? বলিয়ে মা, গাই কাঁদছে, কেন কাঁদছে মা? বলে মহিমাকে জানতে চায় প্রকাশ। যেন সে একটি সরল প্রশ্ন করছে কাউকে। তার প্রশ্ন, সরল গাভিরা কাঁদে কেন। আবার জল এসে পড়ে প্রকাশের চোখে। প্রশ্নটি তার কাছে বার বার উঠে আসতে চাইছে।

—মা মা করকে কাঁদে মাইজি। নিঁদমে ঘুলতা হুয়া ইয়ে পুকার মুঝে ছোড়তা নহি। হে রাম! বলে আবার চোখ বন্ধ করে প্রকাশ যাদব। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি অ্যালুমিনিয়মের বড় ধরনের ঘটি। আধ কিলোর বেশিই দুধ ধরে তাতে। সেই ঘটির দুধের মধ্যে চোখ চালিয়ে আঁতকে ওঠে প্রকাশ। ফোঁড়া ফেটে পুঁজরক্ত যেভাবে রং ধরে, দুধের রং সেই রকম। এবং কালো। সবিতা দত্তর হাত থেকে সেই পাত্রটা নিয়ে নেয় প্রকাশ যাদব। তারপর বলে—চোনা, দুধ খারাপ হয়ে গিয়েছে। আজ দুধ হবে না।

সেই দুধ পুকুরের জলে ফেলে দিয়ে আসে এবং খালি পাত্র ফিরিয়ে দেয় সবিতাকে। সবিতা কিছুই বুঝতে পারে না। কেবল খানিকটা অবাক হয়। স্বপ্নে প্রকাশ ওই ঘটি থেকে অবিরাম পুকুরে রক্তাক্ত দুধ ঢেলে চলে। সেই জল বাহকে করে তুলে নিয়ে গিয়ে গোরুকে জাব দেওয়া হয়। তাই-ই কি সত্যি দিয়েছে প্রকাশ?

—ভগবতী, তুমি এই যাদবকে মাফ করে দাও মা! মাফি মাঙতা হুঁ মাই। বলে যায় বিড়বিড়িয়ে, যেন ফ্লাস্কের কেমিক্যালে বুদ্বুদ উঠছে। তারপর টেনে শ্বাস ফেলে একটা।

যখন দুধের বদলে রক্ত এল, সেই দিনগত রাত্রে সারারাত ঘুমাতে পারল না শিউশরণ। মাঝে মাঝে গোরুর পেটের তলায় সেঁধিয়ে বাঁটগুলোর দিকে অঞ্জলি পেতে ডুকরে উঠছিল, মুঝে মাফ কর দে বেটি। সেই কড়া এবং ভাঙা গলা। এখনও শুনতে পায় প্রকাশ। সেই ডাকটা যেন আকাশের দুধের মতো গঙ্গা থেকে আসে একটি তীক্ষ্ণ ধারার মতো, যেন আকাশে রয়েছে সহস্র সহস্র বাঁট, দেবদূতরা যেখানে দুইছে পবিত্র খাঁটি দুধ। সেই দুধে আকাশের দুধপথ তৈরি হয়েছে। সেই দুধে কখনও খাটালের মাছি বসে না, যে মাছি কারখানার উপচানো পথভাসানো পুকুরে গড়ানো জলে বসে খাটালে এসেছিল। এই মাছি একদিন সবিতার ঘটিতে কি পড়েনি? পড়েনি কি কারখানার মেঝেতে খেতে বসা প্রকাশের ভাতের থালায়?

—মা, গাই কাঁদছে মা! আবার বলে ওঠে প্রকাশ। তারপর আবার বলে—হে রাম!

কৃষ্ণ বলে—চুপ করো প্রকাশ যাদব। আমাদের একটু বাদেই কাজে যেতে হবে।

প্রকাশ আর কোনও কথা না বলে বেঞ্চের উপর চুপচাপ বসে থাকে।

কারখানায় ঢোকার আগে দুটো ডিম, চারটে কলা এবং খানিকটা ছানা একটি প্লেটে সাজিয়ে এনে প্রকাশকে খেতে দেন মহিমা। সমপরিমাণ একই খাবার কৃষ্ণকেও দেন। দু'জন যখন বারান্দার দেওয়াল-ঘেষাঁ বেঞ্চে বসে খাচ্ছিল, তখন সহসা রুদ্ধ বেগে কান্না ঠেলে উঠতে চাইল। তাঁর মনে হল, তিনি সন্তান নয়, দু'টি পাট-মুনিষকে খেতে

BanglaBook.org

দিয়েছেন দামি খাবার। কাজে নামার আগে বড়ই যত্ন করে খাচ্ছে ওরা। কিন্তু ওইভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে প্রকাশের পাশাপাশি বসেছে কেন কৃষ্ণ? বার বার ঘন দৃষ্টি মেলে প্রকাশের থালা লক্ষ করছে, শুভেন্দুর দৃষ্টিতে একটি দুর্মূল্য স্নেহ ঝরে পড়তে দেখে মহিমা বিস্মিতও হন। এই ছেলে একদিন নিজেকে গরিব মানুষের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছিল কিছুকাল। একবার কেউ সেই আগুনের রাজনীতি করলে বোধহয় সেই আদর্শকে একেবারে ভুলে যেতে পারে না, তাদের মনের গড়নটাই হয়ে ওঠে আলাদা। নইলে একজন যক্ষ্মা রোগীর পাশে বসে ওইভাবে খেতে পারে কেউ? যক্ষ্মা যে ছোঁয়াচে তা কি জানে না কৃষ্ণ?

মহিমা ভাবলেন, নাম যার কৃষ্ণ, মাঝে মাঝে যাকে শ্রীকৃষ্ণ বলে ডাকেন, সে জানে না কীসে কী হয়! একটু আগেই তো কৃষ্ণকে শ্রীকৃষ্ণ ডেকেছেন মহিমা। এতক্ষণ পাগলের মতো করছিল প্রকাশ। ওর স্বপ্নটা কী অদ্ভুত! হাজার হাজার গাভির কান্না শুনতে পায় ছেলেটা, আর সেই কথা বলেও কেমন সুর করে! বুকটা ব্যথিয়ে ওঠে। সেই ব্যথাই কি কৃষ্ণকে খাওয়ার সময় প্রকাশের পাশে ওইভাবে বসিয়ে দিল? তবু বলি, বলে আপন মনে মহিমা বললেন, এই কি তোর ঠিক কাজ খোকা! তোর যদি সত্যি কিছু হয়....

মহিমা এই ঘনিষ্ঠ খাওয়া দাওয়ার প্রতিবাদ করবেন ভাবলেন। তাই খাওয়া শেষ হলে অন্য ঘরে ডাকলেন ছেলেকে। বলবারও চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। আসল কথা আটকে গিয়ে অন্য কথা বার হয়ে এল মুখ দিয়ে।

মহিমা বলে বসলেন—বলছিলাম....

—হ্যাঁ বলো।

—প্রকাশ বিয়ে করতে চায় না। কিন্তু তুইও কেন চাস না খোকা! এখনও সব বয়েস চলে যায়নি তোর। তোরও কি উৎসাহ নেই? তাহলে তুই বিধবা বোনের অমন করে তাড়া লাগিয়ে বিয়ে দিলি কেন!

কৃষ্ণ বলল—ওহ্, এই কথা!

—কেন খোকা, এই কথাটা কি খারাপ কিছু? তোর সাহস নেই একথা আমি বিশ্বাস করি না। তোকে একটুখানি স্বার্থপর হতেও বলি শ্রীকৃষ্ণ। দ্যাখ, আমি তো চিরকাল থাকব না, তখন তোকে কে দেখবে? বোনেরা?

—ধরো তাই।

—না, দেখবে না।

—কেন?

—তুই কি বুঝিস না কিছু, সংসারে কে কেমন। বিদিশার কথাই ধর...

—থাক মা।

—কেন থাকবে? ওর বিয়ে কেন দিলি তুই? দিলি এই জন্যে যে...

—ওর বিয়ের পর আমি বিয়ে করব।

—হ্যাঁ।

কৃষ্ণ অত্যন্ত অদ্ভুত করে সশব্দে হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই বলে ওঠে—

BanglaBook.org

দ্যাখো, জেলখাটা লোক আমি। তাই না? জীবন একটা অ্যাডভেঞ্চার মহিমা। দুঃসাহসিক অভিযান। আবার এই জীবনটা একাধিক বোবা মানুষের সংলাপ, কেউ কাউকে বুঝতে পারে না।

—বরাবরই কথা এড়ানোর জন্য তুই কঠিন করে কথা বলিস। আমি কিন্তু বোবা নই, আমার কথার স্পষ্ট মানে আছে।

হা হা করে আবার হেসে ওঠে কৃষ্ণ। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলে—তাহলে কঠিন কথাটাকে সহজ করেই বলছি তোমাকে। যদিও কথাকে সহজ করতে গেলে বিপত্তি আছে। সেটা হচ্ছে, দামি কথা অনেক সময় কঠিন হয়, তাকে সহজ করলে কথাটার আসল সত্তা মাটি হতেও পারে, সৌন্দর্য খোয়া যেতে পারে। যেমন ধরো, বিদিশার বিয়ে দিয়ে আমি আনন্দ পেয়েছি, শুধু সেই জন্যই বিয়েটা দিয়েছি। না দিলে অন্যায় হত।

—অন্যায় কেন হবে?

—এই তো সহজ কথাও বুঝতে পারছ না। আনন্দ এবং অন্যায়, দুটো কথাই তো তোমার চেনা।

একটু কেমন হকচকিয়ে ওঠেন মহিমা। তবু বলেন—তোকে কথায় পারব না খোকা। কিন্তু একশো বার বলব, বিদিশা তোর উসকানিতেই বিয়ে করে বসল। ওর একদম সাহস ছিল না। আমি মনে করি, বিদিশা খুব নিষ্ঠুর কাজ করেছে। ছেলে জিতুকে নিয়ে ওইভাবে উঠে পড়ে লাগল রামকৃষ্ণ মিশন হস্টেলে রেখে পড়াবে বলে। আগে বুঝিনি কীসের অত আঠা। রাতদিন ওই এতটুকুনই বাচ্চা বই মুখে করে রইল, তারপর...

মায়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কৃষ্ণ বলে ওঠে—দ্যাখো মা। জিতুকে রামকৃষ্ণ মিশন-স্কুলের হস্টেলে রাখার প্ররোচনা যদি বলো, তা আমারই। আমিই চাইছিলাম বিদিশা আবার বিয়ে করুক। স্বদেশ বিদিশাকে চায়। বিদিশার আগের স্বামীর বাচ্চাকে চাইবে কেন।

—চাইবে না।

—না চাইতেই পারে। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, জিতুই স্বদেশ-বিদিশার বিয়ের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। স্বদেশ চাইছিল, বিয়ের পর বিদিশা যেন বাচ্চা সঙ্গে করে শ্বশুর বাড়ি না ঢোকে। তাতে যে স্বদেশের মাথাকাটা যায়। আবার এদিকে বিদিশা সন্তানের ব্যাপারেও অত্যন্ত স্পর্শকাতর। ফলে হচ্ছিল কী...

—বল্, থামলি কেন। বলে যা ওই আনন্দের দাম তোকে সারাজীবন চুকাতে হবে? অত যে স্পর্শকাতর বলছিস, কই মাসে তো একবারের বেশি জিতুকে হস্টেলে এসে দেখে যায় না বিদিশা। তার কেন সময় হয় না। তাছাড়া হস্টেল খরচও পুরোটা দেয় না ওরা। আর তুই?

এবার নিশ্চুপ এবং গম্ভীর হয়ে যায় শুভেন্দু। ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে আসে। এসে বেঞ্চের উপর কাঠের মতো বসে থাকা প্রকাশের সামনে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে গায়ে হাত রেখে নাড়া দেয়।

BanglaBook.org

—ওঠো প্রকাশ, কারখানায় চলো। শোনো, গাভি একটি করুণার কাব্য। তুমি বুঝবে না জানি। মা-ও বুঝবে না। এ একটি শক্ত কথা। কিন্তু এমন একটি চমৎকার কবিতা কে লিখেছেন? শুনলে অবাক হবে, এই লাইনটি বেরিয়েছে মহাত্মা গাঁধীর কলম থেকে। কবিতা নয়, কবিতায় বড় একটা মন ছিল না মহাত্মাজির, তবু কী অদ্ভুত দ্যাখো, কাব্য বলতে তিনি একটি গাভিকে বুঝেছিলেন, সেই গাইকে আমরা বিষাক্ত করেছি। ওহ্ প্রকাশ। আমরা কী করেছি, আমরা জানি না।

প্রকাশ নাড়া খেয়ে চমকে উঠে নিজের মধ্যে ফিরে আসে। এতক্ষণ সে কোথাও চলে গিয়েছিল। কোথায় যে গিয়েছিল, তা সে নিজেও স্পষ্ট করে বুঝতে পারে না। হয়তো সে জন্মভিটায় চলে গিয়েছিল মনে মনে। গ্রামের পথে পথে ঘুরে মরেছে পাগল শিউশরণের পিছুপিছু।

একজন অসুস্থ শ্রমিক, যে কিনা পাহরাদারও বটে, তাকে ঠেলে নিয়ে যেতে হয় কৃষ্ণকে। যেতে হয় কারখানারই মধ্যে। ধাতু-গরলের মধ্যে, ধাতু-বাষ্পের মধ্যে। প্রকাশের গ্যাস-মাস্ক নেই, পায়ে উপযুক্ত জুতো নেই, আই -প্রোটেকটিং চশমা নেই, কিছুই নেই। কারণ সে একজন পাহারাদার, একটি ক্ষুদ্র কারখানার আধা-শ্রমিক। তার জীবনের সুরক্ষার জন্য কোনও উপযুক্ত ব্যবস্থার কথা এখানে হাস্যকর প্রস্তাব। তাকে বাঁচতে হলে অদৃশ্য বা দৃশ্যমান গ্যাস-বলয়ের মধ্যে কেবলমাত্র প্রাণের জোরে বাঁচতে হবে।

তাকে দেখবার যোগ্য এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নেই। হাসপাতাল নেই। তার যক্ষ্মার চিকিৎসা হচ্ছে। কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে অজানা কোনও ব্যাধি। হয়তো সেই রোগের কোনও নামই নেই। কারণ সেই রোগকে চিনে নাম দেবার মতো কোনও ডাক্তার এখানে নেই, বিজ্ঞানী তো লক্ষ যোজন দূরে। পেশাগত রোগের ক্ষেত্রে ধাতুনাম দিয়ে অনেক সময় রোগের নামকরণ হয়। অনেক সময় যেখানে এই রোগ জন্মায়, সেই স্থানের নাম দিয়ে রোগের নাম হয়ে থাকে। যেমন ধাতুনাম অনুযায়ী একটি নাম মার্কারি পয়জনিং । একটি রোগ অ্যাসবেসটোসিস, এই রোগটি অ্যাসবেস্টস ব্যবহারকারী কারখানার রোগ। যেমন স্থাননাম নিয়ে জন্ম একটি রোগের নাম মিনামাতা ডিজিজ। জাপানের মিনামাতা উপসাগরীয় খাঁড়ি অঞ্চলে পারদ মিশ্রিত বর্জ্য ফেলার পরিণামে এই রোগটি হয়েছিল সেখানকার মানুষ ও শ্রমিকদের। এই রোগে মরেছে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ, কুড়ি হাজার মানুষ চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেছে।

এইসব অদ্ভুত বিচিত্র রসায়ন জ্ঞান রয়েছে শুভেন্দুর, তা-ও রয়েছে সে এককালে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন পড়েছিল বলে। কিন্তু প্রকাশের কিছুই জানা নেই, সে কীসে ভুগছে কোনওকালে জানতেও পারবে না। তার মৃত্যু হয় যদি, সে জানবে না কোন ব্যাধি তাকে মারল। সে জানবে না, কিন্তু কৃষ্ণও কি জানতে পারবে সবকিছু!

বাড়ির বাইরে বেরিয়ে কারখানার কাছে, পথের উপর দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ অ্যাসবেস্টস ছাদটার দিকে চাইল একবার, অগ্নিপ্রদাহের একটি কুণ্ডে এবার তাদের ঢুকতে হবে। ছাদের দিক থেকে অতঃপর চোখ চলে আসে দত্তদের ফালি বারান্দায়। ওখানে চেনা একজন চোখের ডাক্তারকে দেখতে পায় শুভেন্দু। মনে মনে সে অদ্ভুত ভয় পায়।

রাস্তায় ম্যাটাডরটা নেই। মানুষের পেচ্ছাব কারখানায় নামিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ হল ফিরে গেছে। গাড়ির ফিরে যাওয়ার শব্দ বাড়ির ভেতরে থেকেই টের পেয়েছিল তারা।

কারখানায় সুদেব শংকর রয়েছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। শুভেন্দু প্রকাশের একটি হাত ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। প্রকাশ হাঁপাচ্ছে। মনে হচ্ছে প্রকাশের জিভটা কুকুরের মতো বাইরে বেরিয়ে পড়তে চাইছে।এ শুধু যক্ষ্মা নয়, এ আরও কিছু। মাথাটা ঝুঁকে পড়তে চাইছে। থুতনিটা বুকে ঠেকিয়ে আরাম পেতে চাইছে প্রকাশ।

—ঘাড় তোলো প্রকাশ। মনে রেখো, গাভি একটি করুণার কাব্য। করুণা এবং কাব্য—এই দু'টি শব্দই তুমি চেনো না।

—জি

—চেনো?

—নহি।

—মৌ-এর অন্ধ চোখে যে জল আসে, তার নাম করুণা। সেই জল আমাদের করুণা এবং ক্ষমা করে।

—আঁসু?

—হ্যাঁ, অশ্রু। ঠিক আছে?

—জি।

—না, তা নয়। গাইগরু যে দুধ দেয়, ওটা হল গাভির করুণা। বুঝলে?

—হ্যাঁ, কৃষ্ণদা [আসলে প্রকাশ ঠিক কিছু বুঝতে পারে না, ভুল মাথা নেড়ে যায়।]

—তুমি ঘাড় তুলে দ্যাখো।

প্রকাশ ঘাড় তোলার চেষ্টা করে। তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে ওঠে। সে অনেকক্ষণ দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে দত্তদের বাড়ির দিকে। ধীরে ধীরে ঘোলাটে ভাবটা কেটে যেতে থাকে।

সবিতা হঠাৎ প্রকাশ এবং শুভেন্দুকে দেখতে পেয়েছে। চেয়ারে বসিয়ে মৌকে পরীক্ষা করছেন ডাক্তার। কাছেই পথের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে কৃষ্ণরা। ডাক্তার কথা বললেই সব শোনা যাচ্ছে। কারখানা এবং দত্তবাড়ি একটি মাত্র প্রাচীরের ব্যবধান বই তো নয়।

একটু তফাতে মৌয়ের ঠাকুরদা অন্য একটি চেয়ারে বসে রয়েছেন। অনেকক্ষণ ধরে মৌকে দেখে ডাক্তার বললেন— গায়ে ঘা হয়েছিল কখনও?

—হয়েছিল ডাক্তারবাবু। পেটে অসম্ভব জ্বালা করত, কাটা পাঁঠার মতো করত মেয়ে। সে কী চিৎকার! পরে একদিন বলল, সব কেমন ঝাপসা দেখছে। ভাল করে বলতে তো পারে না। ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি চলে গেল। কাছেই দাঁড়িয়ে আমি, মৌ আমাকে দেখতে পাচ্ছে না, কাপড়ে চোখ বেঁধে মানুষকে ছেড়ে দিলে মানুষ যেমন করে, সেই রকম করে সবকিছু হাতড়াতে চেষ্টা করে, একটিই বাচ্চা আমাদের, মাঝে মাঝে একটু-আধটু হঠাৎ করে দেখতে পায়। কী হবে ডাক্তারবাবু! বলতে বলতে

BanglaBook.org

চোখে আঁচল চেপে ধরে সবিতা দত্ত।

ডাক্তার মৌকে ছেড়ে সটান খাড়া হয়ে উঠলেন। তারপর বললেন— আপনাদের যেসব ওষুধ আগে আমার চেম্বারে বসে দিয়েছিলাম, তাতে কোনও কাজ হয়নি। কিছু মনে করবেন না, আমি রোগ ধরতে পারছি না। আন্দাজে চিকিৎসা করা যায় না। মেয়ের অ্যানিমিয়াও হয়েছিল। আজও অ্যানিমিয়ার ওষুধই দিয়ে যাচ্ছি। দেখুন কী হয়? কেবলই মনে হচ্ছে, আপনার মেয়ে বিষাক্ত কিছু খেয়েছে অথবা পেটের মধ্যে এমন কিছু ঢুকেছে ... বলি কি পায়খানা, পেচ্ছাব, রক্ত সব পরীক্ষা করিয়ে আনুন। লিখে দিচ্ছি। আপনার মেয়ে দৃষ্টি ফিরে পাবে কি না বলতে পারছি না। নিষ্ঠুর শোনাবে, তবু বলছি ...

—না, আর বলবেন না। আপনি শুধু লিখে দিন বলে ওঠে সবিতা।

—কী লিখে দেব? ডাক্তার অবাক হন।

একটা ঢোঁক গিলে সবিতা বলল—কারখানার দোষে আমার মেয়ে দৃষ্টি হারিয়েছে।

—কারখানা? বলে খানিকটা বিস্মিত হয়ে ওঠেন ডাক্তারবাবু।

—পাশের ওই অ্যাজবেস্টস ছাতঅলা বাড়িটা, একটা কারখানা। দেখুন।

সবিতার দৃষ্টির নির্দেশে কারখানার দিকে চাইলেন ডাক্তার নন্দী। নাকে নিঃশ্বাস টানলেন গাঢ় করে এবং বুঝলেন একটা বিশ্রী গন্ধই তো বটে! এতক্ষণ গন্ধটা ভেসে আসছিল। ডাক্তারের চোখ কারখানা ছুঁয়ে শুভেন্দু আর প্রকাশের উপর এসে পড়ল। প্রকাশ ঘাড় নামিয়ে নিল।

ডাক্তার জানতে চাইলেন—ওরা কারা?

—ওরাই কারখানা চালায়। বয়স্কটা পুরনো নকশাল। ওরই বুদ্ধিতে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারের ছেলে শংকর তার বন্ধু সুদেবকে সঙ্গে করে কারখানা গড়েছে। যখন কারখানা হয়, তখন আমরা এখানে আসিনি। তখন অবিশ্যি শংকরের বাবা কমিশনার হয়নি। আপনি লিখে দিন ...

—আপনার কথার মধ্যে পলিটিক্সের গন্ধ পাচ্ছি মিসেস দত্ত। কমিশনার আবার আমাকেই চোখ দেখান। আন্দাজে আমি কী লিখে দেব আপনাকে! আমি রোগের নাম লিখে দিতে পারি, ওষুধের নাম লিখব। কিন্তু কারখানা থেকে এই রোগ হল কি না লিখতে পারব না।

—কেন? কেন পারবেন না?

—কারখানা কতটা বায়ু বা জলদূষণ করে তা মাপবার জন্য এখানে ব্যবস্থা নেই। তা করতে হলে ডাক্তারকেও নির্ভর করতে হয় ল্যাবরেটরির উপর। এই সব কাজ আমার নয় মিসেস দত্ত। তবে হ্যাঁ, আপনার সন্দেহ অমূলক নয় হয়তো। আজ চলি।

—আপনি তা হলে লিখে দেবেন না?

—দেখুন। বলে পা বাড়িয়ে থেমে পড়লেন ডাক্তার। তারপর কড়া গলায় বললেন, আপনারা অন্য ডাক্তার দেখান, আমি নিজেই জানি না, কোনও কেমিক্যাল পয়জনিং হলে কোথায় যেতে হয়। তবে শুনেছি ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত এ রাজ্যে এই

BanglaBook.org

সব চিকিৎসার জন্য কোনও কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। হাসপাতালও নেই। সাধারণ হসপিটালগুলোতেও এই সব রোগের চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নেই। হতে পারে এখন হয়েছে, আমি জানি না। আমি এই রোগের ডাক্তার নই। ডি পেনিসিলামিন বলে একটা ওষুধের নাম মনে পড়ছে। আন্দাজে সেই ওষুধ প্রেসক্রাইব করা ঠিক হবে না। আশা করি, আপনাকে বোঝাতে পেরেছি।

—না, পারেননি। আপনি ভয় পাচ্ছেন।

ডাক্তার নন্দী এবার হেসে ফেলে বললেন—ভয় পাওয়ারই কথা। চলি। বলে ডাক্তার গ্রিলের দরজা ঠেলে বেরিয়ে পড়েন।

সবিতা গলা তুলে বলে ওঠে—কমিশনারের ডাক্তার আপনি। আমাদের দেখবেন কেন! আপনি পালিয়ে গেলেন ডাক্তারবাবু! বলতে বলতে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল সবিতা।

পৃথিবীর কোনও মায়ের কান্নাই কোনও কালে সহ্য করতে পারেনি শুভেন্দু। কান্নার হেতু না জেনেই যৌবনে তার চোখে জল এসে পড়ত। আজ সে জানে, সবিতা কেন অমন করে কাঁদছে। সবিতা নয়, কৃষ্ণ এবং একমাত্র কৃষ্ণই জেনেছে মৌ কেন ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে গেল। গাভির বাঁটে কীভাবে ধাতু-গরল জমে উঠেছিল, সেই রসায়ন বিক্রিয়া সবিতার জানার কথা নয়। সবিতা কখনও অদৃশ্য গ্যাস দেখতে পায় না, যা কেবল কৃষ্ণই দেখতে পায়। সোকপিট উপচানো জলে কত বিষ, পরিমাপ না থাকলেও কৃষ্ণই জানে, ওই পুকুরের জল বিষকুম্ভ, তাকে মন্থন করে কখনও অমৃত উঠবে না।

সাধারণ এক গৃহবধূ সবিতা। কারখানার দুর্গন্ধই সে বোঝে, নোংরা বর্জিত জলের ধারা সে দেখেছে। কিন্তু সে জানে না কাকে বলে টক্সিক লিমিট। বউটি জানে না, ড্রেগার-টিউব দিয়ে মাপা যায় বাতাসে কতটা গ্যাসীয় দূষক পদার্থ উপস্থিত। কৃষ্ণ জানলেও কখনও সে মেপে দেখেনি কারখানার বাতাস। গরিব কারখানা জানে না ড্রেগার টিউবের ব্যবহার, জানবে না কখনও। সবিতা হয়তো শুধু গন্ধ শুঁকে নির্ধারণ করেছে, তাদের বিপন্নতা। দূষিত জলের বয়ে যাওয়া দেখে বুঝেছে, কারখানার ওই জল অমৃত নয়। কিন্তু সে বোঝেনি, গাভির বাঁট কেন ফেটে গিয়েছিল।

সবিতার স্বামী ইঞ্জিনিয়র ডেকে বাড়ির দেওয়াল পরীক্ষা করিয়েছে, কিন্তু বুঝতে পারেনি কাব্যময়ী, করুণাময়ী যে সব গাভি, তারাই দুধ খাইয়ে শিশু মৌকে নষ্ট করে দিয়েছে। এ দেশে সমূহ বিষ একটি সরল মনের মতন বয়ে যায়, যাকে খায়, সে বুঝতেও পারে না। বোঝার যোগ্যতা ভারত-মন অর্জন করেনি। এই ভারত মানুষকে বেকার করেছে, কাজ না পাওয়া মানুষ কোনও দুঃখই বুঝবার জন্য বসে নেই। শুভেন্দু কৃষ্ণকে বলল, আমি কেন থাকব। আমার চুল সাদা হয়ে গেছে, আমি অকালে বুড়ো হলাম, কেউ কি চেয়ে দেখে শ্রীকৃষ্ণ? তোমার বোবা সংলাপ, তোমাতে আমাতে, কেউ তো শোনে না।

না হে কৃষ্ণ, একটি মেয়ে তোমার কথা কান পেতে শোনে। চুল তোমার সাদা হয়ে গেলেও তোমাকে সে এখনও যুবক মনে করে। তুমি তাকে একদিন কাব্য করে বলে

BanglaBook.org

ফেলতে চেয়েছিলে, যেদিন আমাকে তুমি সত্যিকার ভালবাসবে উর্বী, সেদিন আমার চুল কালো হবে। কিন্তু সে কথা বলতে পারনি কেন?

ভারত একটি ধোঁয়াশা। কৃষ্ণ বলল শুভেন্দুকে। কৃষ্ণ দেখল, সবিতার থুতনিতে এক টুকরো গ্যাস-ধোঁয়া লেগে রয়েছে। কৃষ্ণের প্রাণ ছেড়ে আর্তনাদ করে উঠতে ইচ্ছে করল। শুভেন্দু হেসে উঠে কৃষ্ণকে বলল, ড্রেগার টিউব! আচ্ছা তো বায়! তুমি মাপবে গ্যাস-দূষকের টি এল ভি মাত্রা। তোমার তো ভাল হাতমোজাই নেই। তোমার মাস্ক ফুটো। তোমার বুটের সামনেটা ফোঁপরা, আঙুল বেরিয়ে পড়ে। আর যদি মাপতেই পার, মেপে দেখে তুমি নিজেই কি কারখানা বন্ধ করে দেবে? বলো দেখি, একটি কুব্জ কখনও দুনিয়ায় চিত হয়ে শুয়েছে কি না। বামন কখনও চাঁদে হাত দিয়েছে। তুমি তো কারখানার ওয়ার্কার হে, চারআনির পার্টনার। চলো, চলো কাজে লাগো।

শুভেন্দু হিঁচড়ে টানল রুগ্ণ প্রকাশকে। বিড়বিড় করল দুর্বোধ্যভাবে, চ গাইয়ের বাচ্চা। হাম্বা করে কাজে লেগে যা। মগে করে পেচ্ছাব মাপতে হবে না! যাদব তুই, গাই তোর মা। মা কাঁদলে ছেলে কি ভাল থাকে বাছা! চ, ঘাড় তোল। ওঠা ঘাড়, আঁখ সিধা কর। শুধু ভেবে দ্যাখ্, প্রস্রাব থেকে ওষুধ হবে, যা বর্জ্য, সবখানি তার বর্জনীয় নয়; ওষুধ হবে, এই বিশ্বাস রেখে কাজ করতে হবে। বিষের মধ্যে তোমার শ্বাস-প্রশ্বাস, তবু জানবে পৃথিবী বিষের ভিতরে লুকোনো কোনও স্বচ্ছ-বিস্ময় পাতনে ধরে নেয়। কী হয় তাতে, বিজ্ঞানী বলবেন, তুমি শুধু অপবিত্র বর্জ্যকে শোধন আর শুদ্ধ করে দাও। প্রেম একটি দূষিত বিশ্বের স্বচ্ছ স্ফোটন-কণিকা, তাকে ছেঁকে তোলবার জন্য মনের একটি আশ্চর্য কারখানা দরকার। তাই না শুভেন্দু?

শুভেন্দু কৃষ্ণের কথায় কান দিল না। প্রকাশকে ঠেলতে ঠেলতে কারখানায় ঢোকাল। প্রায় হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য কান্না থামিয়ে চেয়ে দেখতে থাকল সবিতা। তার চোখে বিপন্ন-বিস্ময় আর বিষণ্ণ ব্যথা। বুকে ধরা মৌ একটি নিরর্থক অন্ধ পুতুলের মতো চোখ পিটপিট করছে। সে যদি আবার পৃথিবীকে দেখতে পেত!

কিছুক্ষণ বাদে কারখানা চালু করল শুভেন্দু। কাঁপতে কাঁপতে মগে করে তুলে তুলে পেচ্ছাব ফানেল দিয়ে ফ্লাস্কে ভর্তি করল প্রকাশ। অ্যামোনিয়ার গন্ধে আজ এই প্রথম ভেতরটা গুলিয়ে উঠল শুভেন্দুর। অথচ এর চেয়ে অনেক কড়া দুর্গন্ধ সে সহ্য করেছে। আজ তার নিজেকে অশুচি মনে হচ্ছিল। কারখানায় সুদেব ছিল না। তার ভয়ানক রাগ হচ্ছিল। অ্যামনিয়ার গন্ধ যেন দলা পাকিয়ে তার নাসারন্ধ্র দিয়ে তেড়ে ঢুকছিল। প্রকাশ কাজ করতে করতে কাশছিল। ওই দুর্গন্ধই তাকে কাহিল করে তুলেছিল। এক সময় প্রকাশ পারল না, গমকে গমকে রক্ত তুলতে শুরু করল মুখ দিয়ে। মেঝেয় রক্তের স্রোত বয়ে গেল।

শুভেন্দু ছুটে এসে প্রকাশকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। মুখের কাছে আঁজলা পেতে ধরল। আঁজলা উছলে রক্ত ঝরে পড়ল মেঝেতে। হাতের কনুই গড়িয়ে রক্ত টুপিয়ে পড়তে থাকল। অত্যন্ত দিশেহারা বোধ করছিল শুভেন্দু। তার মনে হচ্ছিল, প্রকাশের

BanglaBook.org

দেহের সমস্ত শোণিত বার হয়ে যাবে। রক্তের সঙ্গে ছোবড়া ছোবড়া কী সব আসছিল উঠে।

হঠাৎ-ই তারপর অদ্ভুত একটা শব্দ করে কন্ডেন্সার এবং ফ্লাস্ক ফেটে গেল। ঘরের মধ্যে বিদ্যুতের মতো কী একটা চমকে উঠে থেমে গেল। প্রকাশ জল ছাড়তে ভুলে যাওয়ায় এই বিপত্তি। ওদের দু'জনের গায়ে প্রস্রাব ছিটকে ছড়িয়ে এসে লাগল। চোখেমুখে ভরে গেল মানুষের শরীরের বর্জ্য পদার্থ। রোগগ্রস্ত রক্ত এবং দুর্গন্ধজড়িত প্রস্রাব মাখামাখি হয়ে গেল তাদের শরীরে। কারখানার বাল্‌ব নিবে গেছে। এই একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বিদ্যুৎ চলে গেছে। শুভেন্দু ঠিক করতে পারছিল না, এখন কী করতে হবে।

ঘটনার এই আকস্মিকতায় বিমূঢ় প্রকাশ রক্ত তুলতে তুলতেই ভেবেছে, সে অপরাধী। রক্ত তোলা থামলেই নেতিয়ে পড়া এই বিহারি যুবক একটা দুর্বোধ্য শব্দ মুখ দিয়ে বার করে এবং ডুকরে কেঁদে ফেলে। তার বুক ভেসে গেছে নিজেরই শোণিতে এবং সেই রক্তে মিশে গেছে নাম না-জানা অসংখ্য মানুষের প্রস্রাব। এই একটা আশ্চর্য কারখানা যে কি না মানুষের রক্তে প্রস্রাব এবং গোদুগ্ধে শোণিত-গরল মেশায়। রক্তে, শোণিতে, বিষে, ইথারে, প্রস্রাবে কী উৎপাদন করে কৃষ্ণ বুঝতে পারে না। কী করে ঘটল এই ঘটনা? নেতিয়ে মেঝেয় পড়ে গেছে প্রকাশ। প্রকাশ পড়ে রইল মেঝেতে। ঘর অন্ধকার নয়, বাইরের আলো এলেও একটা কম শক্তির বাল্‌ব কাজের জন্য জ্বেলে রাখতে হয়। বাল্‌ব জ্বলল আবার। তখনই কৃষ্ণের চোখ পড়ল চুল্লির পাশে ফেটে পড়ে থাকা সেই শিশিটা, যাতে ইথারের নমুনা ধরা ছিল। ইউরিনের অর্ডার আসাতে ইথারের কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছে। কৃষ্ণ এখন বুঝতে পারছে, শিশির ওই ইথারই অ্যাসবেস্টসের উত্তাপে বাষ্পীভূত হয়েছে এবং চুল্লির তাপে ফেটে গেছে, বোধহয় শিশির মুখটাও ভাল করে আঁটা হয়নি। সে মনে মনে বলল, হে বাষ্পের দানব, হে অদৃশ্য ইথার, তুমি আমাদের রক্ষা করেছ।

কারখানার বাইরে চলে আসে দু'টি গ্যাসীয় মানুষ। এরা ছায়ার মতো ভেসে আসে। কৃষ্ণের মনে হয়, তারা কেউ রক্তমাংসের বাস্তব নয়, তারা গ্যাসের অবয়ব এবং বিভীষিকা। তাদের দেখে আঁতকে ওঠে সবিতা দত্ত।

অ্যামোনিয়ার গন্ধে বাতাস ভরে গেছে। শুভেন্দুর ফুসফুসে ঢুকে গেছে সেই গ্যাস। তার ফুসফুসে আর কী ঢুকেছে সে জানে না। সে বুঝি আজ পৃথিবীর সমস্ত বাতাসকে সন্দেহ করে। সে ভয় পায় তার চারআনির কারখানাকে। প্রকাশের অপরাধে পরিপূর্ণ সরল মুখখানির দিকে চেয়ে তার ভেতরটা সূক্ষ্ম ব্যথায় টনটন করছিল। ফ্লাস্ক ভেঙে গেছে, মেঝেয় ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের প্রস্রাব। এবং যৎসামান্য ইথার, সলভেন্ট ইথার।

সুদেব কোথা থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল। বাড়িতে এসে চুপচাপ বেঞ্চে বসে পড়েছিল শুভেন্দু আর প্রকাশ। মহিমা এসে প্রকাশের রক্তে ভেজা গায়ের গেঞ্জি খুলে দিলেন। প্রকাশের ব্যবহার করা আলাদা গামছাখানা জলে ভিজিয়ে এনে ভাল করে মুছিয়ে দিলেন রক্ত এবং পেচ্ছাবের দাগ। প্রকাশ কাঁপছিল।—কী হয়েছে?

BanglaBook.org

সুদেব জানতে চাইল।

শুভেন্দু কথা বলতে চাইছিল না। প্রকাশ শুধু কাঁপছিল। মহিমাই ওদের হয়ে জবাব দিলেন—অসুস্থ মানুষকে দিয়ে কাজ করানো ঠিক নয় সুদেবসুন্দর। এক্ষুনি বড় ধরনের অ্যাকসিডেন্ট হতে পারত।

সুদেব বলল—ফ্লাস্ক ভেঙে মাল পড়ে গেছে, কন্ডেন্সারটাও গেছে। কী করে ভাঙল?

শুভেন্দু বলে উঠল—জবাব দিতে পারব না। যদিও সে মনে মনে বুঝেছিল, অসুস্থ প্রকাশই মনের ভুলে নমুনা পরীক্ষার বোতলভর্তি ইথার ওইভাবে আগুনের পাশে রেখেছিল, জ্ঞানত এই পাপ প্রকাশ করে না, করে অন্য কোনও মানুষ।

ক'সেকেন্ড চুপ করে থেকে সুদেব বলল—কাজে তোমার মন ছিল না কমরেড। এভাবে তো সত্যিই চলে না দেখছি। সব যদি ভেঙে ফেলো, গরিব কারখানা চলবে কী করে! ঘেন্না হয়েছে বলে এইভাবে জব্দ করতে চাও! আজ তো আর কাজই হবে না।

শুভেন্দু বলল—প্রকাশ সত্যিই অসুস্থ সুদেবসুন্দর। প্রচুর রক্ত উঠেছে। এখন আমার একটি কথাও বলতে মন চাইছে না। আমাকে এখনই একবার ডা. মণ্ডলের কাছে ছুটতে হবে। কোম্পানিকে টেলিফোন করে বলে দাও, মাল তয়ের হতে দেরি হবে। বলে দাও কমরেডরা হুজ্জোত করছে। শ্রমিক অসন্তোষ কি হয় না নাকি। তাছাড়া...

—তাছাড়া?

—বই দেখে দেখে, অর্ডারের ডেসক্রিপশন মিলিয়ে কাজ করতে হয়। আমাদের কাছে মেটিরিয়ালের একটা কন্ডিশন চাওয়া হয়েছে, যা চাওয়া হয়েছে, আমাকে ঠিক তাই-ই দিতে হবে। কাজ শুরুও করেছিলাম। কন্ডেন্সারে হিট খেয়ে গেল, কী করব আমরা।

—প্রকাশ জল ছাড়েনি। বলল সুদেব।

—ভুল মানুষের হয় না। শুভেন্দু বিস্ময় প্রকাশ করে।

—না। এ তোমরা ইচ্ছে করে করেছ। আমাকে ডোবাতে চাও। আমি বুঝেছি। শোনো, সামন্তর ঘুসের টাকা আমরা দিতে পারব না। পারলেও দেব না।

—হঠাৎ এ কথা?

—হঠাৎ নয়, শংকরের সঙ্গে কথা হয়েছে, সামন্ত যা পারে করুক। অত টাকা কোথায় পাব? এখনই আমাকে কন্ডেন্সার কিনতে ছুটতে হবে। এইভাবে চলে না শুভেন্দু।

শুভেন্দু এবার গম্ভীরভাবে বলল—আমিও তাই মনে করি। এখন শুনে মনে হচ্ছে, ঘুসটা যেন আমিই তোমার কাছে চাইছি। কারখানার কিছু নষ্ট হলে আমার যেন লাগে না কিছু!

—লাগলে, শ্রমিক অসন্তোষের কথা তুলে ঠাট্টা করতে না। রেগে ওঠে সুদেব।

—ঠাট্টা কে করছে। আমাকে কমরেড বলবার মানে কী। তোমাকে বলেছি,

BanglaBook.org

আমাকে ব্যঙ্গ কোরো না। আমাকে চিপ লেবারের মতো ট্রিট করো কেন? এই সব অপমান কি আমার প্রাপ্য সুদেবসুন্দর?

—ঠিক আছে, আমি ক্ষমা চাইছি। বলে একটা শুকনো ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে উত্তেজিতভাবে চলে গেল সুদেব। খুবই অবাক হয়ে দূরে কোথায় চেয়ে রইল কৃষ্ণ। তার হঠাৎ মনে হল, সুদেবরা বোধহয় তাকে কারখানা থেকে বাদ দিতে চাইছে। মহিমাও বেশ হতবাক হয়ে ছেলেরই মুখের দিকে চেয়ে রয়েছেন। চোখে তাঁর জল এসে পড়তে চাইছিল। তিনি দু'জন হতভাগ্য শ্রমিকের দুর্গত জীবনের মূক সাক্ষী, জীবন সত্যিই বোবা মানুষের সংলাপ, কেউ কারও কথা শোনে না, বোঝে না—মানুষ শুধু মুখ নেড়ে চলে নিঃশব্দে। যেন তারা কাচের ফ্লাস্কে ঢুকে কথা বলছে।

সুদেব কিছু আগে ক্ষমা চেয়ে নাটক করেছিল, আবার ক্ষমা চেয়ে বুঝিয়ে গেল, সে ক্ষমা চাওয়ায় অভ্যস্ত, প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণকে সে শ্রমিকের বেশি কোনও বাড়তি সম্মান দিতে সত্যিই রাজি নয়। প্রকাশের অসুস্থতা তাকে একফোঁটাও ভাবায় না। শ্রমিকের রক্ত তাকে বিচলিত করে না। শুভেন্দু ভাবছিল, আজও প্রকাশের বুকের এক্স-রে করানো হয়নি। সীতানাথ আন্দাজে ওষুধ দিয়েছেন এবং ইঞ্জেকশন দিতে বলেছেন। একটা এক্স-রে নিশ্চয়ই দরকার। সীতানাথের সঙ্গে কথা বলাও দরকার।

শুভেন্দু প্রকাশকে ছোট ঘরটায় ঢুকিয়ে দেয়। তারপর বাথরুমে ঢুকে চান করে। উপরের শাওয়ারের দিকে চেয়ে জলপ্রপাতের মধ্যে বিড়বিড় করে কথা বলে চলে। যা বলে, তা সে নিজেই বুঝতে পারে না। মুখ দিয়ে সে বুদ্বুদের মতো শব্দ করে। উর্বীর মুখটা মনে করবার চেষ্টা করে। উর্বী কিছুতেই সামনে স্পষ্ট হয়ে আসে না। পিছন ফিরে রয়েছে এবং ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে কোথায় যেন হেঁটে চলে যাচ্ছে, মুখটা এই দিকে ফেরাতে গিয়েও ফেরাল না। মুখের মধ্যে জল ঢুকে গেছে শুভেন্দুর। সেই জলের মধ্যে উর্বীর নাম ধরে ডাকে, তখন ডাকটা একটা বুদ্বুদের শব্দ দেয়। একটা বুদ্বুদ ফেটে যায় মুখের মধ্যে।

একটি ইস্তিরি না করা কোঁচকানো ধোয়া পাজামা পরে তোয়ালে দিয়ে মাথার ভেজা চুল মুছতে মুছতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে শুভেন্দু। ঘরে ঢুকে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। হাতে জড়ানো তোয়ালে। আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছায়া দেখে চমকে ওঠে। কাঁচাপাকা চুল আরও পেকেছে। উর্বী তাকে দেখে কী ভাববে। তার গায়ে এখনও লেগে রয়েছে একটা কটু দুর্গন্ধ। সাবান মেখেও গন্ধটা যায়নি। এ ঠিক অ্যামোনিয়ার গন্ধও নয়। একটা অন্য রকম গন্ধ। ভীষণ ঝাঁঝালো, কত রকমের বাজে গন্ধের মিশেল। একটি চামড়াপোড়া এবং পচা চামড়ার গন্ধও মিশে আছে। এই গন্ধের নাম জানে না শুভেন্দু।

তেজালো সেই দুর্গন্ধটাকে সঙ্গে করে পথে বেরিয়ে পড়ে কৃষ্ণ। গায়ে একটা পাঞ্জাবি গলিয়ে নিয়েছে। পায়ে পৃথক রঙের ফিতেঅলা হাওয়াই চপ্পল। কী করে প্রকাশের একখানা আর তার একখানা—এভাবে পায়ে গলে এসেছে কৃষ্ণ খেয়াল করেনি। ডাক্তার মণ্ডলের কাছে প্রকাশের ওই রকম রক্ত তোলার ঘটনা জানিয়ে পরামর্শ নেয়। একটা ফার্মেসিতে এসে দু'টি ইঞ্জেকশন কেনে।

BanglaBook.org

কৃষ্ণ যখন ডাক্তারের চেম্বার ছেড়ে চলে আসবে তখনই ডা. সীতানাথ বলে উঠলেন—কাল রোববার কমিউনিটি হলে পরিবেশ দূষণ নিয়ে কারা সব সেমিনার করছে, আমাকেও বলবার জন্য ডেকেছে। ভাবছি, প্রকাশের ঘটনাটাও তুলে ধরা যায়, ভয় পেয়ো না। আমি কারও নাম করে কিছু বলব না, শুধু ঘটনাটা বলব। বলে ডা. মণ্ডল একটুখানি হাসলেন।

ডাক্তার মণ্ডলের মুখের নিঃশব্দ ওই হাসিটুকু দেখে কখন অজান্তে কৃষ্ণের মুখটা শুকিয়ে গেল। সে শুধু কোনও ক্রমে বলল—ভালই তো। বলেই রাস্তার দিকে নেমে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল শুভেন্দু এবং ঘুরে দাঁড়াল। তারপর যতটা গিয়েছিল ততটাই ফিরে এল।

শুভেন্দু বলে উঠল—খাটালের পলিউশনের কথাও বোলো। গোরুর বাঁট ফেটে গিয়েছিল। 'খাটাল-পলিউশন' পাবলিকই রুখে দিয়েছে, খাটালটা নেই। এবং বলে দিয়ো, শিউশরণ এখন পাগল। আমি, এই কৃষ্ণ, নাগরিক সমিতির মেম্বারদের বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, খাটালের দূষণ কত মারাত্মক। এবং সরকার খাটাল তুলে দিতে চায়, মানে জন-বসতির বাইরে থাকবে খাটাল।

ডাক্তার মণ্ডল কৃষ্ণের কথাকে স্পষ্ট সমর্থন না করে আগের মতোই একটুখানি হাসলেন এবং শুভেন্দুর পায়ের দিকে চেয়ে বললেন—চটি ভুল করে পরেছ কেন? একটা ফিতে নীল, অন্যটা হলুদ। খেয়াল করোনি।

—ওহো, তাই তো। বলে নিজের পায়ের দিকে তাকায় কৃষ্ণ। তারপর বলে—হলুদটা প্রকাশের। ঠিক আছে। আসি সীতানাথ।

ডাক্তার মণ্ডলের মুখের স্মিত হাসিতে বিস্ময় এসে ধাক্কা দিল। তিনি কৃষ্ণকে কী একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। তাঁর মুখের হাসিটা ধীরে ধীরে করুণ হয়ে উঠল, বিস্ময় সরে গেল। তারপর কপালের রেখা একটুখানি সংকুচিত হয়ে উঠল।

রাস্তায় পড়ে খানিক দূর হেঁটে চলে গিয়ে আবার চেম্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ডাক্তারের কাছে ফিরে এল কৃষ্ণ। খুব কাছে এসে সহসা সীতানাথের একটা হাত কৃষ্ণ তার মুঠোয় চেপে ধরে কাতর গলায় বলল—প্রকাশের কথা তুমি কোথাও বোলো না সীতানাথ।

—কেন?

—জানি, প্রকাশের কথা তুললে তোমার বক্তৃতা ভাল হবে। কিন্তু আমি বেকার হয়ে যাব। প্রকাশও কাজ হারাবে। আমার একটা কালো বোন আছে, ওর বিয়ে হবে না। চড়া বরপণ লাগবে। আমি টাকা জমাচ্ছি। আমাকে ঘৃণা করো, কিন্তু প্রকাশের গল্পটা বোলো না প্লিজ।

কৃষ্ণের কথা শুনতে শুনতে ডাক্তারের নাকটা অতি অল্পমাত্রায় কুঁচকে উঠল। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়েছে। শুভেন্দু বুঝল, সীতানাথ দুর্গন্ধ পেয়েছে, সে আর দাঁড়াতে পারল না। ছুটে পালিয়ে এল পথে। বাড়ি ফিরে প্রকাশকে দুটি ইঞ্জেকশনই দিল পর পর। সারারাত কৃষ্ণ বিছানায় শুয়ে ছটফট করল, কিছুতেই ঘুম এল না। একটি বিকট দুর্গন্ধ তাকে জাগিয়ে রেখে দিল।

BanglaBook.org

ভিতর কণিকা

কুয়াশা পড়ছে। একটি অতি বৃহৎ কটাহে কে যেন কুয়াশা ঢালছে, কুয়াশার ভিতরে কুয়াশা পড়ছে। ফলে কুয়াশা ঢেউয়ের মতো পাকিয়ে উঠে ছড়িয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর অবয়ব দেখা যায়। মস্ত একটা হাঁ-মুখ দাঁতঅলা জন্তু দেখতে পায় কৃষ্ণ, সেই পশুর মুখ-বিবর থেকে বেরিয়ে এল একটি মানুষ, গায়ে মোটামোটা লোম, মুখে লম্বা লম্বা দাঁত, দাঁতের গোড়ায় রক্ত, চোয়াল পশুর মতো চওড়া এবং শক্ত। কিছুতেই কৃষ্ণ ওই মানুষটাকে চোখের উপর থেকে সরাতে পারছে না।

ওই দানব ধরনের মানুষটা পুকুর পাড়ে এসে দাঁড়াল। ওর পায়ের কাছে একটি ভুঁড়ি বার হওয়া মৃত গোরুকে কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেখা যায়। অজস্র কাক সেখানে পিশাচের মতো চিৎকার করছে। শকুনের চঞ্চুতে ধরা লম্বা কালো নাড়ি। মরচে ধরা লোহার মতো রং সেই নাড়িটার। দানবটা বলল—আয়। বলে ডাকল কৃষ্ণকে।

দানবটার দেহের দু'পাশে শকুনের প্রকাণ্ড ডানা লাগানো। সে উড়ছে। কৃষ্ণও উড়তে লাগল তার পিছুপিছু, উর্বী মাটির উপর দাঁড়িয়ে 'যেও না , যেও না' বলে চিৎকার করছে। দানবটা কিন্তু কৃষ্ণকে চুম্বকের মতো আকাশপথে টেনে নিয়ে চলল।

দানবটা কৃষ্ণকে নিয়ে এল একটি সমুদ্রের কূলে অরণ্যের কাছে। বলল—এর নাম অভয়ারণ্য। ঠিক এই জায়গাটার নাম ভিতর কণিকা। দ্যাখো, ব্রাহ্মণী, বৈতরণী, ধামার—এই সব নদী এখানে এসে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। এখানে ম্যানগ্রোভ অরণ্যের দৈর্ঘ্য ১১৫ কিলোমিটার। তোমাকে যেখানে এনেছি, এই সমুদ্রকূলের নাম গহিরমাথা। এখানে রয়েছে ওলিভ রিডলো। সমুদ্র-কচ্ছপ। সমুদ্রের জেলিফিশ খেয়ে এই কচ্ছপরা বেঁচে থাকে। এই কাছিমের ডিম চোরাচালান হয়, আমি চোরাচালান করি না, আমি খাই।

'আমি খাই'—কথাটা এমন করে বলল দানবটা যে কৃষ্ণ বেশ ভয় পেল। সমুদ্রতীরে লক্ষ লক্ষ শকুন থকথক করছে। দানবটা ওদের কী একটা শব্দ করে ডাকছে। একটা ডিম দানবটা কৃষ্ণের হাতে দিয়ে বলল—তুমিও খাও।

দানবটার মুখ থেকে যন্ত্রের মতো শব্দ করে একটা শকুন-চঞ্চু বার হয়ে এল। সে একটা ডিম হাতের তালুতে রেখেছে, সেটি খাবে। রৌদ্র-উদ্ভাসিত সমুদ্রতীর। থকথকে লক্ষ শকুনের চকচকে পৃষ্ঠদেশ রৌদ্রে ঢেউয়ের মতো নড়ছে। এরা সবাই ওলিভ রিডলোর কুসুম ভক্ষণ করতে এসেছে।

দানবটা বলল—তুমি সব সময় যে কোনও মানের ভিতরটা খাবে। ভিতর কণিকা মানে হচ্ছে ভিতরের মাল। খাও। আমি সব সময় চোখ দিয়ে শুরু করি। গোরুর চোখ, মানুষের চোখ এইভাবে। ডিম খাওয়াটা আরও সহজ। ফাটাও, তারপর খাও। বলে দানবটা চঞ্চু দিয়ে ডিমের উপর আঘাত করতে লাগল। এবং বলতে থাকল, একদিন দুনিয়ার সব ডিম খেয়ে ফেলব আমরা।

আশ্চর্য স্বপ্নটা দেখল কৃষ্ণ। শব্দেই ঘুম ভাঙল তার। অবাক হয়ে দেখল, তার

BanglaBook.org

ঘরেও কুয়াশা ঢুকেছে। সেই কুয়াশার ভেতর দিয়ে বাড়ির বাইরে কারখানার কাছে পথের উপর এসে দাঁড়াল সে। নিজের ডান হাতের মুঠোটাকে এখনও শক্ত করে ধরে রয়েছে, মনে পড়ছে, একটু আগে একটি দানবিক শকুন বা শকুনের মতো দেখতে একটি মানুষ একটি ডিমকে চঞ্চু দিয়ে ফাটিয়ে ভিতরের কণিকা বলতে ক্ষুদ্র কাছিম শাবককে টেনে বার করে খেয়ে ফেলল। সেই শব্দেই কৃষ্ণের ঘুম ভেঙেছে।

কুয়াশার ভিতর দিয়েই কৃষ্ণের শ্যেনদৃষ্টি চলে গেল দত্তবাড়ির গ্রিলঘেরা বারান্দায়। শকুনের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল মৌ-এর উপর। কৃষ্ণ প্রথম থেকেই সব ঘটনা মনে করতে পারে। শিশু মৌ মায়ের কোলে খাটালের দুধ খেয়ে চিৎকার করে কাঁদত। গায়ে তার ঘা হয়েছিল, সেই ঘা সবিতা কৃষ্ণকেও দেখিয়েছিল। শিশু কেন কাঁদে কেউ বোঝেনি। মৌ যখন আধো আধো কথা বলতে শিখল তখন থেকেই একটু একটু করে তার দৃষ্টি নিবে আসতে থাকল। চেহারাও কেমন খানিকটা বিকৃত হয়েছে। শিশুর দাঁতের গোড়ায় অবধি ঘা হয়েছিল।

সবিতা ইদানীং কৃষ্ণকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলত—বেহালার অন্ধ স্কুলে মৌকে ভর্তি করবে তারা। বেহালায় মৌ-এর মামার বাড়ি। সেখানে থেকে অন্ধ মৌ মানুষ হবে। মাঝে মাঝে যখন মৌ হঠাৎ এক-একদিন ঝাপসা আলো দেখতে পায়, মায়ের মুখটা দেখিয়ে বলে, এটা চোখ, এটা নাক ইত্যাদি, তখন দত্ত বাড়িতে খুব হল্লা হয়, আনন্দের চিৎকার ওঠে।

আজ কুয়াশা। আজ রবিবার। কৃষ্ণ রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে এই ভোরে লক্ষ করল প্রায়-অন্ধ শিশু মৌ একটি সরু লোহার ডাঁটি দিয়ে গ্রিলে আঘাত করছে মাঝে মাঝে, বসে আছে একটি চেয়ারে। সেই একটি আওয়াজ ছাড়া ভোরের নিজস্ব শব্দগুলি স্পষ্ট নয়। প্রলিপ্ত কুয়াশায় পাখিও বুঝি ডাকতে পারে না।

কৃষ্ণ হঠাৎ বাড়ি ঢুকে এসে তার কাঁধে ঝোলানোর যে ব্যাগটি সে কাঁধে ঝোলায় এবং বাড়ি ফিরে আলনায় একপাশে ঝুলিয়ে রাখে, ঝুলন্ত সেই ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে এক মুঠো চকোলেট তুলে নেয়। জিতুর জন্য আজ চকোলেটগুলি নিয়ে যাবে বলে কিনেছিল। তার প্রায় অর্ধেক তুলে নিয়ে আবার রাস্তার উপর চলে আসে। তারপর প্রাচীরের কাছে ঘেঁষে এসে দাঁড়ায়। গ্রিলের ফাঁকের কাছে মুঠো মেলে ধরে। চাপা গলায় বলে— কেমন আছ মৌ?

—ও, তুমি কৃষ্ণকাকা!

—হ্যাঁ, দেখতে পাও? অ্যাই দ্যাখো, কী বলো তো?

—তকোলেত। দেবে?

—নাও।

গ্রিলের ফাঁক দিয়ে নরম সরু হাত বাড়িয়েছিল মৌ। এমন সময় বারান্দার পূর্ণ কুয়াশার ভিতর একটি ছায়া দেখা যায়। সবিতা। কৃষ্ণের আনন্দ হয়েছিল, কুয়াশার মধ্যেও অন্যলোকিত ভোরে, যখন সূর্য না ফুটলেও, একটা ঘোলা সাদা আলো ফুটেছে, তখন সেই আলোয় চকোলেট দেখতে পেয়েছে মৌ।

সবিতা বলে উঠল— একী! ওকে কী দিচ্ছেন আপনি! বলা মাত্রই কৃষ্ণের হাত

BanglaBook.org

থেকে সমস্ত চকোলেট ড্রেনের জলে পড়ে গেল। কৃষ্ণ চোরের মতো পালিয়ে চলে এল। এসে রাস্তার উপর না দাঁড়িয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ল। ঘরে ঢুকে নিজের চৌকির বিছানায় বসে পড়ে ভাবল, এভাবে পালিয়ে এল কেন? ভাবতে ভাবতে বিছানায় চিত হয়ে পড়ে গেল। তারপর তার চোখে কান্না এসে পড়ল। যত সে ভাবতে থাকে, মৌ কুয়াশার ভিতরেও হাতের তালুতে রাখা চকোলেট দেখতে পেয়েছে, ততই তার কান্না বেগবান হয়ে ফেটে পড়তে চাইছে। কিন্তু সে শব্দ করে কেঁদে উঠতেও পারে না। কান্নাকে দাঁতে চেপে দমাতে গিয়ে সে বিছানায় ছটফট করে চিত থেকে কাত এবং অবশেষে উপুড় হয়ে মুখে বালিশ চেপে ধরে। কান্নার অবরুদ্ধ গমকে তার পিঠ কেঁপে কেঁপে ওঠে।

কান্না দমাতে গিয়ে কৃষ্ণ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে যায় ফের। বাইরে কুয়াশা হালকা হয়। কুয়াশা অদৃশ্য হলে রোদ ছড়িয়ে পড়ে কারখানার অ্যাসবেস্টস ছাদে এবং আমগাছের শুকনো বউলে। রোদ দেখে মহিমা ছেলেকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন। শুভেন্দু প্রাতঃকৃত্য, চান ইত্যাদি সব শেষ করে খেতে বসার আগে প্রকাশের ঘরে আসে। প্রকাশের গায়ে হাত দিয়ে জ্বর আছে কি না পরীক্ষা করে আশ্বস্ত হয় এবং বেরিয়ে এসে মাকে বলে— প্রকাশ চান করতে চাইলে করবে। ওর গায়ে খুব গন্ধ মা। চান করলে খেতে দিও। আমাকে দাও, খেয়ে নিই। জিতুকে দেখতে যেতে হবে। ও ফের রাস্তা অবধি চলে আসে। জিতুকে দেখার পর... আচ্ছা মা, আমার গায়েও কি অমনি...

শুভেন্দুর কথার মধ্যে ছেদ পড়ে। বন্ধু এবং পার্টনার শংকর অর্থাৎ শংকরপ্রসাদ উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। সিধে চলে এল বারান্দায়। বেঞ্চে বসে পড়ে বলল— শোনো কৃষ্ণ, আমি কুড়ি হাজার টাকাই এনেছি। কমিশনারের কারখানা বলে ইদানীং বদনাম ছড়ানো হচ্ছে। তাই বাবা বলছে, কারখানা বন্ধ করে দিতে। বাবার সঙ্গে ওই ঘুসখোর সামন্তর প্রচণ্ড হিচ্ আছে শুনে রাখো। কারখানা কিন্তু বিমলপ্রসাদের নয়। এই জমি মায়ের নামে, মা আমাকে দিয়েছে। তুমি তো সবই জান। বাবা চাইলেও এ কারখানা বন্ধ হবে না। ঘুস দিতে হলে তাই দেব। কিন্তু ঘুস খেয়েও যদি সামন্ত উপরে কোনও বাজে রিপোর্ট করে দেয়, আমি ছাড়ব না।

কথা বলতে বলতে নাসিকারন্ধ্র স্ফীত করে তুলেছিল শংকরপ্রসাদ। তার চোখের ডিমের শিরা রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে।

—আজ কুয়াশা দেখে মনে কী হচ্ছিল জান? যদি এই বিদঘুটে কুয়াশার মধ্যে সামন্তকে পেতাম। গলা টিপে নিঃশব্দে শেষ করে দিতাম। বলে উঠল শংকরপ্রসাদ।

মহিমা আঁতকে উঠে বললেন— এসব তুমি কী বলছ প্রসাদ?

—ঠিকই বলছি পিসি।

কৃষ্ণ হঠাৎ বলে উঠল— শোনো প্রসাদ, অত উত্তেজিত হবে না। ঠাণ্ডা মাথায় শোনো, আমি বলছি। এই রাজ্যে কয়েক লক্ষ কারখানা রয়েছে।

শুভেন্দুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শংকরপ্রসাদ বলে উঠল— তারা কি সবাই সাচ্চা?

BanglaBook.org

কৃষ্ণ বলল— না। এটা সাচ্চাঝুটার ব্যাপার নয় প্রসাদ। জানি, এ অঞ্চলে কারও কারখানার হয়তো রেজিস্ট্রেশনই হয়নি। হবে কী করে? অনেকেই আমাদের মতো মুখের ভাত জোগাড় হবে বলে ছোট ছোট কারখানা করেছে। যাই কোথা, বলো? সরকার যদি আমাদের চেপে ধরে, ন্যায় হবে না অন্যায় হবে, ঠিক করে উঠতেই পারবে না। তবে স্পষ্ট জানি, আমি কী করেছি।

—কী করেছ?

উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল কৃষ্ণ। নগদ বিশ হাজার টাকা বেঞ্চের উপর রেখে শংকরপ্রসাদ বলল— মাত্র পাঁচ হাজার টাকা সামন্তকে দিতে পারি। তুমি তার বেশি দেবে না শুভেন্দু। যদি দাও, দেবে। প্রকাশের চিকিৎসা কিন্তু তোমাকেই করাতে হবে। টাকা বাঁচাতে পারলে, ওই টাকা কন্ডেন্সার, ফ্লাস্ক কিনতে লাগবে। খেয়াল করনি, দামি জিনিস হিটিং ম্যান্টেলটাও গেছে, সেটাও কিনতে হবে, প্রকাশের চিকিৎসাও চলবে। তুমি পাঁচ হাজারই দেবে। বলবে, এর বেশি তুমি পাওনি। বলবে, তুমি কারখানার মালিক নও, মজদুর। তোমার মাথার চুল পেকে যাচ্ছে, সে কথাও বলবে। বলবে, তোমার চুল কেন পেকে যাচ্ছে; নাকি, পিসি? তুমি কী বলো? তুমি কৃষ্ণ বিদ্বান, তুমি ঠিকই জান, আমরা কতটা অন্যায় করছি। কিছুই না; আমরা যা করি, পেটের জন্য করি। সামন্তকে বলতে পারবে না? তুমি জোর গলায়, সামন্তকে বলে এসো, আওয়ার কেমিক্যালস আর নট হ্যাজার্ডস। আওয়ার গ্যাসেস আর নট হার্মফুল। ঠিক আছে, পাঁচ হাজারই রেখে গেলাম।

দীর্ঘক্ষণ কথা বলার পর পনেরো হাজার টাকা তুলে নিল শংকরপ্রসাদ। পাঁচ হাজার টাকা বেঞ্চে রেখে চুপচাপ বেরিয়ে চলে গেল। খেতে বসে খাবার গলা দিয়ে নামল না কৃষ্ণের। গলায় আটকে গেল। মহিমা দেখলেন, ছেলের মুখভর্তি খাবার, কিন্তু চোখে ছলছল করছে জল। ছেলে থালার খাবার ফেলে উঠে পড়ল। কৃষ্ণের কেবলই মনে হচ্ছিল, কেন সে শংকরকে বলল না— আমার সঙ্গে এই রকম দর করছ কেন প্রসাদ! আমি কি তোমার বন্ধু নই আর? আমি আমার মাথার সাদা চুল সামন্তকে দেখিয়ে ঘুসের টাকা কমাব? আমি করুণা চাইব? মানুষকে এভাবে ব্যবহার করতে চাইছ কেন শংকরপ্রসাদ?

শংকরকে কিন্তু কোনও কথাই বলে উঠতে পারেনি কৃষ্ণ। শুধু অবাক হয়েছে, এরাই তার বন্ধু, এদেরই সঙ্গে সে কারবার করে! ছেলেবেলার বন্ধু এরা। একসঙ্গে খেলাধুলা করেছে, সাঁতার কেটেছে, একসঙ্গে ঘুড়ি উড়িয়েছে, একসঙ্গে স্কুল গেছে। এরাই তারা? শংকরকে কৃষ্ণ বরাবরই অন্য রকম জানত। এতক্ষণ যা সে করল এবং বলল, সবই অদ্ভুত ঠেকছিল। কিছুতেই শুভেন্দু শংকরের আচরণ হজম করতে পারছিল না।

শংকরপ্রসাদ বরাবরই কম কথার ছেলে এবং তার আচরণে কোনও খরতা কোনও কালে ছিল না। কোনও দিন রাজনীতির ছায়াও মাড়ায়নি। দল পাকাতে পারত না, যে কোনও ধরনের বিবাদ বিসংবাদ এড়িয়ে চলাই ছিল তার স্বভাব। ওদের সাংসারিক সচ্ছলতা মোটামুটি। বাবা প্রাইমারি শিক্ষকতা করতেন, শংকরের মা বাড়ির

BanglaBook.org

বৈঠকখানায় মুদি-মনোহারির ছোট দোকান চালাতেন, তাদের যৎসামান্য মাঠজমি ছিল। পড়াশুনায় খুব একটা মেধাবিও ছিল না প্রসাদ। খুব মাঝারি বুদ্ধির ছাত্রটি স্কুলে হায়ার সেকেন্ডারি (ওল্ড) পর্যন্ত সায়েন্স পড়েছে, কলেজে কমার্স পড়েছে। বি. কম. পাশ করে দীর্ঘকাল বেকার পড়ে থেকেছে। এক সময় কিছুদিন উপায়ান্তর না দেখে জমির দালালি করত বলে শুনেছে শুভেন্দু। শুনেছে এই জন্য লেখা হল যে, শুভেন্দু যখন জেলে, তখন বাইরে কে কী করছে, তা সে জানতে পারেনি।

সুদেবসুন্দর বরাবরই খর প্রকৃতির এবং চালাক। ছাত্র খারাপ ছিল না। রসায়ন নিয়ে কলেজ পর্যন্ত একসঙ্গে পড়েছে কৃষ্ণ। দারিদ্রের কারণে সুন্দর আর এম.এস.সি পড়েনি। কোথায় কোন হাই স্কুলে চাকুরির চেষ্টা করেছিল, হয়নি শেষ পর্যন্ত। কারণ ওই চাকরিতে ঢুকতে হলে বড় অঙ্কের মুদ্রা ডোনেশন দিতে হত। সুদেবও প্রবলভাবে রাজনীতিবিমুখ এবং আজও উগ্র বামপন্থী রাজনীতিকে ঘৃণা করে।

সুদেব আর প্রসাদ বেকার অবস্থায় দুই বন্ধু মিলে কিছুদিন জমির দালালি করেছে। তা-ও শেষ পর্যন্ত তাদের পোষায়নি। শুভেন্দু শুনেছে, সুদেব কিছুদিন ইমারতি দ্রব্যের ব্যবসার চেষ্টা করেছিল। বীরভূম থেকে চিপ্‌স আনত লরি করে, ভাড়ার লরি। তা-ও পোষাল না। বাবুঘাট থেকে বালি তুলত লরিতে। লাভ হত, কিন্তু সুদেব মেহনত করতে পারল না। শোনা যায়, মুরগির মাংসের দোকানও করেছিল সুদেব। সেটিও টেকেনি।

শংকরপ্রসাদের বাবা বরাবরই রাজনীতির লোক। ছেলেকে রাজনীতিতে টানেননি কখনও, বরং বাধাই দিয়েছেন, কিন্তু নিজে মধ্যপন্থা বাম-রাজনীতির শরিক। সেই তিনিই এখন চাকরির রিটায়ারমেন্টের কিছু আগে থেকে কমিশনার। পর পর দু'বার ওই পদ অধিকার করেছেন। তাঁদের মুদি-মনোহারির দোকানটা আর নেই। শংকরপ্রসাদের এখন অন্য একটা ব্যবসাও হয়েছে। কয়লাগুলের ডিপো। সুদেব অন্য ব্যবসা করে না। বেশির ভাগ সময় কারখানার অর্ডার ধরবার জন্য ছুটে বেড়ায়। মাঝে মাঝে কারখানায় থাকে। শুভেন্দুর সন্দেহ হয়, এখনও সুদেব জমির দালালি করে।

কৃষ্ণ ভাববার চেষ্টা করে, সুদেব যদি স্কুলের মাস্টারিটা পেত, তাহলে কি সে অন্য রকম হত? আজ রাজনীতিবিমুখ সে নয়, শংকরের বাবার রাজনৈতিক ছত্র তার মাথার উপর ধরা রয়েছে, যেমন ভাবে রয়েছে প্রসাদের মাথার উপর। এবং শুভেন্দু হেঁটে চলেছে সেই ছাতার বাইরে কড়া রোদ, ঘোলা বৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাদেরই পাশাপাশি। সেই ছাতার তলে তার জায়গা হচ্ছে না। ওরাও বামপন্থী, কিন্তু বামরাজনীতিরই কারণে, যদিও সেই রাজনীতি কখনও ভাল করে বুঝেসমঝে করেনি কৃষ্ণ, তবু সেই রাজনীতির অস্পষ্ট অপরাধে জেল খাটার ফলে কৃষ্ণকে বামপন্থী হয়েও প্রসাদরা ঘৃণাই করেছে। এ এক আশ্চর্য পরিহাস। না, প্রসাদ হয়তো কৃষ্ণকে জেলখাটার কারণে শ্রদ্ধাও করে। এইরকম একটি কল্পিত শ্রদ্ধাবোধ মনের মধ্যে রচনা করে তুলে কৃষ্ণ আনন্দ পেতে চায়।

কমিশনার অচঞ্চল প্রকৃতির মানুষ। শুধু এই জন্যই কথাও বলেন অত্যন্ত কম। কারখানার ব্যাপারে নিরুত্তাপ থাকেন। তবু প্রসাদ আজ বলল, বিমলপ্রসাদের সঙ্গে

BanglaBook.org

সামন্তর 'হিচ্' আছে। থাকতে পারে। থাকতেই পারে। ভাবতে ভাবতে প্রায় এঁটো-না-হওয়া হাত জল দিয়ে ধুয়ে ফেলে কৃষ্ণ। তার মাথার ভিতর থেকে প্রসাদের বলা কথাগুলি কিছুতেই নড়তে চায় না। নিরীহ, ভদ্র, স্বল্পবাক, রাজনীতিবিমুখ অথচ রাজনীতির ছত্রচ্ছায়ায় থাকা শংকরপ্রসাদ আজ ঘন কুয়াশার মধ্যে একটি ঘুসখোর মানুষকে নিঃশব্দে খুন করে ফেলার কথা ভাবে। বাবা কমিশনার, তার পিছনে রয়েছে পার্টি— ক্ষমতাই কি তাকে খুনের মতলব দেয় মাথার মধ্যে! না, তা হয়তো নয়, কারখানা বন্ধ হয়ে যেতে বারে, এই ভয় তাকেও ভিতরে ভিতরে উন্মত্ত করেছে। খুব কাছেই একটি কারখানা, নাম ডাবসন, শব্দদূষণের দোষে আজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেটিকে বন্ধ করেছেন কৃষ্ণের স্যার অমরেন্দ্র বসু। তিনি সেটাকে বন্ধ করতে বাঘের মতো লড়েছেন। এই স্যারই আবার কৃষ্ণকে কেমিক্যালসের কারখানা করে মুখের খাবার জোগাড় করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। অবশ্য তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, কৃষ্ণরা নন-হ্যাজার্ডস গ্রিন ক্যাটেগরির লাইট কেমিক্যাল নিয়ে কাজ করবে। সামান্য নাফা, সামান্য জীবন।

কৃষ্ণ হঠাৎ শুভেন্দুকে বলল— আঙুরের রসকে গ্যাঁজালে কী হয় বলো তো। ইথাইল অ্যালকোহল। একে বলতে পার মর্ত্যের অমৃত। খেয়ে ফুর্তি মারো। কিন্তু আঙুরের বোঁটা? ওই বোঁটাসুদ্দো আঙুর পেষাই করে গ্যাঁজালে কী মরলে। সত্যিই মরলে। কারণ কী, এ হয়ে গেল বিষ— মিথাইল। মারাত্মক বিষ। তাকে বলব মিথাইল অ্যালকোহল মিশ্রিত ইথাইল অ্যালকোহল। খাও, অন্ধ হও, তারপরে মরো! বলতে কি পারি না বোঁটায় বিষ, রসে মধু। পাতনে যখনই রসের সঙ্গে পেষাই বোঁটা এল, বিষ হয়ে গেল। ফলে যার অমৃত, তারই বোঁটায় গরল। কে বিষ, কোথায় মধু। কখন কে রস, কখন কে বিষ— তুমি জান না। তুমি আজ জান না, কোন কেমিক্যাল সবুজ, কোনটা হলুদ, কোনটা লাল। কারণ মানুষ এখনও জানে না, কে কীভাবে কোথায় মিশে বিষ হয়ে উঠছে।

যতই কেন হোক, প্রসাদের জিঘাংসা যে এমনটি হবে ভাবেনি কৃষ্ণ। স্বার্থ জিনিষটা বাধাগ্রস্ত হলে সাপের লেজের মতো হয়ে ওঠে, পা পড়লেই ফুঁসে উঠে ছোবলাতে চায় সাপটা। সে বন্ধু বোঝে না, বন্ধুকে ব্যবহার করে, ছোবলায়। কেমিক্যালে খাওয়া মাথায় সাদা চুলের দুর্দশাকে আজ ঘুসখোরের সামনে কৃপার জন্য উপস্থিত করবে কৃষ্ণ। কী গ্লানি! কত অপমান যে এই কথার মধ্যে রেখে গেল শংকরপ্রসাদ, ভাল করে নিজেও হয়তো জানে না। স্বার্থ একটি অন্ধ সাপ, ত্বক দিয়েও সে শোনে কোথায় কী! শংকর জানে না, কী সে বলে গেল। কেন বলল! এই সাদা চুল কবে কালো হবে উর্বী।

—খেলি না খোকা! কিছুই খেলি না! বলে ওঠেন মহিমা।

শুভেন্দু বলল— পারব না মা। আচ্ছা মা, প্রসাদও কি আমাকে সত্যিই আর পার্টনার রাখবে না!

—এত ভাবিস না খোকা! জিতুকে দেখে ফিরে আসবি। সামন্তর কাছে আজ যেতে হবে না। কাল যাবি।

BanglaBook.org

—না। আজই যাব। বলে পাঁচ হাজার টাকা কাপড়ের ব্যাগে ঢুকিয়ে নেয় কৃষ্ণ। পা বাড়ায়। উঠোনে নামে। ঘুরে দাঁড়িয়ে মাকে বলে— এ যুগের শ্রীকৃষ্ণ ভবিষ্যৎ কিছুই দেখতে পায় না মহিমা। সাবধানে থেকো। আমার রাত হবে। বুলাদের ওখানে টিউশন করে তবে ফিরব। আর হ্যাঁ, একটু বাদে প্রকাশকে রিকশা করে দিয়ো, সীতানাথের কাছে গিয়ে ও নিজেই কথা বলে আসবে। রোববারেও দুপুর পর্যন্ত রোগী দেখে সীতানাথ।

মহিমা বললেন—প্রকাশ একা যেতে পারবে? কৃষ্ণ বলল— রিকশা করে দিলে নিশ্চয় পারবে। এখন ও ভাল আছে। ওকে অবশ্যই পাঠাবে। আমি এসে যেন দেখি ও গিয়েছিল। বলে শুভেন্দু বাড়ির বাইরে পা বাড়ায়।

বাইরে এসে পথে পড়েই কৃষ্ণের চোখ কারখানার দিকে যায়। কারখানার কন্ডেন্সার, ফ্লাস্ক সব ভেঙে গেছে। তার দোষ বহন করছে শুভেন্দু এক চমৎকার উপায়ে। তার মাথাটা এখন আপনা থেকেই নিচু হয়ে গেল। নতুন ফ্লাস্কস, কন্ডেন্সার হয়তো কালই এনে ফেলবে সুদেব। তারপর কী ধরনের কটূক্তি করবে কে জানে। ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কৃষ্ণ। এবং তারপর তার শ্যেনদৃষ্টি, যা সে নিজেই কল্পনা করে নিয়েছে, চলে গেল দত্তদের বাড়ির বারান্দায়। সবিতা স্পষ্টত তার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে।

কৃষ্ণ আর মাথাই তুলতে পারল না। মূত্রদ্বারে আজ কোনও জ্বালা করেনি। আজ তার ভাল থাকার কথা ছিল। অথচ সে মাথা নিচু করে পথ চলেছে। হঠাৎ সে শুনতে পেল— শুনুন।

চমকে উঠে মুখ তুলল কৃষ্ণ। খুব স্থির করে সবিতার দিকে না চাইতে পারলেও দৃষ্টিটা তুলতে পেরেছে সে।

প্রায় অস্ফুট গলায় বলল— বলো।

—আপনার কাছে আর চকোলেট আছে! মৌ কাঁদছে। বলে সবিতা কেমন একটা সলজ্জ ভঙ্গি করে। প্রথম দিকে এই বউটা কৃষ্ণের সঙ্গে কেমন গায়ে পড়ে কথা বলতে চাইত। কৃষ্ণ খুব একটা প্রশ্রয় দেয়নি। কথা বলার সময় বউটা দৃষ্টিকে কেমন মদির করে তুলত। ইদানীং সেটা কেটে গেছে। মৌয়ের দৃষ্টি না গেলে, বউটার সঙ্গে কি খুব মাখামাখি হত। হত না। কারণ কৃষ্ণের মাথার সাদা চুল সত্যিকার ভালবাসা ছাড়া কালো হবে না। সবিতার সঙ্গে গড়ে উঠতে পারত একটি ঘন-বিহ্বল কামার্ত সম্বন্ধ, যা কোনও একটা সামান্য সামাজিক ধাক্কায় প্রস্রাবভর্তি মগজের মতো ভেঙে পড়ত। আচ্ছা, পৃথিবীর সব সম্বন্ধের পাশেই কি একটা ইথার ভর্তি বোতল থাকে? মানুষ জানতে পারে না। না, উর্বী তুমিই আমার কন্ডেন্সার, তুমি আমাকে শীতল রেখে পাতনে ধরেছ কোনও এক মহার্ঘ স্ফোটন-কণিকা। সত্যিই কি ধরেছ?

কৃষ্ণ মুঠো ভর্তি করে চকোলেট তুলে ধরে। সবিতা বলে— না, একটা। একটা দিন। শুনুন, আমার মেয়ে কিন্তু দেখতে পাচ্ছে!

একটা গভীর শীতল আনন্দে বুক কী ভাবে জুড়িয়ে ধীরে ধীরে আশ্চর্য তীব্র স্পন্দন জাগায়, সবিতার কথার মধ্যে থেকে সেই একটা অপূর্ব শক্তি অনুভব করে

কৃষ্ণ।

যতই কৃষ্ণ ভাবে, মৌ দেখতে পাচ্ছে, ততই সেই বিপুল আনন্দ তাকে সবিতার বলা শেষ বাক্যের গুঞ্জন দিয়ে কোনও একটি আলোকোৎসবের মতো ঘিরে ধরে; 'আমার মেয়ে কিন্তু দেখতে পাচ্ছে'— এই একটি বার্তা কিছুতেই যেন ফুরাতে চায় না।

গাছপালার ছায়ার ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছিল কৃষ্ণ। এটা একটি বাগান। ছায়া আর রোদ তার গায়ে নকশা কাটছিল। সেই গুঞ্জিত সবিতা-বাক্য হঠাৎ এক সময় নিবে যায়। বার্তাটি কী ভয়ানক, কৃষ্ণ ভাবে, মৌ দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু চিরকাল তো পাবে না। কথাটি আসলে একটি মহানিশার গাঢ় রাত্রির গা বেয়ে মহাশূন্যে পড়ে গেল, হলুদ ধোঁয়ায় ভর্তি হয়েছে সেই রাত্রির অন্ত্র, কথাটি যে প্রথমে বুঝতেই পারেনি কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ শুভেন্দুকে বলল— তুমি মৌ-এর ঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করো।

শুভেন্দু কৃষ্ণকে বলল— তুমি পাগল। ঠিক চিকিৎসা পেতে ঠিক ডাক্তারকে সঠিক সত্য বলতে হবে। তুমি কৃষ্ণ, তুমিই জান আসলে মৌয়ের কী হয়েছে এবং কীভাবে হয়েছে। বলো, বলো, বলে দাও।

—না, পারব না। বলে নির্জন বাগানে চিৎকার করে মাটিতে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ে কৃষ্ণ। তারপর মুখ থেকে দু'হাত সরিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে এদিক ওদিক দেখে। কেউ তার আর্তনাদ শুনল না তো। হ্যাঁ, শুনেছে, একটি তীব্র হলুদ রঙের পাখি। তাকে কালো, গভীর কালো চোখে উর্বীর মতো করে দেখছে। হঠাৎ মনে হল, এ তো উর্বীই।

উঠে দাঁড়াল এবং কৃষ্ণ দ্রুত হাঁটতে শুরু করল। অটো ধরে এবং অটো পাল্টে অটো ধরে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে পৌঁছল। জিতু রোজকার মতোই রাস্তার গেট পর্যন্ত চলে এসেছে। কখন যে গাড়ি চাপা পড়ে। সেই ভয় কৃষ্ণের। কাছে এল জিতু।

—মা আসেনি? শুধাল কৃষ্ণ।

খালি মাথা নেড়ে না করল জিতু। ডাগর ডাগর চোখে ছেলেটার সূক্ষ্ম বিষণ্ণতা। দু মুঠো চকোলেট জিতুকে দেয় কৃষ্ণ। কিন্তু আজ এই প্রথম দু'হাতে জিতুর গাল স্পর্শ করতে গিয়ে পারে না। কৃষ্ণের হঠাৎই মনে হল, সে শিশুর গাল স্পর্শ করার যোগ্য নয়। তার শরীরে অপবিত্র বর্জ্য পদার্থ লেগে রয়েছে, গায়ে তার দূষিত রক্তের দাগ। কৃষ্ণ হাত বাড়িয়েও গুটিয়ে নেয়। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ভিতরের আবেগকে রোধ করে।

একটি মায়ামাছ

ঢাকুরিয়ার একটি সরু গলিতে পরেশ সামন্তর বাসাবাড়ি। স্টেশন থেকে নেমে হাঁটাপথ। রিকশা নিল না শুভেন্দু। গলির মুখে একটি মুদি-মনোহারির দোকান। জায়গাটায় কেমন একটা গ্রামগ্রাম ভাব আছে। দোকানে এসে গ্রাম্য মুদির মতো ঢিলে

BanglaBook.org

গেঞ্জি পরা মাঝবয়সী লোকটির কাছে খোঁজ চাইল কৃষ্ণ। দোকানদার আঙুল তুলে সংকীর্ণ গলির দিকে নির্দেশ করে বলল—আমার বাড়িতেই সামন্তবাবু নীচের তলায় ভাড়া থাকে। চলে যান। গলির ভিতরে অনেকটা যেতে হবে। গিয়ে দেখবেন, হলুদ রঙের বাড়ি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বলে পা বাড়িয়েছিল শুভেন্দু।

দোকানদার পিছন থেকে বলে উঠল—শুনুন। আপনি তো মশাই দুপুর গড়িয়ে এসেছেন। সামন্ত এখন খেয়েদেয়ে ঘুমোচ্ছেন।

শুভেন্দু বলল—আমার খুব দরকার। অবশ্যি উনিই আমাকে দেখা করতে বলেছেন।

—বলেছে যখন, তখন যান। কিন্তু সহজে সাড়া পাবেন বলে মনে হয় না। চট করে দরজা খোলে না। হলুদ বাড়িটার একটা নাম আছে, দেখে নেবেন। শান্তিভিলা। ২৭ নম্বর বাড়ি। একটা প্লেটে নম্বর সাঁটা আছে। দেখবেন একটা গাছও আছে বাড়ির গা-লাগা। দেবদারু গাছ। লম্বা।

—আজ্ঞে।

—কিন্তু আবার আপনাকে বলছি। দু'-চার বার বেল টিপে বিরক্ত না করলে সামন্ত উঠবে না। সামন্তবাবু মানুষজন পছন্দ করে না। সাড়া না পেয়ে অনেকে ভুল করে ফিরে যায় দেখেছি।

—আচ্ছা। কিন্তু...

—আপনি যান। চেষ্টা করুন।

'চেষ্টা করুন' শুনে বেশ অবাক হয় শুভেন্দু।

দোকানদার এবার সামান্য নিঃশব্দে হেসে বলে—বড্ড আয়েসি লোক। একলা থাকে। চাকরবাকর রাখে না। দরজা কে খুলবে। বেল বাজবে। কান পেতে খাটে বসে শুনবে। তারপর বসে থাকবে। অদ্ভুত মানুষ। আমার দোকানেই মালপত্র কেনে বলে জানি। দোকানের ছেলেটা মাল দিতে গিয়ে মাঝে মাঝেই ফিরে এসেছে। মালের লিস্ট করে দিয়ে গেল, কিন্তু সেদিন আর মালই নিল না। ঘরের মধ্যে দরজা এঁটে বসে রইল।

শুভেন্দু থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এবার ঘুরে দাঁড়াল। একটুখানি এগিয়ে এসে বলল—একলা থাকেন। খাওয়া-দাওয়া কীভাবে চলে?

—এই সবও শুনতে চান। তা হলে বলতে হয়, উনি করেই বলছি, উনি খান না, কারণ কী...

—এই যে বললেন, আপনার এখান থেকে মালপত্র যায়।

—যায়। সেসব খাওয়ার জিনিস নয়। মাথার জিনিস। কিন্তু এসব শুনে আপনার কী হবে! আপনি কাজে এসেছেন... যান। গিয়ে ডাকুন। বেল বাজিয়ে না হলে দরজায় ধাক্কা দেবেন। ডাকবেন। আর কী বলব!

দোকানদার বিরক্ত হয়েছে দেখে শুভেন্দু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। কিন্তু দাঁড়িয়েই রইল। গড়ানো দুপুরে দোকানে খদ্দের ছিল না। দোকানদার এতক্ষণে চোখ বন্ধ করে

BanglaBook.org

ধ্যান করার ভঙ্গিতে নীরব হয়ে একটু একটু দুলছে। আর কথা বলতেই চাইছে না। দেখে শুভেন্দু সরাসরি জানতে চাইল—ওঁর স্ত্রী নেই? কিছু মনে করবেন না। আমি শুনেছিলাম...

চোখ বন্ধ রেখেই দোকানদার বলল—কী শুনেছিলেন?

—ওঁর স্ত্রী অসুস্থ।

—হতে পারে, কিন্তু ওয়াইফ ওর সঙ্গে থাকে না।

—থাকেন না?

—এতক্ষণ তা হলে কী শুনলেন?

—উনি একলা থাকেন!

—হ্যাঁ, তাই-ই তো বললাম। আবার বলছি, মন দিয়ে শুনুন। বলে চোখ খুলল দোকানদার। তারপর বলল—সাফ কথা বুঝে যান। স্ত্রী ছিল, এখন থাকে না। নেই।

—কী হয়েছে!

এতক্ষণে দোকানদার রেগে ওঠে। এবং অপ্রসন্ন গলায় বলে—আচ্ছা মশাই, এত প্রশ্ন কেন করছেন বলুন তো। সামন্ত আমার ভাড়াটে। তার প্রাইভেট লাইফে কী হচ্ছে না হচ্ছে একটা অচেনা লোককে আমি বাড়ির মালিক হয়ে বলতে যাব কেন? আপনি এখন যান তো, যান। তা ছাড়া শুনুন, সামন্তর খুঁটিনাটি আমিই বা জানব কেন?

শুভেন্দু থতমত খেয়ে বলে উঠল—মাফ করবেন। ওঁর স্ত্রী অসুস্থ শুনেই আমি এসেছি কিনা।

—ওয়াইফকে দেখতে এসেছেন?

—না না। সামন্ত বলেছেন...

—শুনুন। আপনি যে কারণেই এসে থাকুন, আমার জানার দরকার নেই। স্ত্রীকেই দেখতে আসুন আর তাকেই দেখতে আসুন আমার দরকার নেই তাতে। তবে সাফ কথা যা বলার বলেছি। স্ত্রী এখানে থাকে না। বউ কোর্টে খোরপোষের মামলা লড়ছে। যান, এবার নিশ্চিন্ত মনে যান দেখি।

সংকীর্ণ ছায়ামাখা, নোনাগন্ধ গলিতে দ্রুত ঢুকে পড়ে কৃষ্ণ। চিন্তা করে, নিশ্চিন্ত মনে সে সত্যিই কোথায় যাবে। কার কাছে? একজন অসম্ভব মিথ্যুক, জটিল গ্যাসের মতো রহস্যময় ঘুসখোরের কাছে, যে-কিনা মানুষের বিপর্যয়ের কাহিনী শুনিয়ে মানুষকে কাবু করে ঘুসের জন্য হাত পাতে এবং কাঁদে পর্যন্ত! একটি গ্যাসীয় দানব, যার দেহের দু' পাশে দু'খানি প্রকাণ্ড শকুনের ডানা লাগানো, যে-কিনা মানুষের ভিতর কণিকা খাবার জন্য ছোট ছোট কারখানায় উড়ে উড়ে যায়। আজ তারই কাছে নতজানু হবে কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ ডোরবেল বাজাল। পরপর তিনবার। সত্যিই কোনও সাড়া পেল না অনেকক্ষণ। দরজায় ধাক্কা না দিয়ে আবার বাজাল ঘণ্টা। পায়ের তলা দিয়ে সংকীর্ণ ড্রেনে তিরতির করে জল বইছে। পায়ের কাছেই মানুষের বাচ্চার ফেলে রেখে যাওয়া হলুদ শক্ত পায়খানার ন্যাড়। একটু দূরে হলুদ নাড়া আর পচা পাতায় বেড়াল শুয়ে আছে। লোমওঠা, খুবই রুগ্ণ, বোধহয় ডাকতেও পারে না। মাথার উপর দীর্ঘ সরু

BanglaBook.org

দেবদারু। গাঢ় কালচে সবুজে পাতা নিবিড় এবং কশ্‌কশ্‌ করছে হাওয়ার মৃদু চলাচলে। পাতায় বসে আছে হলুদ ক্ষুদ্র পোকারা। ধুলোও পড়েছে কোথা থেকে। পাতার ভিতর দিয়ে গলা বাড়িয়ে রয়েছে এবং খানিকটা ঝুলেই রয়েছে সবুজ সরু লাউডগা। ভেতরটা বিদ্যুতের মতো কাঁপল। দরজা খুলে গেল।

দরজা একটু ফাঁক করে ঘিরে দাঁড়ালেন সামন্ত। যেন তিনি কাউকে ভিতরে যেতে দেবেন না, ভিতরে দৃষ্টি চালাতেও দেবেন না। সামন্তকে দেখে কৃষ্ণ কিছুটা আঁতকে উঠেছে। তন্দ্রা ছেড়ে উঠে এসেছেন পরেশ। চোখেমুখে ফোলাফোলা ভাব। তৈলাক্ত মসৃণ করে মুখ কামানো। ভারী মুখ, থুতনির তলায় ঝোলা মাংস। পুরো গোল মুখটা, চোখের তারা কয়রা, গাল দু'টো ঠেলে উঠে মাংসের পুটলিশের গড়ন এনেছে, তা থেকে ঘেমো চকচকে আলো ফুটে ওঠে। লোকটাকে দেখে আজ কৃষ্ণের কেমনধারা একটা চ্যাটচেটে অনুভূতি হয়।

সামন্ত পরে রয়েছেন কোমরে লাল আংটা বাঁধা একটা কালো ছাতারঙের কিন্তু ঝলমলে নাইট-গাউন ধরনের পোশাক। এই ধরনের শোবার পোশাক আগে কখনও দেখেনি শুভেন্দু। তাঁর বুকের অনেকটাই খোলা। কড়াভর্তি লোম যেন আঁচড়ে ছোট সিঁথির মতো ভাঁজ ফেলে রেখেছে। বেশ যত্ন করেছেন, তবু ছিটিয়ে ছিটিয়ে থাকা সাদা চুল এবং এক জায়গায় বাজ পড়ার মতো সাদা হয়ে উঠেছে গুচ্ছ চুল। জিভ বার করে মুখ চাটলেন।

সামন্ত তারপর বললেন—আজ পঁচিশ তারিখ। মনে ছিল? বলে মোলায়েম করে হাসলেন কিন্তু তখনও দরজা ছাড়লেন না। এবং বলে উঠলেন—আজ আপনি না এলে, কালই আমাকে আপনার কাছে দৌড়তে হত। যাক, ভাল করেছেন। আসুন।

ভিতরে ঢুকে কোথায় বসবে স্থির করতে পারে না শুভেন্দু। সামন্ত তাকে খাটেই বসতে নির্দেশ দেন। খানিকটা দূরে খাটের একটি প্রান্তে বসেন পরেশ। ঘরটা হালকা অন্ধকারে অস্বচ্ছ। কিছুই ভাল করে চোখে পড়ে না। ধীরে ধীরে আঁধার সয়ে এলে ভিতরের অবয়ব স্পষ্ট হয় কিছু।

একটি টি-টেবিলে ফুলকারি করা ঢাকনা কাপড়ের উপর অ্যাসট্রে রাখা, বাঁকুড়ার মাটির জিনিস। ধূপদানিটা রুপোর রঙের, পুড়ে যাওয়া কাঠি যেন সেজে আছে। দামি সিগারেটের প্যাকেট এবং দামি লাইটার। সিগারেটের নাম সংখ্যা দিয়ে রাখা। প্রথম সংখ্যাটি আলাদা করে বলে, বাকি দু'টি শতকিয়ার নিয়ম অনুযায়ী একসঙ্গে জোড়া সংখ্যায় বলতে হবে। এই সংখ্যাগুলির মানে কী, কৃষ্ণ জানে না। কৃষ্ণ কত কম জানে পৃথিবীতে। কৃষ্ণ চিন্তা করে।

হঠাৎ কৃষ্ণের চোখ যায় ভেজা কাপড়ের উপর। একটি বড় বালতির কানায় শাড়ি এবং সায়া নিঙড়ে পাকিয়ে রাখা। কোথাও মেলে দিয়ে শুকানো হবে। কিন্তু ওটা তো...ওই নীল বালতিটা ওখানে কেন? ওটা তো বাথরুম মনে হচ্ছে। দরজা বন্ধ। কৃষ্ণের মনে হল, ভিতরে মানুষ আছে।

সামন্ত কৃষ্ণের দৃষ্টি লক্ষ করে বললেন—বউ চান করে বেরোবেন, এমন সময় আপনি। হল কী, বাথরুমেই আটকা পড়ে রইলেন। বার হতে আর পারছেন না। হা

BanglaBook.org

হা হা [শুকনো হাসি]।

কৃষ্ণ তটস্থ ভঙ্গিতে বলল—ঠিক আছে, আমি তা হলে গিয়ে বাইরে দাঁড়াচ্ছি, উনি বার হয়ে আসুন।

—আরে না না। ও ঠিক আছে। আপনি বসুন। আপনাতে আমাতে কাজ তো এক মিনিটের। আপনি গেলেই ও বেরোবে। চুড়ির আওয়াজ পাচ্ছেন? আসলে কী জানেন, ভেবেছিলাম অন্য লোক, দরজার মুখ থেকেই বিদেয় করব।

—আপনার স্ত্রীর কী অপারেশন?

—পেটে পাথর হয়েছে।

—ও। বলে চুড়ির শব্দ শোনার চেষ্টা করে কৃষ্ণ। তারপর বলে—আপনি সবসময় সত্য কথা বলেন দেখে আমার খুব ভাল লাগে সামন্তবাবু। স্ত্রীর হাতের চুড়ির আওয়াজ পর্যন্ত মানুষকে শুনিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা করেন, এমন স্বচ্ছবুদ্ধি বড় একটা দেখা যায় না।

—সত্য বলছেন? এমন মানুষ দেখেননি?

—না। দেখিনি ঠিক নয়, তবে কম দেখেছি। কম দেখেছি বলেই আজ খুব আনন্দ হচ্ছে।

—বুঝলাম না। বলুন, আনন্দ কেন হচ্ছে?

—আপনি গায়ে কী একটা মেখেছেন, সেই মিষ্টিগন্ধে আনন্দ হচ্ছে। অনেক কেমিক্যালের এই ধরনের মিঠে গন্ধ থাকে, কিন্তু সে খুব ভয়ানক জিনিস।

—আমি ভয়ানক? আচ্ছা, আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন বলুন তো? বলে মুখের চেহারাকে বদলে কঠিন করে তোলেন পরেশ সামন্ত।

কঠিনই নয়, মুখকে বেশ বিকৃত করে তুলে সামন্ত বললেন—প্রশ্ন করি, আপনি এখানে কেন এসেছেন ভুলে যাননি তো? ওই চা-টেবিলে টাকাটা রেখে চলে যান। একটা কথা বলি, গ্যাস ট্র্যাপ বলে কোনও কথা কখনও শুনেছেন? শোনেননি। গ্যাসকে ধরা যায়, জানেন? ধরে তারপর গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে কী গ্যাস তা শনাক্ত করা যায়। জি.সি. করতে হয়।

—আজ্ঞে। বলে কেমন দমে যায় কৃষ্ণ।

সামন্ত বলেন—গন্ধ থেকে গ্যাস চেনা যেতে পারে। কাগজে আজকাল গ্যাস-দুর্ঘটনার খবর পড়েন না? ভোপালের মিক-দুর্ঘটনা পড়েননি? আপনাকে সেদিন ভোপালের গল্প করেছি। করিনি?

—হ্যাঁ।

—বলিনি যে সব গ্যাসের চরিত্র মানুষ পুরোপুরি জানে না।

—বলেছেন।

—তা হলে আমার গায়ের মিষ্টি গন্ধটা কী দিয়ে ধরে চিনবেন? যন্ত্র আছে?

—না।

—আমি কতটা ভয়ংকর?

—জানি না।

BanglaBook.org

হা হা করে প্রকাণ্ড হাসলেন সামন্ত। বাথরুমে চুড়ির শব্দ হল। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন—শুনুন, উপর মহলে আমার লোক আছে। নীচের তলায় পার্টির ঘুরে বাবুদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ভাল। পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডে আমার মামাতো ভাই অফিসার। আমি এমন করে সব ঘুলিয়ে দিতে পারি যে, কারখানা কখন বন্ধ হয়ে যাবে টেরও পাবেন না। দেখবেন সিল হয়ে গেছে।

—অ্যাঁ! বলে মুখে কেমন একটা ভয়ের শব্দ করে ওঠে শুভেন্দু। সামন্তকে ক্রমশ আরও নির্দয় মনে হতে থাকে।

পরেশ সামন্ত তাঁর নিজের কথার জের টেনে বলেন—কমিশনার দলের মধ্যেই ইদানীং আইসোলেটেড হয়ে গিয়েছেন। ঘুরে বাবুরা বিমলবাবুর সব কাজেই বাধা দিচ্ছে। কারখানার ব্যাপারেও কথা তুলছে। তা ছাড়া অপোজিট পার্টিও স্ট্রং। এই অবস্থায় কখন কী হবে বলা যায় না। ছোট একটা কারখানার বিরুদ্ধে একটা মারকাটারি আন্দোলন হোক, আমি চাই না।

—আমি সঙ্গে করে টাকা কিন্তু এনেছি সামন্তবাবু।

—আমিও কিন্তু পুকুরের জল বোতলে করে ধরে এনেছি কৃষ্ণবাবু। প্রপার সায়েন্টিফিক সাম্পলিং করা হয়েছে। প্রপার প্রিজারভেশনও রয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় জল ভরেছি। কিন্তু সেই জলের ল্যাবরেটরি টেস্ট হবে না। টাকা পেলেই সেই জল ফেলে দেব। বলে উঠে গিয়ে ফ্রিজ খুলে একটা ভারী রঙিন কাচের বোতল টেনে বার করে আনলেন পরেশ সামন্ত। তারপর ভর্তি জলের বোতলটা চা-টেবিলের উপর রেখে দিলেন। ভর্তি ঘোলা জল। দেখা যায়, তার ভিতরে একটি ছোট মায়ামাছ মরে গিয়ে ভাসছে।

কৃষ্ণ অসম্ভব হতবাক হয়ে গেল। সামন্তর গাল দু'টো হালকা আঁধারে তামার মতো চকচক করছে। মাছটা কী করে এল! মরে গিয়ে ঢুকেছে?

—আপনাদের ছোট গুদামে কী কী রাসায়নিক দ্রব্য রয়েছে, আমাকে দেখতে হবে। বলে উঠলেন সামন্ত। সামন্তর চোখের দৃষ্টি পারদের মতো ভারী। এই মানুষটাকে কি কখনও গাঢ় কুয়াশার ভোরে একলা পাবে না শুভেন্দু? নিজেরই ভাবনার চরিত্র দেখে চমকে ওঠে কৃষ্ণ। ইন্ডিভিজুয়াল কিলিং-এ আজও কি বিশ্বাস করে সে? শংকরপ্রসাদের জিঘাংসার একটা অর্থ বার করতে চায় কৃষ্ণের মন। এখন আর প্রসাদকে তার খারাপ মনে হয় না।

—মাছটা মরে গেছে সামন্তবাবু!

—ছোট মাছ তো মরবেই। বড় মাছ ছোট মাছকে খেয়ে ফেলে। কারখানার ওই পুকুরে এই নিয়ম চলেছে। আপনি 'মাৎস্যন্যায়' কথাটার বাংলা মানে জানেন? মাছ মাছকে খেয়ে ফেলবে, এটাও এক ধরনের 'ন্যায়'। বড় মাছ ছোট মাছকে গিলে খেয়ে পেটের টক্সিসিটি বাড়িয়ে চলেছে ওই পুকুরে। এই বড় মাছ বাজারে উঠলে মানুষ তাকে খাবে। মানুষ খাবে এবং মরবে।

সহসা এবার কাতর গলায় কৃষ্ণ থলে থেকে টাকাটা বার করে চা-টেবিলে রেখে বলল—মানুষ মানুষকে খাচ্ছে সামন্তবাবু। আমাকে দেখুন। আমি বুড়ো হয়ে গেছি।

BanglaBook.org

চুল। মাথার চুল খেয়েছে ওই কারখানা। আমি গরিব। শংকরপ্রসাদ বলেছে, আমি যেন চুলগুলো আপনাকে দেখাই। দেখে বলুন, বুড়ো মানুষের কাছে কত চাওয়া যায়! আমি পাঁচ হাজার এনেছি। এইই আমাদের কাছে অনেক বেশি সামন্তবাবু। এর বেশি নেই।

সামন্তর চোখ ধীরে ধীরে বড় এবং তীব্র কঠিন হয়ে উঠল। সেই দৃষ্টির সামনেই দূষিত জলের বোতলটা হাতে করে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে কৃষ্ণ। পরেশ সামন্ত গলাকে ভারী করে বলে উঠলেন—ন্যাকামি করবেন না। বোতল রেখে টাকা তুলে নিয়ে বেরিয়ে যান। ওই টাকায় হবে না। আপনি বুড়োমি করছেন কেন? আপনি কি বুড়ো? এখনই যদি একটা উইলিং মেয়েমানুষ পান, আপনি খাবেন না?

—কী বললেন?

—মেয়েমানুষ দিলে খাবেন না, ছেড়ে দেবেন?

ভয়ংকর অবাক হয়ে বোতল কোলের উপর রেখে কৃষ্ণ ধীরে ধীরে আবার খাটের উপর বসে পড়ল।

গলা তার একেবারে খাদে নেমে গেল, সে শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তবু বলে উঠল—আমি কোনও নোংরা কথা সহ্য করতে পারি না, মি. সামন্ত। আমার রুচির ওপর অনুগ্রহ করে এভাবে পীড়ন করবেন না। আমি অসুস্থ। আমি সহজেই উত্তেজিত হই। আমার মধ্যে ইমোশনাল ডিসটার্ব্যান্স আছে। আমি বিশ্বাস করি, সত্যিকার ভালবাসা পেলে আমার মাথার সাদাচুল কালো হবে। একদিন নিশ্চয় হবে।

—সরি। আমার ভুল হয়েছে।

—আমার মূত্রদ্বারে জ্বালা হয় দাদা। এই পৃথিবী হয়তো আমার ভোগেই আসবে না। পৃথিবীটা ঠিক কার আজও আমার জানা হল না। আপনার না আমার?

—সরি, সরি।

—আমি উঠছি। বলে বোতল হাতে করে উঠে দাঁড়াল কৃষ্ণ। তারপর বলল—আমি রাজনীতি না করেই বলব না, করেছি সামান্যই, তাতেই জেল খেটেছি। এখন বলছি মি. সামন্ত, সেই আগের সময় যদি থাকত, আপনাকে আজ খুন করে বেরিয়ে যেতাম।

—মাফ করবেন ভাই। আপনি ভাল মানুষ। কিন্তু কারখানাটা আপনার ভাল নয়।

—ওই কারখানাই আমার মুখের অন্ন জোগাচ্ছে মি. সামন্ত। ওটার সঙ্গেই আমার যুদ্ধ। সেই যুদ্ধই পৃথিবীর শেষ যুদ্ধ মনে রাখবেন। আমি জানি, আমি কী করেছি। কেউ জানে না। বলে দরজার কাছ অবধি চলে আসে কৃষ্ণ।

বোতলটা ভাল করে আঁকড়ে ধরে দরজার কাছে এসে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ বলল— আমি চলে গেলেই, বাথরুমে আটকে রাখা আপনার মেয়েমানুষকে আপনি বার করে দেবেন। দেবেন না? আমারই মতো করে তাড়াবেন। ভোগ করো এবং ফেলে দাও। ঘুস খাও এবং ভোগ করো।

দরজার কাছে সরে এসে থমথমে গলায় সামন্ত এবার বলে উঠলেন— এই টাকায় কিন্তু স্ত্রীর খোরপোষ হবে না কৃষ্ণ। আরও লাগবে। এর থেকে কিছু মেয়েমানুষকেও

BanglaBook.org

দিতে হবে। চুড়ির আওয়াজ দিচ্ছে, দেখছেন না।

কৃষ্ণ আর ভাল করে সামন্তর মুখের দিকে চাইতে পারল না। এত কুৎসিত মনে হল মুখটা।

হঠাৎই আবার বলে উঠল সামন্ত — ঘুস কে খায় না? মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী, এম.পি. সবাই খায়। ঘুসকে এখন বলা হচ্ছে সহনীয় অন্যায়। এদেশে এখন মিথ্যা, অন্যায় এবং সেক্স, সবকিছুরই পারমিজিব্‌ল লিমিট আছে, সহনীয় সীমার মধ্যে থাকলে সবই চলে। যেমন দূষণ, ওটা সীমার মধ্যে থাকলেই হল। যাও কৃষ্ণ, নিজের পায়ের জুতো মুখে করে বাড়ি ফিরে যাও। যাও বলে একটু ধাক্কা দিয়ে কৃষ্ণকে বাইরে ঠেলে দিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলেন সামন্ত। মুখের উপর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। স্থির হয়ে কিছুক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল কৃষ্ণ। মাথার ভেতরটা তার কী একটা পাক খেয়ে ঘুরে উঠল দু'বার।

গলিতে পা ফেলতে গিয়ে পা ঠিক মতো পড়ছে না, খানিকটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। বোতলটাকে দ্রুত চোরের মতো কাপড়ের ব্যাগের মধ্যে চালান করে দিয়ে সিধে হয়ে হাঁটবার চেষ্টা করে। গলি শেষ করে এসে দেখে দোকানটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেখানেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে শুভেন্দু। কী মনে করে ফের সামন্তর বাসার দিকে ছুটতে শুরু করে। তার সহসা মনে হয়, লোকটাকে একটা চড় মেরে আসবে সে। দরজার সামনে কৃষ্ণ দাঁড়ানো মাত্রই হঠাৎ দরজা আপনা থেকে খুলে গেল। সে ভয়ে পিছিয়ে দরজার সামনে থেকে সরে আড়ালে আসে, তখনই দরজা দিয়ে একটা মেয়েমুখ ভেসে ওঠে। কৃষ্ণ ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে। তাদেরই পাড়ার বউ এটি। স্বামী কলকাতার একটি পোস্ট-অফিসে চাকরি করে। এদের একমাত্র সন্তান, ছেলেটি জিতুর সঙ্গে হস্টেলে থেকে পড়ে।

কৃষ্ণ লজ্জায় পাগলের মতো ছুটতে শুরু করে। সে যেন কোথাও পৃথিবীর বাইরে পালিয়ে যেতে চাইছে। আবার দোকানটার কাছে আসে। দাঁড়িয়ে থাকে। বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। বুঝতে পারে, মেয়েটি সংকোচে বার হয়ে আসতে পারছে না। দোকানের ওখান থেকে তাই সরে চলে আসে কৃষ্ণ। চলে এসে স্টেশনের কাছে একটা চায়ের দোকানে বসে যায়। চায়ের দোকান নির্জন। আরও কিছুক্ষণ বাদে খদ্দের লাগবে। রোদ বেশ নরম হয়ে এসেছে। চা চাইল শুভেন্দু।

এখান দিয়েই স্টেশনে উঠবে হয়তো বউটা। অথবা সামনের ওই সড়ক দিয়ে চলে গিয়ে লাইন পেরোবে।

চা তৈরি হয়। বিস্কুট নেয় কৃষ্ণ। চা-বিস্কুট খায়। বসে থাকে। তারপর পয়সা মিটিয়ে যেই উঠে দাঁড়িয়েছে, সড়কের উপর দেখা যায় বউটাকে। বউটা মাথা নিচু করে হেঁটে গেল। লাইন পেরিয়ে গেল। শুভেন্দু সড়কে না গিয়ে সিড়ি দিয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এল। সে রয়েছে উল্টো দিকের প্ল্যাটফর্মে। উল্টো দিকের মাথায় চলে আসে শুভেন্দু। টিকিট কেটে নিয়েছে। বউটা টিকিট না কেটেই ডাউনের ট্রেন ধরবার জন্য রেলের পাত ডিঙিয়ে ওপারে চলে গেছে। এই মুখ দিয়ে লাইন পার হয় শুভেন্দু। বউটা তাকে দেখতে পেয়েছে। ডাউন ট্রেন আসছে।

BanglaBook.org

বউটাকে ফলো করে একই কামরায় ভিড় ঠেলে ঢুকে পড়ে কৃষ্ণ। এক সময় আবিষ্কার করে বউটা তার গায়ে সেঁটে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার হাতের পলিথিনের বড় ব্যাগে ভেজা কাপড়-সায়া কৃষ্ণের গায়ে লেগে একটা কেমন ভেজা শব্দ করছে। ভেজাভেজা অনুভূতি হয় কৃষ্ণের। ঘেন্না ঘেন্না লাগে। সে কেবল ভাববার চেষ্টা করে, তার দূষিত বোতলটাও তো বউটার শরীরে গিয়ে লাগছে। সবটাই কি পারমিজিবল লিমিটের মধ্যে রয়েছে? এইভাবে যাওয়া, একসঙ্গে, একি সত্যিই সহনীয় একটি চমৎকার ভ্রমণ? বউটার কীসের অভাব? কতখানি?

কৃষ্ণের মুখে চেয়ে বউটা নির্বিকার গলায় শুধাল — ভাল আছেন? কোথা থেকে আসছেন?

কৃষ্ণ থ হয়ে মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল — হ্যাঁ, ভাল আছি। বলে কী একটা দুর্বোধ্য সংকোচে শুভেন্দু তার দৃষ্টিটাকে মাথার উপরকার ফ্যানের ঘূর্ণির মধ্যে ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বউটা একটুও লজ্জিত নয়, তার চোখেমুখে একফোঁটা গ্লানি নেই, অত্যন্ত নিষ্পাপ দৃষ্টি। কেনই বা হবে না! বউটা কোথা থেকে কী করে ফিরছে, কৃষ্ণ কি সত্যিই তা দেখেছে? মেয়েটা এই মুহূর্তেই বুঝিয়ে দিয়েছে, কোনও কালে সে এই ঘটনার কথা কবুল করবে না পৃথিবীর কারও কাছে। পাড়ায় গিয়ে কৃষ্ণ সাহস করে এই কথা তুললে সে নিজেই কী ভীষণ অপমানিত হবে এবং অত্যন্ত নোংরা লোকে পরিণত হবে, তা ভেবে ভেতরে ভেতরে কেঁপে ওঠে।

গড়িয়ায় বড় আকারের লোকস্রোত নেমে যেতেই ভিড় হালকা হয়ে যায়। মেয়েটা কৃষ্ণের বুকের কাছ থেকে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে তার চেনা একটি লোকের সঙ্গে দিব্যি হেসে হেসে কথা বলতে থাকে। মাঝে মাঝে কৃষ্ণের দিকে চাইছে এবং একটা মধুর সরল ভাব ফুটিয়ে তুলছে।

সোনারপুরে ঢুকছে গাড়ি। এমন সময় কামরার একটা কোণ থেকে টিকিট কাটা যন্ত্র হাতে করে কালো পোষাক পরা টিকিট কালেকটার বার হয়ে এসে মেয়েটার কাছে টিকিট দেখতে চাইল। বউটা সঙ্গে সঙ্গে তার পলিথিনের ব্যাগের ভিতর থেকে মানিব্যাগ বার করে অত্যন্ত তাজা একগুচ্ছ একশো টাকার নোট বার করে তার থেকে একখানা বেছে নিয়ে কালেকটারের সামনে এগিয়ে ধরে বলল — ঢাকুরিয়া থেকে উঠেছি, টিকিট কাটার সময় পাইনি, যা করবার করুন।

পঞ্চাশ টাকার ফাইন হয়ে গেল। বউটার গায়ে একটুও লাগল না। কৃষ্ণ চোখ বড় বড় করে দেখল, তাজা নোটগুলি ঘুসের তাড়া থেকেই বউটার মানিব্যাগে ঢুকেছে। এত নতুন টাকা এবং এতগুলি নোট কখনও কোনও বধূর পলিথিন ব্যাগে থাকে না। এমন অযত্নেও ঠেসে রাখে না কেউ।

বউটা সোনারপুরে নেমে অটো ধরবে। নামবার সময় বলল — আপনার ইন্ডাস্ট্রি কেমন চলছে কৃষ্ণবাবু! ভাল? বলে মাথা মিষ্টি করে কাত করে বউটা নেমে গেল। সহসা কৃষ্ণের মনে হল, বউটা তাকে ব্যঙ্গ করল এবং বুঝিয়ে গেল, তোমার সব দুর্বলতা আমার নখদর্পণে শ্রীকৃষ্ণ। আমি তোমার সাংঘাতিক ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখি। অতএব যা দেখেছ, চেপে যাও। আমিও চেপে থাকব। তুমি একবার ভেবে

BanglaBook.org

দ্যাখো, কোথায় তুমি ঘুস দাও এবং কোথায় গড়িয়ে আসে সেই টাকা? আমি সতী নই, কিন্তু তুমিও সৎ নও।

খোঁচা

কৃষ্ণ সোনারপুরে নামল না। ট্রেন ছেড়ে দিল। তার গ্লানি হচ্ছিল। সে একটা বসবার ঠাঁই পেয়েও ছেড়ে দিল। বসল না দুটি কারণে। প্রথমত দুটো স্টেশন বাদেই তাকে নেমে পড়তে হবে। দ্বিতীয়ত তার গা গুলোচ্ছে। বমি করা দরকার। অতএব কৃষ্ণ ট্রেনের দরজার খোলা মুখের একদিকে এসে ঝুলে পড়ার মতো করে দাঁড়ায়। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা নেয় শরীরে। মুখ অল্প হাঁ করে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। ঘষা সিসার মতো সন্ধ্যার আকাশে মায়ের চোখের মতো একটা তারা ফুটেছে। সেই দিকে চেয়ে কেবলই তার মনের মধ্যে ভেসে আসে দৃশ্যসংলাপ, 'নিজের পায়ের জুতো মুখে করে বাড়ি ফিরে যাও। যাও ' বলে সামন্ত তাকে গলা ধাক্কা দিচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে, 'আপনার ইন্ডাস্ট্রি কেমন চলছে কৃষ্ণবাবু! ভাল?' বলে বউটা মিষ্টি করে মাথা একপাশে কাত করছে। এই দৃশ্য এবং কথা ক্রমাগত রচনা করে তোলে কৃষ্ণের মন।

কৃষ্ণ মনের মধ্যে বারংবার সামন্তকে তার মাথার সাদাচুল দেখাতে থাকে। তখনই আবছা ছুটন্ত মাঠে একটা সান্ধ্য কালো কুকুরকে ছুটে বেড়াতে দেখে। ভাবে, একটা কুকুর কী করে ছুটে বেড়ায় বমি করার জন্য। কৃষ্ণ জানে, বমি করতে কুকুরের বেশ কষ্ট হয়। কুকুর ধারালো কুশঘাসে মুখ হাঁ করে ডুবিয়ে মুখের মধ্যে খোঁচা নেয়, নিয়ে বিবমিষাকে বাড়িয়ে তুলে বমি করে দেয়। কৃষ্ণের এখন একটি আচমকা খোঁচা দরকার তার আলজিহ্বা পর্যন্ত।

যে কোনও দিন উর্বীর পরিবারের ভিতর থেকে কোনও একটা অদৃশ্য তীব্র খোঁচা এসে লাগতে পারে তার গায়ে। লাগব লাগব করেও লাগে না। কৃষ্ণকে শুভেন্দু সাবধান হতে বলে। দুজনে তর্ক বাধিয়ে তোলে। বিষয়-বিচারে দুজনেরই জেদ কম নয়। একজন আর একজনকে খণ্ডন করে, একজন পরাস্ত হয়েও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মন একটি মল্লভূমিতে পরিণত হয়।

তবে এই খেলায় শুভেন্দুর কাছে বেশি মার খায় কৃষ্ণ। পরাস্ত হয় অধিক। কখনও কখনও আত্মসমর্পণ করে বসে। অধিকন্তু কৃষ্ণ বোবার মতো গুমরে ওঠে। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ শুভেন্দুকে বলে, আমি তোমার চেয়ে বেশি দেখি শুভেন্দু, তুমি চুপ করো। শুভেন্দু তখন হেসে ওঠে ব্যঙ্গে, কৌতুকে, শাণিত অট্টহাস্যে এবং জ্বালায়। নীচে তাদের সংলাপ দেওয়া হল।

শুভেন্দু: দ্যাখো কৃষ্ণ। একটি খোঁচা খাবে বলে এভাবে ছুটে মরার পাগলামি মানুষ করে না। তুমি দূষিত বোতলটা ফেলে দিয়ে বাড়ি ফিরে চলো।

কৃষ্ণ: না। বিষে বিষে বিষক্ষয় হয়। অপমানের ভার দিয়েই অপমানকে সরাতে হয়। আমি সামন্তকে ক্ষমা করতে পারছি না। বউটাকে একটা চড় মারা দরকার ছিল।

BanglaBook.org

এই সব গরল আমি বইতে পারছি না।

শুভেন্দু: হা হা হা। তুমি কিন্তু গরলের মধ্যে পড়ে মরে থাকা একটি ক্ষুদ্র মায়ামাছকে বয়ে নিয়ে চলেছ। তুমি চোরের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে কোথাও যেতে চাও? কোথায় রাখবে এই রসায়ন-বিষে ভর্তি বোতলটা?

কৃষ্ণ: আমি উর্বীর হাতে তুলে দেব। বলব, লুকিয়ে রাখো। ও যখন জানতে চাইবে, কী আছে এতে? আমি বলব, রেখে দাও, পরে বলব।

শুভেন্দু: পরে? কবে? পরেই বা কী বলবে উর্বীকে?

কৃষ্ণ: সেকথাও আমি তোমাকে পরেই বলতে চাই শুভেন্দু।

শুভেন্দু: হাঃ! হাঃ। তার মানে তুমি জান না। শোনো, উর্বী তোমার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট। তুমি চল্লিশ, ও বাইশ। ওর তোমাকে কাকা ডাকার কথা। তুমিই তা হতে দাওনি। তোমার একটি জেল-ফেরতা ইমেজ দিয়ে তাকে বশ করেছ। ও তখন ক্লাশ নাইনের ছাত্রী, তুমি যখন জেল থেকে বেরিয়ে এলে। মনে আছে নিশ্চয়।

কৃষ্ণ: আছে বইকী। আমি কেন ভুলব! ১৯৭৬ সাল। জরুরি অবস্থা চলছে। সারা দেশে নকশাল-আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এলেও সি.পি.আই (এম.এল) পার্টির নানা ভগ্নাংশের ভিতর থেকে সেকেন্ড সি.সি. নাম দিয়ে একটি ভাগ তখন শেষ বারের মতো জেগে ওঠার চেষ্টা করেছিল। চারিদিকে ধরপাকড় হচ্ছে, তারই মধ্যে। আমি তাকে বলি অন্ত জোয়ারের মৃদু জলোচ্ছ্বাস। মাত্র ছ'মাস আমার রাজনৈতিক জীবন শুভেন্দু। মুর্শিদাবাদে এই আন্দোলন, অস্তোন্মুখ হয়েও ছড়িয়ে ছড়িয়ে যেতে চাইছিল। অরুণাংশু আমাকে টেনে নিয়ে গেল। আমি কী খেয়ালে এম.এস.সি-র দ্বিতীয় বর্ষের পড়া ছেড়ে, বছরের গোড়াতেই একদিন চলে গেলাম বহরমপুর। তখন আমার বয়েস একুশ-বাইশই হবে।

শুভেন্দু: তারপর যাদবপুরের এক বন্ধুর বাড়ি থেকে, মাকে দেখতে এসে, ধরা পড়লে পুলিশের হাতে। এই ধরনের খেয়াল তোমার সারাজীবন চলেছে। দশ বছর জেল খেটে বেরিয়ে ভাবলে, এবার তাহলে বাঁচবে কীভাবে, খাবে কী? বাঁচার অত তীব্র ইচ্ছে আগে কখনও অনুভব করনি। জীবনের উপর একটা সাংঘাতিক লোভ হল তোমার। উর্বী তোমাকে দেখেছিল, ওর মামা, তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার অমরেন্দ্র বসুর বাড়িতে, ড্রয়িংরুমে। তখন তোমার চোখেমুখে জগৎ জয়-করে-ফেরা ঝলসানো একটা আলো খেলা করছিল, তুমি ভগ্ন কিন্তু পরাভূত নও।

কৃষ্ণ: আমি তখন বত্রিশ। যৌবন ছিল। লোকে ভাবে, আমি জেলেই সব বয়েস খরচ করে এসেছি, তা কিন্তু নয়। চাকরির বয়েস ছিল না বলতে পার। কিন্তু তখন সংসারে ঢুকে বাঁচার ইচ্ছে প্রবল হয়েছে। ওই যে আলো বললে, সেটা একটা খিদে, খুব জৈব ইচ্ছের আলো, স্বীকার করি।

শুভেন্দু: না, শুধু তাইই নয়। ওটা আসলে জেলখাটার তেজ। তাই দিয়ে একটি ষোড়শীকে তুমি অন্ধ করেছিলে। উর্বীকে দেখে প্রথম দৃষ্টিতেই তোমার মনের মধ্যে লোভ জন্মেছিল। গোপনে, কিন্তু সবটাই অবচেতনে নয়। তুমি জানতে, তুমি কী চাইছ।

BanglaBook.org

কৃষ্ণ: সেটা ওই আলোটার দোষ শুভেন্দু। উর্বী ওই আলো দেখে ভুলেছে, আমি ভোলাতে চাইনি।

শুভেন্দু: মিথ্যে কথা। তাইই যদি না হবে, তাহলে স্যার যখন তোমাকে বললেন, আমার ভাগ্নীকে সায়েন্সের সাবজেক্টগুলো মাঝে মাঝে একটু-আধটু দেখিয়ে দিও, তখন কেন তুমি ভাবলে, এ যে মেঘ না চাইতেই জল।

কৃষ্ণ: প্রেমের ঘটনাগুলো এইভাবেই ঘটে শুভেন্দু। সিকোয়েন্স প্রেমকে সাহায্য করে। স্যার বলেছিলেন, আমার ভাগ্নীটা একটু গরিব শুভেন্দু। ভাগ্য-বিপর্যয়ে ওর বাবার অবস্থা হঠাৎ করে পড়ে গিয়েছে। ওরা অর্থাভাবে কলকাতার ভিতরে থাকতে না পেরে শহরের বাড়ি বেচে দিয়ে সুভাষগ্রামে চলে গেছে। ওখানে নতুন নতুন বসতি হচ্ছে, শস্তা জমিতে কোনও রকমে বাড়ি তুলেছে একখানা। তুমি সুভাষগ্রামে গিয়ে তোমার সুবিধা মতন দু'একটা দিন ওকে পড়াশুনোটা দেখিয়ে দিয়ে আসবে। দিনের বেলা কারখানাটা খাড়া করে তোলার চেষ্টা করবে। পারবে না?

শুভেন্দু: উর্বীর বয়েসটা তখন হয়তো টেনেটুনে ষোলো ছুঁয়েছে। মারাত্মক বয়স। সালোয়ার-কামিজ পরা মেয়েটি। বয়েসের তুলনায় একটু আগেই ভরে উঠেছে। তার তখন অ্যানুয়াল পরীক্ষা। তার মাথাটা তুমি ঘুরিয়ে দিয়ে মনটাকেও কানায় কানায় ভরিয়ে তুললে। দৃষ্টিচঞ্চল সৌন্দর্য-উচ্ছল খুদে মেয়েটার হেঁটে চলার পদচাঞ্চল্য গেল কমে। দৃষ্টিতে জেগে উঠল অচেনা একটা পিপাসা। এ তুমি কী করে দিলে তার।

কৃষ্ণ: উর্বীরা গরিব জেনেই আমি এগিয়েছিলাম শুভেন্দু। ওদের অবস্থা পড়ে গিয়েছে জেনেই।

শুভেন্দু: এই হিসেব কিন্তু তোমার লোভকে আরও প্রকট করে। তুমি উর্বীর চোখে হয়ে উঠেছিলে মহাপুরুষ। সে হতবাক হয়ে তোমাকে চেয়ে চেয়ে দেখত। তুমি কখনও তাকে বলনি, তুমি তা নও। বরং তুমি তাকে জেলের অভিজ্ঞতা শুনিয়ে বারবার নিজের দিকে আকর্ষণ করেছ। এই গল্পটার অনেক বয়েস হয়েছে কৃষ্ণ। এটা আজ অচল হয়ে গিয়েছে।

কৃষ্ণ: [কাতর গলায় বলল]। ওই একটা গল্প ছাড়া আমার আর কিছুই নেই শুভেন্দু। প্রেমিকার চোখে বিশিষ্ট হওয়ার আর কী আছে আমার! সে কিন্তু বিশ্বাস করে। আমি তার চোখে কিংবদন্তি। আমি মহাপুরুষ। আমার প্রত্যেকটি কথায় ও আজও চঞ্চল হয়। সেও আমার চোখে কী, তা তুমি জান না। সে আমার দূষিত পৃথিবীর শেষ স্নিগ্ধতা।

শুভেন্দু: কাব্য করছ। অক্ষম, দুর্বল এবং বাসনাপীড়িত পোড়া মানুষরা চিরকালই ওই করে, কাব্য। তবে কিছু মনে কোরো না। আমিও একটা উপমা দিয়ে একটা খাঁটি কথা বলতে পারি। শুনবে?

কৃষ্ণ: বলো।

শুভেন্দু: একটা মস্ত মরুভূমির জিভের তলায় একটি ছোটনদী কীভাবে থাকে।

কৃষ্ণ: ওহ্ শুভেন্দু!

শুভেন্দু: নদীর যেমন ভয়, তোমাকেও ওই পরিবারটা সেই রকম ভয় করে। ওরা

BanglaBook.org

তোমাকে ভদ্রতাবশত তাড়াতে পারে না। মেনেও নেয় না। তোমার নিঃশ্বাসে উর্বীর মা সরমার বুক শুকিয়ে ওঠে। মাস্টারমশাই বলে একটা লোকদেখানো আলগা খাতির পাও আজও। মনে রাখবে, উর্বীরা হঠাৎ পড়ে যাওয়া একটি পরিবার, যাদের ঊর্ধ্বাকাঙ্ক্ষা প্রবল। ওদের মধ্যে তুমি সর্বহারা সেজে ঢুকেছ, সব হারিয়েই সেখান থেকে তোমার ফেরা উচিত। খোঁচা যেদিন খাবে, সেই খোঁচার বর্শা হৃৎপিণ্ড অবধি ঢুকে যেতে পারে। তুমি উর্বীর ভবিষ্যৎ ভেবে সরে এসো।

কৃষ্ণ: না। আমি পারব না। মরুভূমি দরকার হলে নদীকে খেয়ে শেষ করে বাড়ে, থামে না। মরুভূমির বৃদ্ধি নিঃশব্দে চলেছে শুভেন্দু। আমাকে সবুজ করবে কে? ওই ক্ষুদ্র মেয়েটা, যে এখন পূর্ণ যৌবনা, এখনও যার রক্ত আমাকে দেখে চঞ্চল হয়? আমাকে কীভাবে ফেরাবে তুমি, কীভাবে?

শুভেন্দু: তুমি কাকে বলছ, একথা?

কৃষ্ণ: তোমাকেই শুভেন্দু, আর কাকে বলব!

শুভেন্দু: না হে, ভাবলাম, তুমি বুঝি উর্বীকেই বলছ, মনে মনে। যদি তাকেই কখনও বলো, ও কেঁদে ভাসিয়ে ফেলবে। তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়ার মতো সামান্য বল ওর নেই। ওকে এতই দুর্বল করে ফেলেছ তুমি!

কৃষ্ণ: সত্যিই কি উর্বীর আত্মার এমনই দুর্গতি হয়েছে! কিন্তু কখনও তো বুঝিনি। আমি তো মাস্টারের মতো করে কথা বলি। ও ছাত্রীর মতো করে শোনে।

শুভেন্দু: এটা দুই তরফেরই অভিনয়। উর্বী চায় তোমার উত্তপ্ত আলিঙ্গন, সেই বাসনা ওর চোখে ফুটে ওঠে। তুমি বোঝো না?

কৃষ্ণ : লোভ দেখাবে না শুভেন্দু। তোমার মতলব ভাল নয়।

শুভেন্দু: আর মহাপুরুষ সেজে থেকো না কৃষ্ণ, ঠকবে। উর্বীকে তোমার সমস্ত দুর্বলতার কথা বলে দাও। বিয়ের প্রস্তাব দাও।

কৃষ্ণ: আমার মূত্রদ্বারে জ্বালা হয়। আমি শ্রমিক। আমি একটু একটু করে মৌকে মেরে ফেলছি। আমার ভবিষ্যৎ কী। বড়ই অপমানের জীবন। আমি একটি মায়ামাছ। একথা বলব?

শুভেন্দু: বলো, বলে দাও।

কৃষ্ণ: [হঠাৎ-ই তপ্ত গলায়]। মূর্খের মতো বোলো না শুভেন্দু। আমি উর্বীকে এই সব গোপন পাপের কথা বলতে পারি না। আমাকে সে একটি ক্ষুদ্র কারখানার মালিক বলে জানে। জানে, আমার জ্ঞান দিয়ে কারখানাটা চলে। আমি তার মামার কাছে সহজ গলায় বলেছিলাম, কোনও নটোরিয়াস কেমিক্যাল আমার কারখানায় তৈরি হবে না। আমি কথা রাখিনি।

শুভেন্দু: তুমি কেন পারনি, সেকথা বলে দাও। বলে দাও, তুমি শ্রমিক। তুমি সামন্তর কাছে জুতো খেয়ে ফিরছ। তোমার ব্যাগে বিষাক্ত জল। তুমিই এই জলকে বিষাক্ত করেছ। তোমার জ্ঞান মৌয়ের দৃষ্টি নিবিয়ে দিয়েছে। গাভিদের নষ্ট করেছে। শিউশরণকে পাগল করে দিয়েছে। তুমিই প্রকাশকে দিয়েছ দুরারোগ্য ব্যাধি।

কৃষ্ণ: আমি যা করেছি বাঁচার জন্য করেছি।

BanglaBook.org

শুভেন্দু: সেই কথা বলে উর্বীর সমর্থন চাও।

কৃষ্ণ: উর্বী সমর্থন করবে না। এই বোতলটা কোথায় রাখি শুভেন্দু! ফেলে কেন দিতে পারছি না!

শুভেন্দু : এটাই ট্র্যাজেডি কৃষ্ণ। তুমি ওই জলের ক্ষতিকারক মাত্রা জানতে চাও। উর্বী কেমিস্ট্রির ছাত্রী। ওদের ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে স্পেকট্রোফটোমিটার রয়েছে, জলের দোষ মাপবার যন্ত্র বি. ও. ডি এবং সি. ও. ডি মাপার ব্যবস্থাও রয়েছে। ওর মামা ওই জল মেপে দিতে পারেন। তুমি আজ সেই উদ্দেশ্যে সুভাষগ্রামে ট্রেন থেকে নামলে। বিজ্ঞান মানুষের পাপের শেষ সীমা জানতে চায়।

কৃষ্ণ [পাগলের মতো করে]। তুমি চুপ করো শুভেন্দু। আমি সবই অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাই। আমাকে এই জল কোনও ল্যাবরেটরি পরীক্ষা করে দেবে না। আমি কে? আমাকে কেন দেবে? প্রাইভেট ল্যাবগুলো ভয় পাবে। সরকারি ল্যাব পাত্তা দেবে না। কিন্তু আমার পাপ কতটা, আমি জানব না? আমি জানব না? জানব না আমি?

শুভেন্দু চমৎকার। এ না হলে কৃষ্ণ। ঠিক আছে, উর্বীকে সমস্ত কথা বলে দাও।

কৃষ্ণ : না, পারব না।

শুভেন্দু বলতেই তো হবে। নইলে উর্বী কী করে ওই দূষিত জলের পরীক্ষাটা তার ইউনিভারসিটিতে গিয়ে...ভেবে দ্যাখো।

কৃষ্ণ : আমার বমি পাচ্ছে শুভেন্দু।

শুভেন্দু : হাঃ, হাঃ, হাঃ। তুমি পাগল হয়ে গেছ।

কৃষ্ণ মৌ আজ দেখতে পেয়েছে। এ আমি সইতে পারছি না। কিছুতেই পারছি না।

শুভেন্দু পাগল হয়ে গেছ। এটা মাঠ। মাঠের মধ্যে বসে পড়ো। বোতলটাকে ঝোপের মধ্যে ফেলে দাও। কেউ দেখতে পাবে না।

কৃষ্ণ ব্যাগের সঙ্গে বোতলটাকে জড়িয়ে এখন ট্রেন থেকে নেমে মাঠের মধ্যে এসে পড়েছে। বুকের সঙ্গে চেপে ধরে উবু হয়ে বসে বমি করার চেষ্টা করে। ঘাড় নামিয়ে কুশঘাসে মুখ ডোবায়। মুখে, চোখে, মুখের বিবরে তার খোঁচা লাগে। বমি তার কিছুতেই হয় না। সে তখন পাগলের মতো একলা সাঁঝের ঘোরলাগা আকাশের তারাকে শুনিয়ে বলে—ফলে অমৃত, তারই বোঁটায় বিষ। কেন? কোনটা ইথাইল এবং কোনটা মিথাইল, আমাকে জানতে কেন হয়? কেন হয়, ওহে খুদে তারা। আমার ঈশ্বর নেই, তুমিই আমাকে বলে দাও। প্রেম তো অমৃতই, আমি কেন তার কাছে গরল বয়ে নিয়ে চলেছি। আমাকে তুমি অন্ধ করে দাও হে খুদে তারা, আমি যেন এই মাঠেই চিরতরে পথ হারিয়ে ফেলি!

মাঠের মধ্যে একটি কালো কুকুর ছুটে বেড়ায়। বিবমিষার অদ্ভুত শব্দ তার গলা থেকে বার হয় না। কুকুরটা অহেতুক আনন্দে ছুটে বেড়াচ্ছে। কৃষ্ণ মনে মনে সেই অদ্ভুত অলৌকিক কুকুরটাকে দেখে বলে, আমাকে তোমার মনের আনন্দের ভাগ দাও

BanglaBook.org

সারমেয়, তোমার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সৌন্দর্যের অধিকার দাও। বলতে বলতে ঘাসের উপর চিত হয়ে শুয়ে যায় কৃষ্ণ। বুকের উপর ধরে থাকে ব্যাগে জড়ানো বোতলটা। মহাকাশে চেয়ে থাকে। ঠাণ্ডা হাওয়া তার গায়ে এসে সোহাগের স্পর্শ বুলিয়ে দেয়। মাঠের ওই দিকে ছাড়া ছাড়া বাড়িঘরের আলো চোখে পড়ে। তারই একটিতে উর্বী রয়েছে। ভাবতে ভাবতে চোখ বন্ধ করে কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। এক সময় হঠাৎ তন্দ্রা ছুটে গেলে সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে এবং উঠে দাঁড়ায়। দ্রুতই হাঁটতে শুরু করে। কুকুরটাকে আর দেখতে পায় না। বুলাদের বাড়িতে এসে ঢোকে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট পড়া দেখায়, সামান্যই পড়া নেয়। তারপর বেরিয়ে আসে। বুলাকে বলে—উর্বীকে একটু ডেকে দাও তো, আমি রাস্তায় আছি। আজ আর ওদের বাড়ি ঢুকব না। বলবে, আমার সঙ্গে এখনই একবার প্রবীরদের বাড়ি যেতে হবে।

—ও আচ্ছা! বলে বুলা উর্বীকে ডাকতে যায়। কৃষ্ণ রাস্তার একটি আলোহীন ল্যাম্পপোস্টের তলায় এসে দাঁড়ায়। সে এখন, কালো বোন সুমিতার কথা ভাবে। তোর বিয়ের জন্য আমি টাকা জমাচ্ছি সুমি। তুই ভাবিস না। বলেই মনে মনে কৃষ্ণ হেসে ফেলে। সুমি তো কারও অনুগ্রহ চায় না। বাড়ি থেকে চলে গেছে। একটি শস্তার মেসে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। বাড়ি আসতে চায় না। তার জীবন সম্পর্কে ভাবনা কী, কেউ জানে না। দাদা টাকা জমাচ্ছে শুনেও তার কোনও আগ্রহ দেখা যায় না। সে কি ভেবেই নিয়েছে, তার কখনও বিয়ে হবে না। বিয়ের চেষ্টা যে না হয়েছে, তা তো নয়। মাঝে মাঝেই হয়েছে। কলেজে যখন ঢুকল, তখন থেকেই। সুমি আজ বোধহয় তার কালোমুখ আর কাউকেই দেখাতে রাজি নয়। তবু দাদার চাপে তাকে বসতে হয়, তাকে দেখতে আসা পুরুষের সামনে। তাকে দেখে বাতিল করার জন্যই লোকগুলো আসে। সুমির জীবনে কোনও ছলেই কি কোনও প্রেমিক-পুরুষের উদয় হয় না? কেন হয় না?

—আবার প্রেম? উর্বীর জীবনে উদিত হয়ে তুমি কি ভাল করেছ কৃষ্ণ। তুমি ভেবে দ্যাখো, সব মানুষের জীবনে প্রেমের দরকার নেই। দরকার সমাজস্বীকৃত যৌনতার। সেই ব্যবস্থা চাই। এই সমাজ তোমার বোনের জন্য সেই বরাদ্দটুকুও করেনি। টাকা দিয়ে একটি সমর্থ বেটাছেলে কিনতে হবে। এই ঘটনার সঙ্গে তোমার রসায়নের কী সম্বন্ধ? তোমার এই বোতলটার? ভাবতে গিয়ে আপাদমস্তক কেমন কেঁপে ওঠে কৃষ্ণ। ভাবে, আমি কি বোনের জন্যও এই বোতলটা বহন করছি?

ল্যাম্পপোস্টের চারধারের মিটমিটে আলো-শাসিত আঁধারে কৃষ্ণের কাছে চলে আসে উর্বী। এসে অবাক হয়ে আঁধারেই তার স্যারের মুখের দিকে চোখ তোলে।

—তুমি এখানে এমন করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

—প্রবীরের কাছে একবার যাই। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

—না। তুমি কেন যাবে। আমিই যা জানার, সময় করে জানব। আমিই যখন প্রবীরকে সুমির কথা বলেছি এবং মেসে গিয়ে প্রবীরকে দেখিয়েও এনেছি সুমিকে। তখন আমারই দায়িত্ব।...

BanglaBook.org

—হ্যাঁ। প্রবীর সুমির দাঁত আর চুলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। আমি শুনেছি।

—তুমি শুনেছ মানে! কবে ওর সঙ্গে দেখা হল, কোথায়?

—হয়েছে। তোমাকে বলা হয়নি।

—কবে কথা হল!

—দিন পনেরো আগে। ট্রেনে করে শিয়ালদা থেকে ফিরছি, ট্রেনেই দেখা। ভিড়ের মধ্যে লাজুক গলায় বলে ফেলল, সুমির হাসি ঠিক মাধুরীর মতো। এই রকম হাসি আমি কম দেখেছি। চুলের কী গোছ, কী কালো! আপনি বোধহয় জানেন, মকবুল ফিদা হোসেন মাধুরীর হম আপকে হ্যায় কৌন ৬৮ বার দেখেছেন। ভাবুন, একজন শিল্পীর কেমন দম! মাধুরী অত বড় শিল্পীর মডেল হবে না তো কী! কিছু মনে করছেন না তো! আমি আবার একটু আঁকিটাকি।

—ও।

—তোমার কী মনে হয়? কেমন আঁকে ছেলেটা?

—প্রবীর লম্বা লম্বা কথা বলতে ভালবাসে কৃষ্ণদা। হিন্দি সিনেমার পোকা। ৬৮ বার ওই সিনেমাটা প্রবীরও হয়তো দেখেছে।

—তা যাই-ই করুক। এই প্রথম একজন কেউ সুমির অমন করে প্রশংসা করল উর্বী! শিল্পী যখন, একটা ম্যাডনেস থাকতেই পারে।

—মেয়েদের অকারণ প্রশংসা করার বাতিক থাকে কারও কারও। তারা ওই পাগলামির রোগে পড়ে ছবি আঁকতেও পারে। আমি জানি না। আমি প্রবীরের ছবি আঁকা দেখিনি। আমি জানি, ও একটা ইউনিভারসিটির ক্লার্ক। বয়েস হয়েছে। ঠিক আছে চলো।

ওরা দ্রুত হেঁটেই প্রবীরের বাড়ির কাছে চলে আসে মিনিট দশেকের মধ্যে। রাস্তায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে কৃষ্ণ। উর্বী প্রবীরকে ডাকবার জন্য প্রবীরদের বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ পিছন থেকে ডেকে ওঠে কৃষ্ণ। উর্বী ঘুরে দাঁড়ায়। কৃষ্ণ একটু এগিয়ে এসে বলে ওঠে—থাক উর্বী। যেয়ো না।

উর্বী অবাক হয়। কৃষ্ণ বলল—প্রবীর যদি আর প্রশংসা না করে। ও যে আমার বোনটার চুল আর দাঁতের তারিফ করেছে, তাই-ই অনেক। সেই প্রশংসা আমার শুনতে ভাল লেগেছিল উর্বী। তুমি আর জানতে যেয়ো না। এসো।

এই-ই উর্বীর কৃষ্ণদা। উর্বী ইতস্তত করে খানিকটা, প্রবীরদের আলোজ্বলা বাড়িটার দিকে চেয়ে থাকে দু'দণ্ড। তারপর কৃষ্ণের পাশে রাস্তায় নেমে আসে।

পথে চলতে চলতে সহসা উর্বী জানতে চায়—তুমি এই জন্যেই এমন করে ছুটে এসেছিলে!

—না। বুলাকে পড়ানোর ছিল। তা ছাড়া ...

—তা ছাড়া?

—একটি জিনিস সঙ্গে আছে। তোমাকে দিচ্ছি, একটু সাবধানে লুকিয়ে রাখবে।

—কী?

বোতলটা এবার ব্যাগ থেকে বার করে কৃষ্ণ। উর্বীর হাতে দিয়ে বলে—শাড়ির

BanglaBook.org

আড়ালে করে নিয়ে বাড়ি ঢুকবে।

—কেন? কী আছে এতে?

—জল।

—কীসের জল?

—কারখানার। বলেই শুভেন্দু চমকে উঠল। অদ্ভুত এই যে, উর্বী আর কোনও প্রশ্ন করল না। শুধু বলল— তোমার কাঁধের ব্যাগটা দাও।

ব্যাগটার মধ্যে বোতলটা রেখে কাঁধে ঝুলিয়ে নেয় উর্বী। চুপচাপ হেঁটে আসে স্টেশন পর্যন্ত। গাড়ি এসে লাগে। কৃষ্ণ উঠে পড়ে। প্ল্যাটফর্মে গাড়ির গা-ঘেঁষে জানলার কাছে দাঁড়ায় উর্বী। কৃষ্ণের হাতের উপর এই প্রথম এত স্পষ্ট করে নরম শীতল হাতটা রাখে এবং আলতো করে চাপ দেয়, যেন সে হৃদয় দিয়ে তার মাস্টারমশাইয়ের হাত স্পর্শ করেছে।

ট্রেন যখনই গড়াতে শুরু করে হঠাৎ উর্বী বলে ওঠে—প্রবীর সুমিকে বিয়ে করবে বলে প্রশংসা করেনি কৃষ্ণদা। তুমি ভয় পেয়ো না। ট্রেন চলতে শুরু করে। আশ্চর্য একটি খোঁচা খেয়ে দাঁড়া সিধে করে কৃষ্ণ।

বোতলটা উর্বীর হাতে তুলে দিতে পেরে নিজেকে এক ধরনের ভারমুক্ত মনে হচ্ছিল কৃষ্ণের। এই অনুভূতিটা কাউকে সে বোঝাতে পারবে না। একই সঙ্গে একটি আশ্চর্য খোঁচা খেয়ে তার দাঁড়া সিধে হয়ে উঠলেও মন তার শান্ত হয়েছে। বমি হল না। কিন্তু অসোয়াস্তিটাও আর আগের মতো নেই।

ট্রেন থেকে নেমে শুভেন্দু সোজা হাঁটতে হাঁটতে ডাক্তার সীতানাথ মণ্ডলের চেম্বারে চলে আসে। এসে দেখে উনি অগ্রগামী ক্লাবের একটা ফাংশনে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে দেরি না করে চেম্বারের ওখান থেকে একটি রিকশা করে ক্লাবের যেখানে অনুষ্ঠান হচ্ছে, সেই মাঠে চলে আসে। ক্লাবের নাতিদীর্ঘ মাঠে লোকজন বিশেষ জমেনি। ঘড়িতে আটটা বেজে গেছে। রোববারের টিভির বাংলা সিনেমা দেখে তবে লোকেরা ফাংশনে আসবে। এখন আসার সময় হয়েছে। টিভির দৌরাত্ম্যে রবিবারের দিনেও সামাজিক কোনও অনুষ্ঠান করা মুশকিল হয়েছে। টিভি মানুষের সামাজিক বিচ্ছিন্নতার প্রধান একটি শক্তি।

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠান। আটটার পরে কিছু লোক জমল বটে, কিন্তু মাঠটা মোটেও ভরল না। বেঞ্চি পাতা হয়েছে, শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। মঞ্চও হয়েছে একটা মোটামুটি। মাইক বসেছে। রবীন্দ্র-প্রতিকৃতিতে সভাপতি ডাঃ সীতানাথ মণ্ডল মাল্যদান করলেন। একজন এম এল এ অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা, মানুষটি অবশ্য কোনও একটি মফস্‌সল কলেজের লেকচারার। এই সব অনুষ্ঠানে সাধারণত যা হয়ে থাকে তাই-ই হল। রবীন্দ্রসংগীত এবং রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় যারা স্থান অধিকার করেছে, তাদের মঞ্চে উপস্থিত করা হল একের পর এক।

সহসাই কৃষ্ণের চোখ গিয়ে পড়ল সবিতা দত্তর উপর। মঞ্চের কাছে বেঞ্চে বসে রয়েছে, পাশে ওর মেয়ে মৌ। সবিতা কিছুটা সেজেছে। ওর খোঁপায় একটা সাদা

BanglaBook.org

ফুলের ছোট মালা জড়ানো। ইমিটেশনের দুল আর মালা পরেছে। বাসন্তী রঙের শাড়ির সঙ্গে সবুজ রঙের ব্লাউজ তাকে একটি স্নিগ্ধ উদ্ভাসে মোহময় করে তুলেছে। সবিতাকে আজ কেমন অচেনা অচেনা লাগছিল। তার মাথার সিঁদুর সিঁথির আড়ালে লুকনোর চেষ্টা করেনি সবিতা। সবিতার দৃষ্টিতে একটি সবল বিষণ্ণতা খেলা করছিল। কৃষ্ণ মঞ্চের কাছে সরে এল।

সীতানাথ অনুষ্ঠানের ফাঁকেই এক সময় কৃষ্ণকে মঞ্চের উপরে ডাকলেন। কানে কানে বললেন—তুমি চলে যেও না। অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত থেকো।

'আচ্ছা' বলে মঞ্চ থেকে নেমে মঞ্চের কাছেই দাঁড়িয়ে রইল কৃষ্ণ। গান হল, বক্তৃতা হল, সবই শুনল সে। এ যুগে, এই মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা খুব সুন্দর করে 'আলোচনা' করলেন অতিথি-বক্তা। মাথা নেড়ে বক্তাকে সমর্থন করছিলেন অনুষ্ঠান-সভাপতি ডাক্তার সীতানাথ মণ্ডল।

কৃষ্ণ এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে না পারলেও মাঝে মাঝেই সবিতার মেয়ে মৌয়ের চোখের দিকে চেয়ে দেখছিল। মৌ তার দিকে চেয়ে বোধহয় চিনতে পেরেছিল। দু'টি হাতের বিভিন্ন মুদ্রা করে মৌ আপন মনে খেলা করছিল আর হাসছিল। হাসিটা কী করুণ! এই মেয়ের সারা দেহে গোপন বিষ। গায়ে ঘায়ের দাগ। রক্তাল্পতায় মলিন মুখাবয়ব, সেই মুখে হাসি ফুটে ওঠে কী করে। মাঝে মাঝেই পেটের যন্ত্রণায় কাতরায়। অসহ্য সেই কাতরানি, বমি করে নেতিয়ে পড়ে। হাত পা শীর্ণ। এর বেঁচে থাকাই বিস্ময়কর। একটু একটু করে জন্মের পর থেকেই বিষ একে মারছে। একে কী করে সামলায় সবিতা। এর যন্ত্রণা কী করে সহ্য করে! ইদানীং গলা চড়িয়ে কাঁদতেও পারে না। চিঁ চিঁ করে। মাঝে মাঝে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। দুধের সঙ্গে মৃত্যু ঢুকে এ দেহে স্থায়ী বাসা বেঁধেছে। ক্ষুদে মেয়েটার চোখে কী মৃত্যুই জেগে আছে! যেন সে হাত নেড়ে নেড়ে মৃত্যুর সঙ্গেই খেলা করছিল। বক্তৃতা, গান শেষ হয়ে এসেছিল। এবার নিশ্চয় ডাঃ মণ্ডলকে কিছু বলে অনুষ্ঠান শেষ করে দিতে হবে। তার আগে ঘোষণা হল, সভাপতি বলার আগে আমরা আজকের অনুষ্ঠানের শেষ আবৃত্তি প্রতিযোগী সবিতা দত্তর মুখে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন' কবিতাটি আবৃত্তি শুনব। তাঁকে মঞ্চে আসতে অনুরোধ করছি। সবিতা দত্ত এখন 'প্রশ্ন' কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবেন। তার আগে তাঁর হাতে প্রথম স্থানাধিকারিণীর পুরস্কার তুলে দেবেন মাননীয় প্রধান অতিথি, অধ্যাপক এবং বিধায়ক শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ পুরকাইত।

এই ঘটনায় অসীম আনন্দ পাচ্ছিল কৃষ্ণ। তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছিল বিজয়ী মানুষের চাপা খুশির সূক্ষ্ম চাঞ্চল্য। সবিতা হঠাৎ আজ কৃষ্ণের চোখে বিশেষ মানুষ হয়ে উঠেছিল, তার এই ক্ষমতার কথা কৃষ্ণের জানা ছিল না। সবিতাকে অনুষ্ঠান পরিচালকরা আলাদা সম্মান দিচ্ছিল, সহজেই টের পেয়েছিল কৃষ্ণ। একটি সামান্যা গৃহবধূ মঞ্চে ওঠা মাত্রই হয়ে উঠল অন্য এক অসামান্যা নারী। এই রকম ঘটনাও সহসা সংসারে ঘটে যায়। আবৃত্তি শুরু করার আগে সবিতা দু'হাতে গৃহীত পুরস্কারটি, যার সঙ্গে ফুলের একটি হালকা সাদা প্লাস্টিক জড়ানো বুকেও রয়েছে, সব সমেত তার দু'হাত সে হঠাৎ বাড়িয়ে ধরল কৃষ্ণের দিকে। কৃষ্ণ চকিত বিস্ময়ে যন্ত্রচালিতের

BanglaBook.org

মতো নিজের দু'হাত সেদিকে বাড়িয়ে ধরল। মঞ্চের প্রদত্ত সবিতার সমস্ত সম্মানের আলো যেন তার চোখে এসেও লাগল।

ঘটনার অপ্রত্যাশিত বিস্ময়কর পীড়নে কৃষ্ণের চোখে জল এসে পড়তে চাইছিল। সে নিজেকে সামাল দিতে না পেরে দু'হাত ভর্তি পুরস্কার নিয়ে মৌয়ের পাশে এসে ঝপ করে বসে পড়ে বোকার মতো নিঃশব্দে হাসল। তারপর পুরস্কার ও পুষ্পগুচ্ছ একবার মৌয়ের কোলে দিল, ক্ষুদ্র কোলে ধরল না বলে ফের বোকারই মতো নিজের কোলে রেখে মঞ্চের দিকে তাকাল। মৌকে চাপা গলায় বলল—মা এবার আবৃত্তি করবেন। আমরা দু'জনে শুনব। সবাই শুনবে।

দেখা গেল, সমস্ত পরিবেশ বেশ শান্ত হয়ে গেছে। সবিতার দানাদার ভারী গলা ভেসে উঠল, সে বলল— রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন', আমি আপনাদের সামনে আবৃত্তি করে শোনাচ্ছি। আসলে আমি এই কবিতাটা বাচ্চাদের শেখাই।

"ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে—"

এ যে পরিশীলিত গলা, গভীর এবং দৃপ্ত, কিন্তু ওইটুকু উচ্চারণ মাত্রই সমস্ত কবিতাটা একলপ্তে মনে পড়ে গেল কৃষ্ণের। সঙ্গে সঙ্গে মনের উচ্ছলিত তরঙ্গ গেল নিবে, শরীরটা কুঁকড়ে গেল, অপরিমেয় সংকোচ ভার হয়ে চেপে ধরল কৃষ্ণকে এবং প্রচণ্ড হিমে পুঁতে যাওয়া দেহের মতো বরফ-স্থবিরতার মূর্তি হয়ে উঠল সে।

সবিতার গলায় তরঙ্গ-ঝংকৃত হয়ে খাদে নামল স্বর, স্বর ঈষৎ ভিজে উঠেছে :

"আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপটরাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।"

নিঃসহায়কে মঞ্চে এবং শরীরের পাশে দেখতে পেল কৃষ্ণ।

সবিতা গেয়ে উঠল

"আমি যে দেখেছি—প্রতিকারহীন, শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।"

যেন কেঁদে উঠল সবিতা।

"আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।"

কৃষ্ণের মনে হল, তরুণ বালক নয়, একটি তরুণী কোনও অদৃশ্য পাথরে মঞ্চে দাঁড়িয়ে মাথা কুটছে।

"কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপ্নের তলে।
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—"

এ বার স্পষ্ট করে সবিতা চোখের কোণে অশ্রু ধরে কৃষ্ণকেই প্রশ্ন করল যেন, যেন বা প্রার্থনার সুরে নিজের সপক্ষে কৃষ্ণকে টান দিয়ে উচ্চারণ করল :

BanglaBook.org

"যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভাল?"

এ প্রশ্ন সত্যি কাকে করল সবিতা? নিজেকে, সভাকে, কৃষ্ণকে? হঠাৎ কৃষ্ণের বলে উঠতে ইচ্ছে করল চিৎকার করে, 'আমি নিজেকে ক্ষমা করি না সবিতা। কিন্তু নিজেকে যে আমি ভালবাসি।'

তারপর বিড়বিড় করে উঠল কৃষ্ণ— 'আমি তোমার বায়ু বিষাক্ত করেছি সবিতা। তোমার আলো নিবিয়ে দিয়েছি। তুমি মাথা কুটে মরলেও জবাব পাবে না। রবীন্দ্রনাথের এ প্রশ্ন আমার কাছে অর্থহীন, অপ্রাসঙ্গিক। নিজেকে ক্ষমা করি না সত্য, কিন্তু প্রশ্নের জবাবও আমি দিই না। আমি গোপন করি। কপটরাত্রি ছায়ায় গোপন করি রাসায়নিক হিংসা, নিঃসহায়কে সেই হিংসা জটিল গ্যাসীয় অদৃশ্য দেহে ছুটে গিয়ে বধ করে, এই একটি অনিবার্য অস্ত্র আমি ব্যবহার করি। আমি কৃষ্ণ, আমি যা জানি, আমি তা বলি না।'

সামান্য তিন মিনিট বক্তৃতা করলেন ডাক্তার মণ্ডল। তারপর নেমে এসে সবিতার সামনে দাঁড়ালেন। বললেন—আপনি যে এত ভাল আবৃত্তি করেন, আগে জানা ছিল না। আপনার মেয়ের চোখ কেমন আছে? কী রে খুকি, দেখতে পাস? বলে মৌয়ের উপর ঝুঁকে নেমে হাতের মধ্যে ক্ষুদ্র বালিকার মুখটা সাদরে গ্রহণ করেন সীতানাথ।

মৌ মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলে। অর্থাৎ সে দেখতে পায়।

সবিতা শুধায়—আপনি কী করে আমার মেয়ের কথা জানলেন ডাক্তারবাবু?

—সে আমি জেনেছি। শুনুন, আমি এই মেয়ের চিকিৎসা চাই। কীভাবে সেটা হবে, পরে আপনাকে জানাব। কৃষ্ণ মারফত সব জেনে যাবেন। আপনি যখন আবৃত্তি করছিলেন, আমি তখন শুধু আপনার মেয়ের দিকে চেয়েছিলাম। এসো কৃষ্ণ। তোমাকে আমার দরকার। বলে নিজের মোটর সাইকেলের দিকে দ্রুত এগিয়ে গেলেন ডাঃ এস. এন. মণ্ডল। কৃষ্ণ সবিতার হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে মোটর বাইকের পিছনে গিয়ে বসল। কৃষ্ণকে সীতানাথ ব্যাকে বসিয়ে নিয়ে উড়ে চলে গেলেন রাস্তা দিয়ে তাঁর গন্তব্যে।

চেম্বারে এনে কৃষ্ণকে একটি চেয়ারে বসতে নির্দেশ করে ডাক্তার দরজাটা বন্ধ করে ফ্যান চালিয়ে শুধু একটি টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে রাখলেন। স্পষ্ট আলো নয়, কালো ধরনের আলো এসে পড়েছে কৃষ্ণের গায়ে, বলা যায়, আলোর ছায়া লেগেছে। টেবিল ল্যাম্পের চোখ তীব্র হয়ে দেওয়ালে পড়ছে সরাসরি।

সীতানাথ আকস্মিক বলে উঠলেন— ডাক্তার নন্দী সে দিন সেমিনারে ছিলেন। আমার এক বন্ধু ডাক্তারও এসেছিল বেলুড় থেকে। সে অবশ্য একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনেরও সদস্য। এই বন্ধু ডাক্তারটি আমাকেও ওই সংগঠনের সদস্য হতে বাধ্য করেছে। প্রথমে বাধ্য হলেও, এখন মনে করি আমি ঠিকই করেছি। সংগঠনটির নাম 'প্রগতি মঞ্চ'। এদের কাজ হল, দূষণ প্রতিরোধে মানুষকে সাহায্য করা। শ্রমিকদের সাহায্য করা। মানুষকে সচেতন করা। সে যাই হোক। আমি তোমাকে যা বলতে চাই, তা হল ... বলে একদণ্ড চুপ করে যান সীতানাথ।

BanglaBook.org

কৃষ্ণ বুঝতে পারে তার বোধহয় কোনও বিচার শুরু হতে যাচ্ছে। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে গাঢ় গলায় সে বলে ওঠে—বলো সীতানাথ।

সীতানাথ আলোর পার্শ্বস্থ ছায়ায় কৃষ্ণের দিকে চোখ তুলে বললেন—ডক্টর নন্দী প্রথমে বলতে না চাইলেও শেষ পর্যন্ত হঠাৎই বলে ফেললেন, দত্তদের খুদে মেয়েটির রোগ তিনি ধরতে পারছেন না। তবে তিনি একটি সন্দেহ করেন। বুঝতে পারছ, আমি কী বলতে চাইছি। ওরা গরিব। রক্ত, পেচ্ছাব, মল—সবই পরীক্ষা করাবে প্রগতি মঞ্চ। তুমি শুধু ওকে, মানে শিশুটিকে সঙ্গে করে, শিশুর মা-ও সঙ্গে যাবে, বেলুড়ে ডক্টর দত্তর কাছে যাবে। আমি মনে করি, তুমিই জান, বাচ্চা মেয়েটার কী হয়েছে।

কৃষ্ণ বলে উঠল—আমি জানি না সীতানাথ। কারণ আমি ডাক্তার বা বিজ্ঞানী নই। আমি ওয়ার্কার।

সীতানাথ মৃদু ধমক দিয়ে বলে উঠলেন—তুমি কী, আমি তা জানি, শোনো তুমি কী জান, আমাকে তা বলতে হবে না। আমি দত্তকে টেলিফোনে বলে দেব, সবিতার সামনে ও তোমাকে কোনও প্রশ্ন করবে না। যা করবে, একান্ত আড়ালে করবে। এবং সব কথা গোপন থাকবে। কারণ, সঠিক তথ্য না পেলে চিকিৎসা করা যায় না। তুমি জেনে রাখ, অনুন্নত দেশে এই সব চিকিৎসা শুরুই করা যায়নি, দু'চারজন চেষ্টা করছেন মাত্র। এ দেশে শিল্পায়ন হচ্ছে যেমন তেমন করে, ছোট কারখানা গজাচ্ছে, কোথায় কখন কীভাবে জানা নেই। কী হচ্ছে সেখানে, কেউ জানে না।

—আমিও জানি না সীতানাথ। অসহায় হয়ে বলে উঠল কৃষ্ণ।

—জানি। এখানে অন্ধের চিকিৎসাও একজন অন্ধ ডাক্তারকেই করতে হয়। তাঁকেও হাতড়াতে হয়। ব্যবস্থা কিছুই নেই। রোগ চেনা যায় না।

—তুমি তাহলে কেন চিনতে চাইছ সীতানাথ?

—তুমি কি চিনতে চাও না কৃষ্ণ? বলো?

—না।

—কেন চাও না?

—তাহলে যে নিজেকেই চিনতে হয়। আমার অসুখ, আমার রোগ, তুমি চিনেছ কখনও?

গলার স্বর কাতর করে নামিয়ে সীতানাথ বললেন—আমি তোমাকে দেখব শুভেন্দু। কথা দিচ্ছি।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে কৃষ্ণ বলল— বেশ, তাহলে আমি যাব। তুমি আমার পাপ দূর করো সীতানাথ। আমি একদিন মানুষের মুক্তির কথা ভেবেছিলাম, সেই গল্প আজ অচল হয়ে গেছে। আমি একটি কারখানা মাথার মধ্যে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। বর্জ্য পদার্থের মতো সে আমাকে একদিন কোথায় ফেলে দেবে আমি জানি না। তুমি জান? সীতানাথ তুমি জান?

এমন তীব্র চাপা গলায় বলল কৃষ্ণ যে, সীতানাথ চমকে উঠলেন। ডাক্তারের চোখ কী একটা ব্যথায় ছোট হয়ে এল।

BanglaBook.org

ধরা গলায় সীতানাথ বললেন—ভারতবর্ষে দূষণ প্রতিরোধ সহজ নয় শুভেন্দু। আমি উপলব্ধি করি। তুমি একখানা চিঠি সবিতাকে এই রাত্রেই দেবে। ভয় পেয়ো না। আমি লিখে দিচ্ছি।

কৃষ্ণের মনে পড়ল, ভয় না পাওয়ার কথা উর্বীও তাকে বলেছে। মানুষ তার সঙ্গে এইভাবে কথা বলছে কেন? এ কি দয়া নাকি ভালবাসা। আমিও নিঃসহায়? নিজেকে শুধায় কৃষ্ণ।

ডাক্তারের চেম্বার ছেড়ে পথে নেমে হাঁটতে হাঁটতে কৃষ্ণের মনে তার নিজেরই ভাবনা ধাক্কা দিয়ে উঠল। সীতানাথ তাকে দিয়ে সঠিক তথ্য কবুল করাতে চাইছেন। অর্থাৎ কারখানার দোষেই যে মৌয়ের আজ এই অবস্থা, সেই সন্দেহকে দিতে চাইছেন বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতিষ্ঠা। মনে পড়ল, সীতানাথ প্রথমাবধি কারখানাটিকে সন্দেহ করেন। বারবার প্রশ্ন করেছেন, খাটাল কেন উঠে গেল। লোকে জানে, খাটাল-পলিউশনই খাটালকে উচ্ছেদ করেছে, খাটালই গাভির দুধ নষ্ট করে দিয়েছিল। খাটালের সঙ্গে কারখানার কোনও সম্পর্ক ছিল না।

হঠাৎ কৃষ্ণের মনটা ঘুরে রুখে দাঁড়াল। শুভেন্দু বলল— দ্যাখো কৃষ্ণ, বেলুড়ের ডাক্তার তোমাকে নানান প্রশ্ন করবেন। কী কী বিষাক্ত কেমিক্যাল তোমরা ম্যানুফ্যাকচার করো, জানতে চাইবেন। প্রশ্ন করবেন কারখানার বর্জ্য পদার্থ কোথায় গিয়ে জমে। সেই পুকুরের প্রসঙ্গ আসবে। এই সব কথা তুমি বলতে যাবে কেন? তুমি উর্বীকে জলের বোতলটাই বা দিয়ে এলে কেন? ক্রমশ তুমি এগিয়ে যাচ্ছ কারখানাটিকে বন্ধ করার সিদ্ধান্তের দিকে। তুমিই হয়ে উঠছ ধীরে ধীরে তোমার জীবিকার প্রতিপক্ষ। তুমি ভুল করলে। তুমি কি বুঝলে না, সীতানাথ বেশ মতলব করে তোমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করলেন? ডাক্তাররা রোগ ধরতে না পেরে তোমার কাছে রোগের উৎস জানতে চাইছেন। তুমি ফিরে গিয়ে সীতানাথকে বলো, খাটালই গাভির দুধ নষ্ট করেছিল। তুমি যে যেচে এসে অপরিজ্ঞাত পাপকে কাঁধে তুলে নিলে। এত বোকামি কেউ করে?

রুখে ঘুরে দাঁড়ানো কৃষ্ণ সীতানাথের চেম্বারে ঝড়ো হাওয়ার মুখে পড়া কোনও বিষবাষ্পের মতো ভেসে উড়ে আসে। তাকে ফের হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে উপস্থিত হতে দেখে সীতানাথ অবাক হন। টেবিলল্যাম্পের আলো আগের মতোই দেওয়ালে সরাসরি পড়ে জ্বলছে, তিনি রয়েছেন আলোর ছায়ার মধ্যে একা, কী যেন ভাবছিলেন। বললেন— একী! তুমি ফিরে এলে?

—হ্যাঁ। বলে সম্মুখের চেয়ারে বসে পড়ল কৃষ্ণ। তারপর বলল— তোমাকে একটা কথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি সীতানাথ। খাটালের দুধ যে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল প্রকাশ আমাকে বলেছে কীভাবে নষ্ট হল, সবিস্তারে বলেছে আমাকে ওই দুধ খেয়ে...

শুভেন্দুর কথা শুনে বেশ কিছুক্ষণ থম মেরে চেয়ারে বসে রইলেন সীতানাথ। তারপর মৃদুস্বরে বললেন—ডা. দত্ত যদি জানতে চায়, সবিস্তারেই বলবে। না চাইলে বলবে না। তাছাড়া সবিতা তো যাচ্ছে সঙ্গে। খাটাল-পলিউশনের কথা আমি

BanglaBook.org

সেমিনারে বলেছি কৃষ্ণ।

—আচ্ছা আসি তাহলে? বলে কৃষ্ণ উঠে দাঁড়াল। তীব্র আলোর পার্শ্বস্থ উজ্জ্বল আঁধারে কৃষ্ণের মনে হল, সীতানাথের মুখটা অত্যন্ত রহস্যময়। যেন মানুষ নয়, কী রকম দুর্বোধ্য একটি অস্তিত্ব, চোয়াল শক্ত করে তীব্র দৃষ্টিতে তাকে দেখছে।

গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন সীতানাথ— দত্তরা মিউনিসিপ্যালিটিতে কারখানার বিরুদ্ধে দরখাস্ত করেছে। এই অবস্থায় তুমি যদি তাদের মেয়েকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাও, তাহলে ওদের ক্রোধ কমে। এটা কি তোমার পক্ষেও ভাল হয় না?

— হয়।

—আমি সেই জন্যই তোমাকে পাঠাচ্ছি। তোমাকে আমি বুঝি। আমি চাই, তুমি ভাল থাকো। মৌ সুস্থ হলে, তুমি আনন্দ পাবে। এবার আরও অধিক রহস্যময় হয়ে ওঠেন সীতানাথ। তাঁকে বিশ্বাস করতে পারে না কৃষ্ণ। সবিতার কাছে ছুটে এসে সীতানাথের লেখা, যা তিনি ডা. দত্তকে লিখেছেন, সেটি, সেই চিঠিটা গ্রিলের ফাঁক দিয়ে পৌঁছে দেয়। অতঃপর ছুটে আসে প্রকাশের কাছে।

প্রকাশকে জিজ্ঞাসা করে— আজ তুমি একাই সীতানাথের কাছে গেলে, ডাক্তার কী বলল তোমাকে? খাটালের কথা বলেছিলে? তুমি গাইয়ের ডাক শুনতে পাও, বলেছিলে?

—জি। বলে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল প্রকাশ। তার কপালের উপর মাথার বাল্‌বটা পুড়ে যাচ্ছে আগুনে।

—আর কী বলেছিলে?

—আউর কুছ নহি।

—মনে করো।

—জি। ইয়াদ হচ্ছে না।

প্রকাশের দৃষ্টি ঘুমে জড়ানো। সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে সজোরে গায়ে নাড়া দিয়ে ডেকে তুলেছে শুভেন্দু। যেই প্রকাশ বলল, তার কিছু মনে পড়ছে না, তৎক্ষণাৎ রাগ ধরে গেল শুভেন্দুর, যা আগে কখনও হয়নি। তার মনে হয়, প্রকাশ কথা লুকোচ্ছে। চোখ পাকিয়ে তুলে শুভেন্দু বলল— ইয়াদ করো প্রকাশ। যা বলেছ, মনে করো। একটি একটি করে সব কথা বলতে হবে তোমাকে। আমি আসছি। বলে শুভেন্দু প্রকাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

মহিমা শুভেন্দুর কাছে এগিয়ে আসেন। ছেলেকে উত্তেজিত দেখে অবাক হন। জিজ্ঞাসা করেন— কী হয়েছে কৃষ্ণ? প্রকাশকে অমন করে কী বলছিস?

—কিছু না। সীতানাথ ওকে কী বলেছে, বলতেই পারছে না। সীতানাথ নিশ্চয় কারখানার কথাও জানতে চেয়েছে? কী কথা জানতে চেয়েছে?

—তাতে কী হল?

—হল না। তুমিও যেমন। জগৎটা খুব সোজা জায়গা নয় মা। খেতে দাও, খিদে পেয়েছে।

—কী হয়েছে তোর, আমাকে বল। জিতুকে কেমন দেখলি? এত রাত হল যে!

BanglaBook.org

সামন্তর কাছে গিয়েছিলি? টাকা দিয়েছিস?

—হ্যাঁ। বিদিশা জিতুকে দেখতে আসেনি। মায়ের কথা বললেই ওইটুকু বাচ্চা কী বলবে ভেবে না পেয়ে দূরে কোথায় চেয়ে থাকে, তখন নিজেকে খুব বোকা লাগে। সামন্ত ঘুষ খেল। মাত্র পাঁচ হাজার টাকা দেখে আমাকে অপমান করল। খুঁটিয়ে শুনতে চেও না।

—না, চাইব না। তুই খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়। প্রকাশকে আর ঘাঁটাস না।

কোনও কথা না বলে কৃষ্ণ চুপ করে রইল। সকালে ভাল করে খেতেই পারেনি, মা সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। কিন্তু এখন পেটে তীব্র ক্ষুধা থাকলেও, তার টান ছিল না খাদ্যের দিকে। খেতে বসে, অল্প খেয়েই উঠে পড়ল। সে অদ্ভুত ছটফট করছিল।

বিছানায় শুয়ে ঘুম আসছিল না। এপাশ ওপাশ করছিল কৃষ্ণ। সহসা মনে হল, প্রকাশের কাছ থেকে সীতানাথ সব কথা খুঁটিয়ে বার করে নিয়েছে। রাত এগারোটা। মা নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ভাবতে ভাবতে বিছানায় উঠে বসে কৃষ্ণ।

রাত নিশুতি হয়েছে। মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক ছাড়া কিছুই শোনা যায় না। বৈশাখের এলোমেলো হাওয়া বইছে বাইরে। বাতাসে হাহাকার। হাহাকারের ভিতরে সবিতা দত্তর আবৃত্তি গুঞ্জন করছে যেন। কৃষ্ণ বিছানা ছেড়ে নামে। দ্রুত চোরের মতো চলে আসে প্রকাশের ঘরে। ঘর অন্ধকার।

থানার সেলে এই রকম মাঝ রাতে পুলিশ রুল হাতে করে ঢুকত, তাদের কঠিন জেরা করত। মারত, শাসাত এবং কৃষ্ণের মুখ থেকে কিছুই বার করতে পারত না। না পেরে বুনো মোষের মতো খেপে যেত।

আলো জ্বেলে দিল কৃষ্ণ। আলোর স্পর্শে চমকে উঠল প্রকাশের অর্ধঘুমন্ত শরীর। প্রকাশের কোমরের দিকে পরনের কাপড় জড়ো হয়ে উঠেছে। প্রায় নগ্ন হয়ে শুয়ে রয়েছে ছোকরা। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে প্রকাশ সলজ্জ গলায় বলে উঠল— হে রাম। বলে কাপড় ঠিক করতে ব্যস্ত হল।

কঠিন গলায় কৃষ্ণ বলে উঠল— তুমি সত্য কথা বলো, আমি এসেছি। বলেছিলাম, আমি আসব। বলিনি?

অসহায় হয়ে প্রকাশ শুধু বলল— জি। বলেই সে ভয় পেয়ে উঠল।

—সীতানাথ কী বলল তোমাকে?

—কুছ নহি।

—তুমি কী বললে ডাক্তারকে?

—কুছ নহি।

—শালা, তুমি মিছে বলছ। তুমি খাটালে কী করতে? তুমি পানি বইতে বাহকে করে। পুকুর থেকে জল তুলে নিয়ে যেতে না?

—জি। বলে ভয়ানক আশ্চর্য হল প্রকাশ। এ যেন অন্য কোনও লোক, তাকে ওই রকম কটু শব্দ কখনও প্রয়োগ করেনি কৃষ্ণ।

—তুমি জল বইতে, জাবনা দিতে গোরুকে।

BanglaBook.org

—জি।

—বলনি সেকথা?

—জি নহি।

—কেন মিথ্যা কথা বলছ প্রকাশ যাদব!

প্রকাশ বুঝে পেল না, অত্যন্ত নরম মনের মানুষ কৃষ্ণদা হঠাৎ তাকে এভাবে জেরা করছে কেন? খাটালে তাকে কী কাজ করতে হত সবাই জানে। এই প্রশ্নের তো কোনও মানে হয় না। ডাক্তারকে সত্যিই সে কোনও কথা বলেনি। খালি বলেছে, সে মৃত গাভিদের ডাক শুনতে পায়।

কৃষ্ণের চোখের দিকে চাইতে পারছে না প্রকাশ। জানোয়ারের মতো ধকধক করে জ্বলছে চোখ দু'টো। এত রাগ ওই মানুষটার মধ্যে রয়েছে, হে রাম!

—মিথ্যে বলে আজ তুমি পার পাবে না প্রকাশ। আবার বলে ওঠে কৃষ্ণ। তারপর ফের বলে—মনে করো।

ঘাবড়ে গিয়ে প্রকাশ বলে ওঠে— লেকিন ইয়াদ নহি আতা।

—তুই কি মার খাবি প্রকাশ? ভেবে দ্যাখ, আমি তোকে ফুসলে শুধোচ্ছি। এরপর না বললে, শালা গাই কা বাচ্চা, তোকে আমি খুন করে ফেলব।

চমকে ওঠে প্রকাশ যাদব। মাঝ রাতে এই রকম জুলুম কেন তার উপর? কী হয়েছে? ডাক্তার কি কিছু বলেছে কৃষ্ণকে? কী বলেছে? কী অন্যায় বলেছে প্রকাশ ওই ডাক্তারকে?

শান্ত গলাতেই আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে প্রকাশ বলে ওঠে— শান্ত্ হো জাইয়ে কৃষ্ণদা। মাথা ঠাণ্ডা কিজিয়ে। ম্যায় বোলতা হুঁ।

—হ্যাঁ বল্।

—ডাগদার মুঝে দেখল। যন্তর লাগিয়ে পুছল।

— কী পুছল?

—ভুখ হ্যায়? খিদে লাগে?

—তারপর?

—জিভ দেখল।

—তারপর? খাটালে তোর কাম কী ছিল, জানতে চাইল। তখন তুমি কী বললে?

—খাটাল কি বাত ডাগদার নহি পুছা।

—ফের মিথ্যা। তুমি জল বইতে না? আমার প্রশ্ন, জল বইতে না?

—বইতাম।

—জাবনা দিতে না?

—দিতাম।

—বলনি সেকথা?

—নহি।

ক্রোধ এবার তীব্র মাত্রায় কৃষ্ণের মাথায় উসকে ওঠে। সে ঠাস করে প্রকাশের গালে চড় বসিয়ে দেয়। কৃষ্ণের গালেও জেরা করবার সময় পুলিশ চড় মেরেছিল,

BanglaBook.org

ভোর হয়ে আসে। আদিগঙ্গার বদ্ধ জলে মিশে যায় মৌ। মিশে যায় বৈশাখের মেঘমেঘ ব্যাকুল হাওয়ায়। জল বদ্ধ। গড়ায় না। তাকে যা দেওয়া যায়, তাই-ই সে ধরে রাখে। সবাই ঘাট ছেড়ে সড়কে উঠে গেছে। রোদে ঘাটের জল স্বচ্ছ হয়েছে। জলের ভিতরে চোখ চালিয়ে কৃষ্ণ দেখল, মৃত্যুর পর মৌ দু'খানি পরীর ডানা পেয়েছে। মুখে মিষ্টি হাসি, জল ভেঙে ভেঙে সাঁতার কেটে চলেছে। স্পষ্ট দেখতে পেল কৃষ্ণ। আশ্চর্য বিস্ময়মাখানো ভয়ে কৃষ্ণ দ্রুত ঘাট ছেড়ে সড়কে চলে আসে। কারও দিকে তাকায় না। তার চোখে ডানাঅলা মৌ কেবলই ভাসতে থাকে। মুখে তার অদ্ভুত মিঠে হাসি। মৌ কৃষ্ণকে ক্ষমা করে না।

অস্ত্রাগার

কৃষ্ণ পর পর কয়েকটি রাত অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখল। ভোররাতের দিকে স্বপ্নটা আসে। যেন সে একটি অস্ত্রাগারের মধ্যে ঢুকেছে। ডাঁই করে একটা কীসের উপর নানান আকৃতির বন্দুক শুইয়ে রাখা হয়েছে। স্তূপীকৃত অস্ত্রগুলি মধ্যে কোনও একটি কৃষ্ণের জন্য। কিন্তু ওই ঘরটার মাথায় কোনও ছাদ নেই। অস্ত্রগুলি যেখানে শোয়ানো, সেখানে ঝড়বাদল, রোদের হাত থেকে অস্ত্রগুলি সুরক্ষার ব্যবস্থা চমৎকার। একটা ছাউনি দেখতে পাচ্ছে কৃষ্ণ, কতকটা ছাদের মতো, ছাউনির তলে একটি কবরের পিঠ। পিঠটা চেতালো, চারপাশের কানাগুলো বেশ খাড়া হয়ে উঠেছে, যেন একটা দোলনা। দোলনার মধ্যে অস্ত্রগুলি শুইয়ে রাখা হয়েছে।

খুবই বিস্ময়কর এই একটি সমাধিভূমি। ওই ছাউনি তোলা কবর, যা বস্তুত দোলনাও বটে, তার পিঠে এইভাবে অস্ত্র রাখা হল কেন? বন্দুকগুলি গুনে দেখে কৃষ্ণ। গুনে উঠতে পারে না। সমাধির ছাউনি আছে, কিন্তু পুরো ঘরটার কোনও ছাদ নেই। দোলনা-সমাধিটা ঘরটার মধ্যিখানে রয়েছে। তার উপর দিয়ে পা ফেলে দিয়ে, অর্থাৎ ছাউনির উপর পা ফেলে গিয়ে নমাজ শুরু করবেন ইমাম। ইমামকে অনুসরণ করতে হয় নমাজের সময়। অন্যদের ওই ছাউনি মাড়ানোর দরকার নেই। এখানেই বা এল কেন কৃষ্ণ?

এটি বস্তুত একটি মসজিদ। মসজিদটার কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। দেখেই বোঝা যায়, ছাদটা গড়েই ওঠেনি। হঠাৎ করে নির্মাণ-কাজ থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। চারটি দেওয়াল মজবুত। কিন্তু কোথাও কোনও জানলা বা দরজা নেই। তাহলে ওই ঘরের মধ্যে ঢুকল কী করে কৃষ্ণ, কেনই বা ঢুকল? মসজিদের ভিতরে ওই দোলনার মতো সমাধিই বা কেন?

কে একটা প্রকাণ্ড মানুষ, যে কিনা আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার পিঠ দেখা যায়। লোকটা মসজিদের ভিতর দাঁড়িয়ে মাথা তুলেছে। সহসা মানুষটা কথা বলে ওঠে। আকাশে তার গলা গমগম করে বাজতে থাকে। কৃষ্ণ শুনতে পায়, কীসব আশ্চর্য বয়াত।

কান পেতে শুনতে শুনতে এক সময় বুঝতে পারে, কোনও একটা পিরের

BanglaBook.org

সমাধিক্ষেত্রে সে ঢুকে পড়েছে। এবং সে ঢুকেছে, একটি দেওয়ালের নীচের দিকের একটি ফোঁকর গলে।

আকাশে মাথা-তোলা মানুষটা বলল— এই মসজিদ পিরের কবরকে ঘিরে গড়ে তুলেছে একদল ফরিস্তা। এই যতটা দেখছ, সবই মাত্র একটি রাতের কাজ। কাজ করতে করতে ভোরের আলো ফুটে যায়, তাই তারা কাজ অসম্পূর্ণ রেখে আকাশে চলে গেছে। এখানে কোনও কালে নমাজ হয়নি। অর্থাৎ এই মসজিদ কখনও মর্ত্যবাসী মানুষরা ব্যবহার করেনি।

সমাধির দেহ ইমামের পদস্পর্শে পবিত্র হল না। সত্যসনাতন আলি পির এই হেথায় শুয়ে রইলেন একা, বন্দি রইলেন, তাঁর মুক্তি হল না। পাপ বহুবিধ। এক ধরনের পাপ আছে, যা মানুষ নিজে জানতে পারে না। সত্যসনাতন জানতেন না, তিনি কী পাপ করেছেন! ইমামের পায়ের ছোঁয়ায় সেই পাপের লাঘব হয়। এই মসজিদে নমাজ হলে সেই পাপ দূর হত। কিন্তু হল না। ব্যর্থ এই মসজিদ স্পর্শ করলে মুখে রক্ত উঠে মানুষ মারা পড়ে। তুমি এলে কেন কৃষ্ণ?

ছটফট করে কৃষ্ণ মসজিদের ভিতর থেকে বার হয়ে আসার চেষ্টা করে। গায়ে ধারালো ইটের খোঁচা লাগে। যেন সে গুহার ভিতর থেকে বার হয়ে আসার চেষ্টা করছে।

জামার ডান হাতটা ছিঁড়েই বুঝি গেছে। কী করে ভিতরে গলে গিয়েছিল, মনে পড়ছে না। ঢোকা তো গিয়েছিল, বেরিয়ে আসাই কঠিন। শরীরের অর্ধেকটা বার করতে পারে, ভেতরই থেকে যায় অর্ধেক। এবং এই অবস্থায় কৃষ্ণের মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে থাকে। সে কাকে যেন শাহাজি শাহাজি বলে ডাকে। ওমর শাহ্ বলে একজন কেউ ছিল?

ওমরেরা জাতে ছিল মুসলমান কলু। মনে পড়ছে। ওদের একটা তেলের ঘানিগাছ ছিল। ঠুলিবাঁধা একটি গাইগোরুতে টানত। বেশি দুধ দিতে পারত না বলে ঘানিতে জোতা হয়েছিল। তাহলে ওমররা সাহাজি। শাহটাহ কিছু না। ওরা তেল বেচত। সরষে মসিনা ভাঙাত। নগেনবাবুদের তেলকল বসার পর ওদের ঘানিগাছ বন্ধ হয়ে গেল। ঠুলিবাঁধা গোরুটার যেদিন ঠুলি খোলা হল, ভাল করে প্রকৃতির আলো দেখল গোরুটা, সেদিনই ওকে জবাই করা হল। নদীর ধারে চরছিল গরুটা, হঠাৎ মাথা ঘুরে জলে পড়ে গেলে বাঁশ লাগিয়ে ঠেলে তোলা হল এবং সাগরদিঘির লোকেরা তাকে খেয়ে ফেলল।

ওমররা মাংস খেত না। কিন্তু ওমর গোরুটার ছালে নুন মাখিয়ে সাইকেলের ক্যারিয়ারে দড়ি দিয়ে বেঁধে গঞ্জে বেচতে গেল। ছাল বিক্রির টাকায় নতুন জামা আর মুচিদের হাতে গড়া জুতো পরে পার্টির গোপন মিটিঙে উপস্থিত হল। কৃষ্ণের পাশে বসে আচমকা বলে উঠল—গোরুর একটা চোখ কানা হয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণদা। ডান চোখ, তাইতে নদীর জল দেখতে না পেয়ে হড়কে জলে পড়ে গেল। আচ্ছা, এতে কি পাপ হল আমাদের? আমরা কিন্তু বাউল, বুঝলেন। ঝানকা গাই, পারত না, গাছ টানতে গিয়ে কাঁপত। আগে অবশ্যি আমাদের একটা মাদি ঘোড়া ছিল, গাছ টানত।

BanglaBook.org

একদিন হার্ট ফেল্ করল টানতে টানতে। ব্যস! এখন তো ব্যবসাটাই উঠে গেল।

ভোররাতের দিকে স্বপ্নের তোড়জোড় লাগে। গাঢ় ঘুমে দেখা নয়, স্বপ্ন হল পাতলা ঘুমের ব্যাপার। বুকটা কেমন শুকিয়ে যায়। তেষ্টা পায় বেজায়। মুখের ভিতরে জিভটা মোটা আর খরখরে হয়ে ওঠে। স্বপ্নের মধ্যে কৃষ্ণ কীসের একটা ডাক ডাকছিল। গলা দিয়ে ডাক বার করতে শিরা ফুলিয়ে দু'হাত চোঙা করেছিল— সেই ডাকটা ছেড়ে দিতেই ঘুমটা ভেঙে গেল। ডাকটা ছোট জঙ্গলটার দিকে গেছে।

ছোট জঙ্গল। এত লম্বা ঘাস কোথায় আর দেখেছে আগে! গাব আর বহড়া, জিয়ালা। লম্বা শীর্ণ জামের গাছ। দীর্ঘ বাঁকা আধশোয়া নারকেল। তেলাকুচালতা জড়ানো বেঁটে খেজুর গাছ, একসঙ্গে জোটবাঁধা গোড়া, লম্বা আঁকশি বাঁধা হেসো দিয়ে পাতা কাটা পড়ে, গাছের তাই বাড় নেই। এই সব ক্ষতবিক্ষত গাছ দিয়ে, বাঁকা, ঝাকড়া, বেঁটে, দিঘল গাছ দিয়ে, ঘাস দিয়ে একটি অলৌকিক মসজিদ। ছাদ নেই, দরজা-জানলা নেই। কেবল একটি দেওয়ালের তলার দিকে অনেকটা সিঁদ জাতীয় ফোকর রয়েছে। বার হতে গিয়ে ওই ফোকরের বৃত্তে আটকে গিয়েছিল কৃষ্ণ। ছালওঠা জ্বালা হচ্ছে শরীরে। মুখভরা রক্ত।

আল্লাহুমা আমেন। আল্লাহুমা। আমেন, আমেন। গমগমে সহস্র কণ্ঠের রব শোনা গেল। কোথায় কারা ওইরকম প্রার্থনা করছে? তাদের কাউকে দেখা যায় না। কোনও দিনই দেখা যায় না।

চোঙা করা একটি হাম্বা ডাক ওই জঙ্গলটার দিকেই ছেড়ে দিল কৃষ্ণ। অস্ত্রাগারটার দিকে বাতাস বয়ে গেল। ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসেছে শুভেন্দু। অদ্ভুত এই স্বপ্ন দেখল কেন সে? এ তো কেবলমাত্র স্বপ্ন নয়। গোরুটার জন্য অত্যন্ত কষ্ট হল তার। এই গোরুটাকে নদীর কিনারে বাস্তবিকই দেখেছে কৃষ্ণ।

এইভাবে একটি আতঙ্কিত দুঃস্বপ্নের মধ্যে ক্রমশ ঢুকে পড়তে থাকে কৃষ্ণ। রাত্রি এলেই তার ভয় করতে শুরু করে। ঘুমকে ভয়। সে আস্তে আস্তে বোঝে স্বপ্নটার সমস্ত স্বপ্ন নয়। সে কোথাও একটা কিছু ফেলে এসেছে। অস্ত্রাগারটার আছে কোথাও। চকচক করছে বন্দুকগুলি।

ওমর শাহ্ ওরফে মাস্টার একটি খাঁটি চরিত্র। কাল্পনিক কিছু নয়। তাদের তেলের ব্যবসা উঠে গিয়েছিল। গোরুটা নদীর জলে পড়েও গিয়েছিল। মাস্টারের বাবা ঘেঁটু দফাদার কোমরে তামার সরকারি ফলকঅলা বেল্ট পরত লুঙ্গির উপর। মাস্টার ছিল কৃষ্ণদের পার্টির সোর্স। সাগরদিঘির গঞ্জ এলাকায় মাস্টারের ছিল একটি বাক্সদোকান, মাচার উপর বসানো। তিন তিনবার সেই দোকান লুট হয়েছিল। বাপের কাছ থেকে মাস্টার পুলিশের গতিবিধি জেনে নিয়ে পার্টিকে সতর্ক করে দিত। ঘেঁটুর প্রধান কাজ ছিল গ্রাম্য কাজিয়ায় নিহত মানুষের দেহ লণ্ঠন শিয়রে রেখে আগলে বসে থাকা। লাশের মাথার কাছে লণ্ঠন জ্বলছে, এখনও দেখতে পায় কৃষ্ণ।

ওমরের ভাই আবু বকর তাদের পার্টিকে সমর্থন করত। একদিন পুলিশ ওমর মনে করে বকরকে মাঠের মধ্যে গুলি করে দেয়, তারপর গ্রাম্য কাজিয়ায় নিহত বলে খবর রাষ্ট্র করে। সেই লাশও বাড়ির উঠোনে তুলে এনে ঘেঁটু লণ্ঠন শিয়রে রেখে ঘাড় গুঁজে

BanglaBook.org

আগলে রেখেছিল। দফাদার কাঁদতে পর্যন্ত পারেনি। সেই লণ্ঠনের আলো, লাশের শিয়রে, আজও দেখতে পায় কৃষ্ণ। সে তবে কোথাও কিছু একটা ফেলে এসেছে।

ইমাম হল ধর্মীয় নেতা। যিনি নমাজে নেতৃত্ব দেন, তাঁকে ইমাম বলে, সাগরদিঘির লোকেরা এই কথা বলেছিল কৃষ্ণকে। বৃহদর্থে ইমাম মানুষের জীবনধর্মের পরিচালক। সত্যসনাতন আলি পির কবরে শুয়ে কারও জন্য অপেক্ষা করছেন আজও। কৃষ্ণ এই সাগরদিঘিতেই শুনেছিল, মহাত্মা ঈশা (যিশু) এই দুনিয়ায় আবার আসবেন। পৃথিবীর কলিযুগে পাপপূর্ণ সমাজে তাঁর আবির্ভাব ঘটবে। তখন তাঁর নাম হবে ইমাম মেহেদি। সত্যসনাতন কি সেই ইমামের পদস্পর্শ পাবেন বলে কবরে শুয়ে দিন গুনছেন? ঈশা ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, বিয়েও করেননি। ইমাম মেহেদি কি এই সংসারে এসে বিয়ে করবেন?

ইমাম মেহেদি অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধও করবেন। দ্বিতীয়বার নতুন এক কারবালার যুদ্ধ সংঘটিত হবে। দোলনা-সমাধির ওই সব অস্ত্র সত্যসনাতন পির কি সেই কারণেই সাজিয়ে রেখেছেন? কারা এই সব বন্দুক সংগ্রহ করে ওইভাবে গচ্ছিত রেখেছে ওখানে? আলি পিরের শাবকরা? তার মধ্যে কোন অস্ত্রটি শ্রীকৃষ্ণ ব্যবহার করবে?

ঈশা কখনও তাঁর মুখের দাড়িতে ক্ষুর ঠেকাননি। তিনি বিয়ে করেননি। ইমাম মেহেদিও তাই। স্বর্গভূমিতে ঈশার বিবাহ হবে। ওই কাহিনীটার কিছু অংশ ভুলে গেছে কৃষ্ণ। মেহেদিও কি বিয়ে করবেন না? শুধু যুদ্ধই করবেন? ওই কাহিনীটা একবার গোড়া থেকে শুনতে ইচ্ছে করে কৃষ্ণের। কৃষ্ণ শুনেছিল, কোনও এক মরু-পর্বতে কারবালা যুদ্ধের সেনাপতি আবু হানিফা বন্দি রয়েছেন। তাঁকে পরমেশ্বর পাহাড় দিয়ে ঘিরে না ফেললে হানিফা মরুবিশ্বকে ধ্বংস করে ফেলতেন। এজিদের সৈন্যরাই শুধু নয়, সমস্ত সংসার মনুষ্যশূন্য করে ফেলতেন তিনি। এত বড় বীর মরুমর্ত্যে কখনও আসেননি। তিনি ওই পর্বতের মধ্যে এখনও অস্ত্র শান দিয়ে চলেছেন। কেয়ামত পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে প্রস্তুত। তাঁকে ওই পর্বতের ভিতর থেকে টেনে বার করবেন ইমাম মেহেদি। ইমামের সমর্থনে হানিফা যুদ্ধে যোগ দেবেন।

আবু হানিফাকে ঈশ্বর কেন ওইভাবে থামিয়ে দিলেন? কর্ণের চাকাই বা কেন পুঁতে গেল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে? কারও কারও যুদ্ধ এইভাবে থেমে যায় কেন! পৃথিবীতে প্রত্যেক যুদ্ধেরই অবশেষ থাকে নাকি? মরুপর্বতে কান পাতলে এখনও হানিফার অস্ত্রশান দেওয়ার শব্দ শোনা যায়। এখনও কারও কারও রথের চাকা মাটিতে ডেবে যায়। কাঁধে নিয়ে ঠেলে তোলবার সময় অস্ত্র এসে তাঁকে বিঁধে ফেলে। তবু সব কিছুরই অবশেষ থাকে।

কৃষ্ণের সহসা আজ মনে হল, সে কোনও একটা থেমে যাওয়া যুদ্ধের অবশেষ। তার চাকা পুঁতে যাচ্ছে, একটি গ্যাসীয় প্রাচীর তাকে ঘিরে ফেলছে। সে দেখতে পাচ্ছে, বদ্ধ প্রাচীন গঙ্গার জলে একটি শিশু জলপরী ডানা সঞ্চালনে সাঁতার কাটছে। তার আকাঙ্ক্ষা হল একবার সে সাগরদিঘি যাবে। যাবে গোয়াস বকুলতলা, সোর্স ওমরের সঙ্গে দেখা করবে।

BanglaBook.org

নিজের শোবার ঘর ছেড়ে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় শুভেন্দু। ভোর হয়েছে। হঠাৎ মনে হল, তার মুখে রক্ত লেগে রয়েছে। দ্রুতই ঘরে ঢুকে আসে। আয়নার সামনে দাঁড়ায়। আয়নায় ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করে, সত্যিই কি রক্ত লেগে রয়েছে? তারপরই খুক খুক করে কাশতে শুরু করে। কাশির সঙ্গে হঠাৎ-ই রক্ত বার হয়ে আসে। হাতের তালুতে সেই রক্ত ধরে নেয়। রক্তের দিকে চেয়ে তার চোখ দু'টি বড় বড় হয়ে ওঠে।

প্রকাশের রোগটা তাহলে তাকে ধরল। কিন্তু মাকে এ কথা বলা যাবে না। কাউকে বলা যাবে না। মনটা শুভেন্দুর অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। বাথরুমে এসে ঢোকে শুভেন্দু। জল নেয় মুখের মধ্যে। কিছুটা কাশিও হয় আবার। কাশে। রক্ত আর ওঠে না।

বাথরুম ছেড়ে সোজা প্রকাশের ঘরে আসে শুভেন্দু। প্রকাশ এখনও ঘুমিয়ে রয়েছে। তার গায়ে আলতো করে হাত দেয়। ডাকবে কি না ভাবে। প্রকাশ অল্প স্পর্শেই জেগে ওঠে।

—শোনো প্রকাশ, তুমি এখন ভাল আছ। তুমি বাড়ি যাবে?

শুভেন্দুর কথায় রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে গেল প্রকাশ। সহসাই ডুকরে কেঁদে উঠল বেচারি।

শুভেন্দু বলল— তুমি কারখানা ছেড়ে চলে যাও প্রকাশ। থেকো না। ঘরে যাও। খেতির কাজ করো। শাদি করো। অন্তত তুমি বাঁচো।

—না কৃষ্ণদা। আমাকে যেতে বোলো না। আমার রোগ আছে, বিমার আছে। ঘরের লোক মুঝে ডর করে।

—তুমি যে যেতে চেয়েছিলে।

—ম্যায় ঝুটমুট বলেছি কৃষ্ণদাদা। গাঁও যাব, খেতে পাব না। খেতে কাম করে পেট চলবে না। রুখাশুখা মিট্টি, খেতি ভাল হয় না। মেহনতের কামভি আমি পারব না। আমার একটা বহুত সুন্দর বহিন আছে। গেলেই কোলে আসে। মুখ বাড়িয়ে চুমা চায়, আমি দিই না। কিঁউকি, বহিনকো আমার রোগ লেগে যাবে কৃষ্ণদাদা।

—তোমার রোগ যদি আমাকে লাগে প্রকাশ। বলো, তখন আমি কী করে বাঁচব।

শুভেন্দুর কথায় এবার মাথাটা নিচু করে প্রকাশ। চোখ তোলে না।

দুম করে শুভেন্দু বলে ফেলে— এই ঘরে তুমি আর থাকতে পাবে না প্রকাশ। আজ থেকে কারখানাতেই থাকবে। তোমার খাবার আমি বয়ে দিয়ে আসব। তুমি কারখানার প্রহরী, পাহারাদার। ভুলে যাওনি নিশ্চয়।

হাতের উল্টো পিঠে চোখ মুছে কিঞ্চিৎ ধরা গলায় চোখ না তুলেই প্রকাশ জবাব করল— জি নহি।

—তা হলে ওঠো এখনই।

এবার প্রকাশ একটু কেমন সচকিত হয়ে উঠল।

—আপনি রাগ করেছেন কৃষ্ণদা।

BanglaBook.org

—না। কঠিন গলায় অস্বীকার করে শুভেন্দু। তারপর বলে— তোমার যেখানে জায়গা, সেখানেই তুমি থাকবে, এতে রাগের কী আছে। রাগের কথা তো নয়। তুমি তোমার বোনের কথা ভাব। আমি আমার নিজের কথা ভাবি। মৌ মরে গেছে বলে কি আমি বাঁচব না? ভোপাল দুর্ঘটনায় হাজার হাজার মানুষ মরেছে, তাই বলে কি ইউনিয়ন কার্বাইডের কর্তারা আত্মহত্যা করেছে? দ্যাখো, মৌ কেন মরেছে, আমরা জানি না। তুমি মৌয়ের কথা ভেবে মন খারাপ করলে আমি কিন্তু সহ্য করব না। চলো, ওঠো।

—ইস তরহা বলছেন কৃষ্ণদাদা!

—হ্যাঁ বলছি। তুমি ওঠো দেখি, বিছানা গুটিয়ে নাও।

—জি। বলে বিছানা ছেড়ে নেমে ওই বিছানা গুটাতে থাকে প্রকাশ যাদব। কোনও কথা না বলে নীরবে কৃষ্ণ তার কাজ চেয়ে চেয়ে দেখে। বিছানা গুটিয়ে কাঁধে নিয়ে প্রকাশ বলল—চটি আপনি ভুল পহনেছেন কৃষ্ণদা। পাল্টে নিতে হবে। আমার পাটিটা দেন। আপনারটা আমি দিচ্ছি।

ওরা দু'জনে হাওয়াই চপ্পল বদলে নেয়। কৃষ্ণ বলে— হ্যাঁ নাও। বলে পায়ে একটা ঝাড়া দেয়। যেন সে প্রকাশকে লাথিই মারতে চাইল। তারপরই তার মনে হল, এটা দুর্বোধ্য ঘৃণা, কারখানার বিষ থেকে এর জন্ম। কৃষ্ণ অসহায়ভাবে আতঙ্কিত, এই ভয় কারখানা থেকে জন্মেছে। জীবিকা মানুষকে জীবন দেয় না, জীবন কেড়ে নেয়। তবু মানুষ সেই জীবিকা ছেড়ে দেওয়ার বিকল্প জানে না। মানুষের এমন উপজীবিকার কথাও কৃষ্ণের জানা আছে, যেখানে বিষাক্ত সাপকে ঝাঁপিতে রেখে মানুষ তার পাশে ঘুমোয়। সঙ্গম করে। একদিন একটি খরিস ঝাঁপি ঠেলে বেরিয়ে সঙ্গমরত মানুষটাকে পিছন থেকে নিঃশব্দে দংশে জঙ্গলে চলে যায়। লোকটা তখন তার স্ত্রীর নগ্ন বুকের উপর পড়ে গিয়ে স্তন্যপান করার চেষ্টা করে, বোকা সাপধরা লোকটা ভাবে, এভাবেও বাঁচা যেতে পারে। এই ঘটনাটি জানে কৃষ্ণ। এবং এও জানে, ওইভাবে মানুষ বাঁচতে পারে না।

নির্মম জীবিকা। নির্মমতম জীবন। প্রকাশকে উঠোনে নামায় শুভেন্দু। বলে— আমগাছটা মরে গেল প্রকাশ। বারোমাস আম দিত। এই একটা প্রাণ ছিল বাড়িতে, কেমন নিঃশব্দে চলে গেল, যেন কার মতো

'কার মতো' শুনে প্রকাশ একবার অবাক হয়ে কৃষ্ণের মুখের দিকে চাইল। শুভেন্দুকে প্রকাশ আর বুঝতে পারছিল না। একটা মানুষ কীভাবে বদলে গেল চোখের সামনে।

—হায় রাম! বলে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রকাশ যাদব। সেই দীর্ঘশ্বাস কানে লাগে কৃষ্ণের।

শুভেন্দু বলে— তুমি একচোখ কানা কোনও গাই দেখেছ?

—জি নহি।

—আমি দেখেছি। নদীর ধারে চরতে চরতে নদীর জলে পড়ে গিয়েছিল। ওটাকে তোলা হল।

BanglaBook.org

—জি।

—আর কোনও কথা নয়। চুপচাপ কারখানায় ঢুকে যাও। গাইটা বেশি দুধ দিতে পারত না। তার খাল (ছাল) বেচে দেওয়া হল। তাই দিয়ে কেনা হল নতুন জামা।

—জি।

—মানুষ মানুষের কী কাজে লাগে প্রকাশ? মনে রাখবে, কেউ তোমার নয়। যাও। বলে দত্ত বাড়ির বারান্দায় চোখ পড়ে গেল কৃষ্ণের। ওখানে চেয়ারে মূর্তির মতো নির্বাক বসে আছে সবিতা। চোখের তলায় কালি। তাদের দেখে এবং প্রকাশকে ওইভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে দেখে তার চোখের তারা অদ্ভুতভাবে হালকা জলের মধ্যে নড়ে উঠল। যেন ঘটনাকে চোখ দুটি বুঝতে চাইছে।

সবিতার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার এক ফোঁটা সাহসও কৃষ্ণের মধ্যে অবশিষ্ট নেই। তার মেরুদণ্ড অপরাধের ভারে নুয়ে গেছে, যেমন তার ঘাড়। চোখে আতঙ্ক আর চোরা ভাব। পদক্ষেপে একটু টলে পড়া বেসামাল ভঙ্গি, দ্রুতই পালাতে চায়। পালিয়ে আসে কৃষ্ণ। বাড়িতে এসে পাজামা পাঞ্জাবি ছেড়ে প্যান্টশার্ট পরবার আগে ভোরের প্রাকৃতিক কৃত্য করে এবং মুখ ধোয়।

চুপচাপ ব্রেকফাস্ট খায়। খেতে খেতে মনে পড়ে, রোজই এই সময় একসঙ্গে প্রকাশও খেত। এখন নিশ্চয় দূরে মাঠের মধ্যে প্রাতঃকৃত্যে গেছে, রাস্তার ট্যাপে বালতি ভরে জল নিয়ে মগে করে ঢেলে চান করবে। এই বাড়িতে আর ঢুকবে না প্রকাশ। নিজের পরিবারে তার জায়গা হল না, এখানেও হল না। কারখানা তাকে অন্ন দেয়, সেই অন্নও সে সেখানে বসেই খায়। তিন চার মাস বাদে এক গোছে বেতন নেয়। সব টাকাই সে বাড়িতে দিয়ে আসে। জামাকাপড় বিশেষ কেনে না। পুরনো হয়ে যাওয়া শুভেন্দুর পরিত্যক্ত পোশাক পরে কাটিয়ে দেয় বছরের দিনগুলি।

আবার দেখা হয়ে যেতে পারে সবিতার সঙ্গে। সেই ভয়ে মাকে শুভেন্দু বলল—প্রকাশকে জলখাবার দিও মা। দু'এক দিন পরেই কারখানায় কাজ হবে। যা সব অ্যাপারেটাস ভেঙে গিয়েছিল, সবই কিনেছে সুদেব শংকর। আমাকে আর বসে থাকতে দেবে না। যাক গে। আমি এখন একবার সীতানাথের কাছে যাব।

—কেন রে!

—প্রকাশের আজ এক্স-রে রিপোর্ট পাব।

—প্রকাশের জলখাবার তুই দিয়ে যাবি না? ওকে আজই কারখানায় ঢুকালি কেন? কাজের দিন ঢোকালেই হত।

—ও ভাল আছে। তাই আজই পাঠিয়ে দিলাম। যাক, যেখানে ওর জায়গা। বলেই খুকখুক করে কেশে উঠল কৃষ্ণ। তার মুখ থেকে খাবার ছিটকে বেরিয়ে গেল।

—কী হল কৃষ্ণ! শঙ্কিত হয়ে ওঠেন মহিমা।

—কিছু নয় মা। এমনি বিষম লেগেছে, আসলে শ্বাসনালিতে খাদ্য ঢুকে গেছে।

—কেউ তোর নাম করছে খোকা!

—কে?

—কেউ। সুমি, বিদিশা, জিতু, কেউ একজন। বা উর্বী। ওর সঙ্গে তোর দেখা হয়

BanglaBook.org

না?

কৃষ্ণ সচকিত হয়ে মায়ের মুখের দিকে চাইল। খাওয়া তার শেষ হয়ে গিয়েছিল। চায়ে চুমুক দিয়ে বলল— উর্বী কি আর তেমন আত্মীয় মা! ও তো আমার ছাত্রী। ও নাম করলে আমার বিষম লাগবে কেন?

—আত্মীয় করলেই পারিস। কেন; হয় না? নিশ্চয় উর্বী তোকে মনে করে?

—করে কি না বুঝব কী করে। তাহলে এখনই গিয়ে ওকে শুধোতে হয়।

মা এবার অল্প উচ্চস্বরে মিঠে করে হেসে ওঠেন। কৃষ্ণ বেরিয়ে পড়ে পথে। মহিমা বুঝে নিলেন, উর্বীর সঙ্গে কৃষ্ণের দেখাও হয়, সম্পর্কও আছে। উর্বীর কথায় বরাবরই কৃষ্ণ খুশি হয়। কিন্তু কেন যেন সাহস করে মহিমা উর্বীর কথা তুলতে পারেন না। স্যারের ভাগ্নী, কৃষ্ণের ছাত্রী, সম্বন্ধটা কী মাত্রার বোঝা কঠিন। কৃষ্ণ খুশি হয়, কিন্তু বিষয়টা একতরফা হলে, তা হবে বড়ই কষ্টের। মহিমা তাই নিজের লোভকে সংবরণ করেই রেখেছেন। কৃষ্ণ নিজে থেকে কিছুই যে বলে না। আজ হঠাৎ মুখ ফসকে উর্বীর নামটা চলে এল। ভালই হল, ওদের দেখা হয়, এখন উর্বী আর কৃষ্ণের ছাত্রী নয়, তবু কথা হয় ওদের। ভাবতে ভাবতে মহিমা দমেই যান মনে মনে। উর্বী যে কৃষ্ণের তেমন আত্মীয়ও নয়। তাহলে? মহিমা আর ভাবতে পারলেন না। মনে হল, কারখানার লোককে উর্বী কেন ভালবাসতে যাবে? আমরাও কি প্রকাশকে ভালবাসি? এই এক অদ্ভুত চিন্তায় লিপ্ত থেকে মহিমা প্রকাশের খাবার সাজাতে থাকলেন প্লেটে।

পথে নেমে কিছুটা হেঁটে রিকশা ধরে কৃষ্ণ। সীতানাথের সামনে আজ সে কী মুখে উপস্থিত হবে? তার তো পাপ দূর হল না। পাপ আরও বাড়ল। কারখানার দূষণের মাত্রা সে জানে না। পাপের মাত্রাও জানা নেই। এ যেন সত্য পিরের পাপ। আবার তা-ও নয়, সত্য পির অজ্ঞাত পাপে বন্দি, কৃষ্ণ জ্ঞানত পাপী। সে হত্যা করে এবং বুঝতে পারে। সংসারে এই পাপ ধরা পড়ে না। রিকশায় যেতে যেতে কৃষ্ণের মনে হল, এই পাপের কথা কাউকে বলা দরকার। একটি বিষ-শৃঙ্খল কীভাবে গড়ে উঠেছে সীতানাথও জানেন না। নাকি জানেন? প্রকাশ কিছুই কবুল করল না। মনে কি হল না, প্রকাশ সবই বুঝেছে। অথচ সে কিছু বলতেই নারাজ। কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে সে চুপ করে আছে? তাহলে নিশ্চয় সে সীতানাথকে কিছুই বলেনি।

দুর্বোধ্য একটি বোধ কৃষ্ণকে জ্বালায় নিয়ত। সবিতাও কি সব বুঝেছে? কারখানা দোষী, কিন্তু কীভাবে দোষী, সে-ও জানে না। অতএব কী দাঁড়াল? কৃষ্ণই কেবল জানে। এ এমনই হিসাব, যা একা মনে মনে কৃষ্ণকেই করতে হয়। কে কতটা জানে? সামন্তই বা জানে কতখানি? জানে না। কারণ সে পুকুরের জল বোতলে ভরে, কিন্তু পরীক্ষা করে না।

শুভেন্দু কৃষ্ণকে বলল— তুমিই যে শুধু জেনেছ, তাই না? কিন্তু তুমিই যে শুধু—এ সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিত নও। তুমি চাও, তুমিই কেবল জানবে, আর কেউ নয়। রসায়ন-বিজ্ঞানের এই জ্ঞান শুধুমাত্র তোমার। এ হতে পারে না। প্রকাশ তার অভিজ্ঞতা দিয়ে সবই বুঝেছে।

কৃষ্ণ: না, বোঝেনি। সে জানে না, জুডিসিয়াস চয়েস কাকে বলে। টক্সিক লিমিট

BanglaBook.org

কী।

শুভেন্দু: তুমি গোয়েন্দার মতো সীতানাথ কতটা জানে, প্রকাশকে চাপ দিয়ে জানতে চাইলে। তাকে নির্যাতন করলে। তুমি নির্যাতন করছ আর মৌ মারা যাচ্ছে। কেন করলে? সমস্ত রাত্রি জুড়ে পাপ তোমাকে ঘিরে থাকল। গঙ্গার শ্মশান ঘাটে জলপরী মৌকে রেখে এলে তুমি। তুমি কে? কেমন মানুষ তুমি?

কৃষ্ণ: আমি জানি না। আমাকে রেহাই দাও শুভেন্দু।

শুভেন্দু: তুমি আজ কনফেস করতে চাও?

কৃষ্ণ: হ্যাঁ, নইলে আমি বাঁচব না।

শুভেন্দু: করো।

কৃষ্ণ: কিন্তু কার কাছে? আমার ঈশ্বর নেই শুভেন্দু।

শুভেন্দু: উর্বীর কাছে করো। উর্বী মানে পৃথিবী। সে তোমার পাপ গোপন রাখবে।

কৃষ্ণ: আমি তাইই করেছি। গরলভর্তি বোতলটা ওকে লুকিয়ে রাখার জন্যই দিয়েছি।

শুভেন্দু: ওই বিষ যদি প্রেমকে খেয়ে ফেলে?

কৃষ্ণ: চুপ করো শুভেন্দু। আমাকে ভয় দেখাবে না।

শুভেন্দু: তুমি আজ কোনও ব্যাপারেই নিশ্চিত নও।

কৃষ্ণ: আমি কারখানার কাজ ছেড়ে দেব।

শুভেন্দু: খাবে কী? বোনের বিয়ে দেবে না? টাকা। টাকা পাবে কোথায়?

রিকশা থামার আগেই লম্বা একটা লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে গেল কৃষ্ণ। মুখ থুবড়ে পড়েছে। যথেষ্ট চোট পেয়েছে। রিকশাঅলা ভয়ানক আশ্চর্য হয়েছে। রিকশাঅলা বেশ করে কৃষ্ণকে বকতে থাকে। পথচারীরা ঘিরে দাঁড়ায়। কৃষ্ণ ঘাড় পেতে রিকশাঅলার তিরস্কার গ্রহণ করে। মুখে তার বালি-কাঁকর-মাটি-পিচের দাগ লেগেছে। ঠোঁট ফুলে গেছে।

বিড়বিড় করে কৃষ্ণ শুভেন্দুকে বলল—এই-ই আমি শুভেন্দু। আমি আর নেই। আমি আর কোথাও নেই। সকাতরে কঁকায় কৃষ্ণ।

শুভেন্দু বলল— তা বললে হবে কেন? জীবন বুঝি খুব শস্তা পেয়েছ? বোতলের জল পরীক্ষা করাও। তারপর প্রমাণ করো, তুমিই শিশুর ঘাতক। উর্বীকে বলো সব কথা।

—আপনি মশাই পাগল। দিন ভাড়া দিয়ে যেখানে যাবেন, চলে যান। বয়েস হয়েছে, বুদ্ধি তো হয়নি। মালটাল খেয়ে মানুষ অমন করে। সুস্থ বুদ্ধির লোক কখনও ওইভাবে লাফায়? গরগর করে রিকশাঅলা বলে যায়। ভাড়া দিয়ে ডাক্তারের চেম্বারের দিকে প্রায় দৌড়তে শুরু করে কৃষ্ণ, তা দেখে রাস্তার লোকজন হা হা করে হেসে ওঠে।

হাসি যেন তাকে তাড়া করে আসে। কৃষ্ণ চেম্বারে পা রেখে হাঁপায়। সহসা বুঝতে পারে, সে পাগল হয়ে গেছে। খুবই অবাক হয়, সে তাহলে সত্যিই পাগল হয়ে গেল।

কৃষ্ণ একটি গরল-শৃঙ্খল দেখতে পেয়েছিল, এই জ্ঞান তাকে পাগল করে দিল।

BanglaBook.org

পাগল কি হইনি এখনও, শুভেন্দু! শুভেন্দু বলল, হ্যাঁ, হয়েছ, কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকি আছে তোমার।

কৃষ্ণ বলল— কাজ?

শুভেন্দু বলল— তুমি কী একটা ফেলে এসেছ। একটা অস্ত্রাগার।

কৃষ্ণ বলল— ও কিছু নয়। মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারির নবাবি অস্ত্রাগার আমি দেখেছি। ডাক্তারদা বলেছিল, আমাদেরও ওই রকম একটা অস্ত্রাগার থাকবে। পুলিশের সমস্ত বন্দুক ছিনিয়ে নিতে হবে। স্ন্যাচ দ্য গান। কেড়ে নাও এবং জমা করো।

চেম্বারে পা ফেলেই প্রায় আঁতকে ওঠে শুভেন্দু। বেঞ্চে বসে রয়েছে সুদেবসুন্দর। রোগীপত্তরের ভিড় বেশি নেই। তবে ভিড় লাগবে। ডাক্তার এসে বসলেই কোথা থেকে রোগীরা ছুটে এসে জমতে থাকে। এ অঞ্চলে হাতযশ ডাক্তার ওই একজনই— সীতানাথ। জেনারেল ফিজিশিয়ান। এখানেই ওর জন্ম, এখানেই বেড়ে ওঠা এবং প্রতিষ্ঠা। সীতানাথ কম ফি নিয়ে চিকিৎসা করেন। ওঁর মধ্যে খানিকটা সমাজসেবার মনোভাব আছে। মজলিস-মিটিংয়ে ডাক পেলেই রোগী সামলে উপস্থিত হন। প্রগতি মঞ্চের সদস্য হওয়াটা তাঁর পক্ষে সেই সেবা মনোভাবেরই স্বাভাবিক প্রকাশ।

সুদেবসুন্দর কৃষ্ণকে দেখেই উঠে দাঁড়ায় এবং খপ করে কৃষ্ণের একটা হাত চেপে ধরে চাপা গলায় বলে—ডাক্তার এখনও বসেনি। শোনো, এদিকে এসো। কথা আছে।

সুদেব কৃষ্ণকে রাস্তায় টেনে আনে। একটা বন্ধ চায়ের দোকানের মরচে ধরা টিনের চাতালের তলায় দাঁড়ায়। তারপর বলে—নাগরিক সমিতি সন্ধ্যায় মিটিং ডেকেছে। সীতানাথও নিশ্চয় যাবে। দত্তদের মেয়েটা কীভাবে মরল, প্রশ্ন তোলা হবে। তুমি এই মিটিংয়ে থেকো না। শংকরও থাকবে না। শুধু আমি থাকব। শংকরের বাবা থাকবেন। যা বলবার আমিই বলব। দ্যাখো, কীভাবে কে মরল, আমরা তার জবাবদিহি করব কেন? কারখানা কি সংসারে নেই, ওই একটাই কারখানা!

—সবিতা আমাদের সন্দেহ করে সুদেবসুন্দর।

—করে। কিন্তু সন্দেহ করলেই হল না। প্রমাণ ছাড়া সন্দেহ টেকে না। আজকাল কারখানা দেখলেই মানুষ সন্দেহ করে। তাই বলে কি কারখানা সব উঠে যাচ্ছে। কই, আমাদের কারও তো কোনও অসুখ করেনি। কেউ তো কানা হয়ে যায়নি আমরা।

—প্রকাশের রোগ হয়েছে সুদেবসুন্দর।

—হয়েছে। মানুষের হয়। হয়, সারানোও হয়। এইভাবেই কারখানা চলে। তাই দেখিয়ে বলা যায় না যে, আমরা কাউকে খুন করলাম। মিথ্যে দোষ দিয়ে কারখানা তোলা যায় না শুভেন্দু। শোনো, তুমি কী বলতে কী বলে ফেলবে, তুমি সরে থাকো। আমরাই যা বলার বলব।

—কিন্তু তাই-ই কি ঠিক হবে।

সুদেব এবার আচমকা তেতে উঠল। বলল— ঠিক কী তাহলে? তুমি থাকতে চাও? সত্য বলবার জন্য? আমাকে আর শংকরকে পথে বসানোর জন্য? দ্যাখো, প্রত্যেক কারখানাই পলিউট করে। হোয়ার দেয়ার ইজ ইন্ডাস্ট্রি দেয়ার ইজ পলিউশন।

BanglaBook.org

বাট উই কন্ট্রোল দ্য লিমিট। আমরা বলব, আমরা কোথাও মাত্রা ছাড়াইনি।

—কী করে বুঝলে? প্রমাণ কী আছে তোমার?

—মানে! তুমি বলছ প্রমাণ নেই? তুমিই বলছ একথা? তার মানে তুমিই একথা মিটিংয়ে বলবে? হাউ স্ট্রেঞ্জ!

—না না, আমি সেকথা বলছি না। বলছি।

—তাই-ই বলছ তুমি। শোনো শ্রীকৃষ্ণ, তুমি ভয়ংকর ধূর্ত, তুমি মিসচিভাস। খুদে শয়তান। কিন্তু তোমাকে টাইট দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা জানি। ঠিক আছে, অলরাইট। দেখা যাক। এই দ্যাখো, একটা টাইপকরা লিস্ট। দিজ আর আওয়ার কেমিক্যালস। কোনওটা দূষণ তালিকার মাল নয়। এটা আমরা দু'দিনে করে রেখেছি। যারা ধরবে, তারা যায় ডালে ডালে, আমরা যাই পাতায় পাতায়। তুমি আজ শুনে রাখো, আমাদের দু'নম্বরি খাতা আছে। তাতে কাজের হিসেব আছে, লেনদেন আছে। সেটাই মিটিঙে উঠবে। এবং তুলবে তুমি। তোমাকে বলতে হবে...

—না।

—কেন নয়?

—আমি ওই খাতার কথা জানি না।

—জানবে। জানতে হবে। কেন জানবে না। তুমি সামন্তর কাছে ঘুস বয়ে নিয়ে যাওনি? তুমি শালা পাপের ভাগ খাও না। কোন মুখে কমরেডি বুলি বলো, বুঝে পাই না। তোমার কীসের এত জেহাদ। সত্য বলে এই কলিতে কী উদ্ধার করবে, যুধিষ্ঠির ছাড়া কোনও মায়ের পো স্বর্গে যেতে পারেনি শ্রীকৃষ্ণ।

—আমি জানি।

—জানো যখন, তখন আর কথা বোলো না। যা বললাম, তাই-ই করবে। মিটিঙে যাবে।

—না। আমি পারব না। আমি কারখানায় আর থাকছি না সুদেবসুন্দর।

—ওহ্!

—হ্যাঁ।

—বেশ। তাহলে তোমার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শেষ?

—হ্যাঁ।

—তুমি তাহলে মিটিঙে যাচ্ছ? বলো, যাচ্ছ? ভেবে বলো। খুব চিন্তা করে বলো। এই মিটিঙে সামন্তও থাকবে। সেই ব্যবস্থাও আমরা করেছি। তাকে দিয়েও কথা বলানো হবে। সে বলবে, এখানে কোনও হ্যাজার্ডস কেমিক্যালের কাজ হয় না। মিটিঙে সব ব্যাপার চাপা পড়ে যাবে শ্রীকৃষ্ণ। তুমি ভেবে বলো, তুমি মিটিঙে যাবে?

গম্ভীর এবং খাদের গলায় শুভেন্দু বলল— না। যাব না।

—অল রাইট। এবার শোনো। সীতানাথের কাছেও এখন যাবে না। কোনও দিনই যাবে না। প্রকাশের চিকিৎসা অন্য কোথাও হবে। যাও।

কৃষ্ণ পা বাড়ায়। হঠাৎ পিছন থেকে সুদেব বলে ওঠে— শোনো কৃষ্ণ। তুমি যাবে। তোমাকে মানুষ বিশ্বাস করে। তুমিই আমাদের খাতাপত্তর দেখাবে। এই তালিকা

BanglaBook.org

তোমার হাত দিয়ে পেশ করব আমরা। যাও। একটা চান্স দিলাম তোমাকে। এই কারখানা এখনও তোমার শুভেন্দু। আমরা তোমার বন্ধু। নিজের পায়ে কেউ এমনি করে কুড়ুল মারে।

কৃষ্ণ ঘুরে দাঁড়িয়ে সুদেবের কথা সমস্ত শুনল। ম্লান করে হাসল। তারপর ঘুরে দাঁড়াল পথের দিকে। ঘাড় নিচু করল। স্টেশনের দিকে পা বাড়াল। মুখে হাত দিয়ে বুঝল, ঠোঁট ফুলে উঠেছে। একবারও সুদেব তার এই ঠোঁটের ফুলে ওঠাটা দৃষ্টি করল না। স্টেশনে এসে সিমেন্টের বেঞ্চে একপ্রান্তে অবসন্নের মতো বসে পড়ল শুভেন্দু। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি অলৌকিক অস্ত্রাগার।

তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে বসে আছে কৃষ্ণ। ডাউনের ট্রেন ধরবে। ডাউন বলতে শিয়ালদা ছেড়ে যে সব ট্রেন যাচ্ছে শহরতলি ছাড়িয়ে গ্রামের দিকে, এই লাইনে সেইগুলি ডাউন ট্রেন। অপেক্ষা করতে করতে সহসা কৃষ্ণ বুঝতে পারল, এই ভোরে সীতানাথের কাছে সুদেব অসুখের চিকিৎসার জন্য আসেনি। এসেছে, সীতানাথকে সমঝাতে অথবা ঘুস দিতে। অথবা বলতে এসেছে...ঘুস? না না। সীতানাথ ঘুসের মানুষ নয়। যাই তিনি হন না কেন, সুদেব তাঁকে কী বলবে, ভেবে উঠতে পারে না কৃষ্ণ।

রূপকথা

কৃষ্ণ যখন ট্রেনে করে সুভাষগ্রামে এসে নামল, তখন তার হাতের ঘড়িতে সাড়ে নটা বেজে এক মিনিট হয়েছে। দ্রুত সে সিধে উর্বীদের ছোট-একতলা বাড়ির দরজায় কাছে এসে কলিং বেল বাজাল। দরজা খুলল উর্বীই। খুলেই এই সাত সকালে কৃষ্ণকে দেখে কিছু আশ্চর্য হল। কৃষ্ণর মুখে অল্প খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গোঁফটাও ভারী হয়ে উঠেছে। চোখেমুখে অসুস্থতার ছাপ। ঠোঁট ফুলে উঠেছে। ভাল করে লক্ষ করে উর্বী শঙ্কিত স্বরে শুধাল— তোমার কী হয়েছে কৃষ্ণদা?

কোনও জবাব না দিয়ে সোজা উর্বীর শোবার ঘরে ঢুকে আসে কৃষ্ণ। ঘরে একখানাই চেয়ার আছে। সেটিতে বসে পড়ে। বাড়িতে উর্বী ছাড়া কেউ নেই। বাবা নিশ্চয় ওষুধের দোকানে গিয়ে বসেছেন। উর্বীর ছোট ভাই শান্তনু প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়তে গেছে। মা কোথায় বোঝা যাচ্ছে না। উর্বীদের একটা ছোট ওষুধের দোকান আছে। বাবা চালান। বাবা আগে কী একটা বড় কোম্পানির অফিসার ছিলেন। সেই কোম্পানি উঠে গেছে। বাবাও আর নতুন করে চাকরি পাননি। দোকানটাই সম্বল, উর্বী টিউশন করে ভাই আর তার পড়ার খরচ জোগায়। বেশ টানাটানির সংসার। ছোট মামা অমরেন্দ্র বসু এই পরিবারকে বছরের জামাকাপড় দিয়ে সাহায্য করেন।

কৃষ্ণ শুধাল— মা কোথায়?

উর্বী বলল— ছোট মামার ওখানে গেছে। মামা ডেকেছেন।

কৃষ্ণ প্রশ্ন করল— শান্তনু টিউটরের কাছে গেছে?

উর্বী বলল— না। মায়ের সঙ্গেই গেছে।

BanglaBook.org

কৃষ্ণ বলল— বাবা দোকানে?

উর্বী বলল— হ্যাঁ।

কৃষ্ণ বলল— তুমি তাহলে একা?

উর্বী হেসে বলল— কোথায় একা! তুমি তো এসেছ।

কৃষ্ণ বলল— এক গেলাস জল দাও তো।

উর্বী জানতে চাইল— চা খাবে?

কৃষ্ণ জবাব দিল— খাব। কিন্তু পরে। আগে জল দাও।

জলের গেলাস এনে কৃষ্ণকে দিয়ে উর্বী উদ্বেগ মেশানো গলায় বলল— তোমাকে সত্যিই কেমন দেখাচ্ছে! ঠোঁট দুটো ফোলাফোলা..... তোমার গায়ে কি জ্বর? বলে বাঁ হাতটা কৃষ্ণের কপালে রাখে উর্বী। ভেজা হাত কপাল ছুঁয়েছে বলে জ্বরো শরীর শিউরে ওঠে কৃষ্ণের। উর্বীর স্পর্শ না পেলে কৃষ্ণ তার দেহের উত্তাপ যে বেড়েছে টের পেত না হয়তো। এই মুহূর্তে আর একবার তার মনে হল, প্রকাশের একটি রোগ রয়েছে, নির্ণয় হয়নি। নিজের সমস্ত রোগ কৃষ্ণ জানে না। উর্বীর হাত কৃষ্ণকে আরাম দিচ্ছিল।

গেলাস হাতে ধরে কৃষ্ণ বলল— চলন্ত রিকশা থেকে লাফ দিয়ে পড়লাম কেন বুঝতে পারছি না। বলামাত্র মৃদু আঁতকে উঠে কৃষ্ণের কপাল থেকে নিজের হাত তুলে নেয় উর্বী।

— তুমি পড়ে গিয়েছিল! এত অন্যমনস্ক থাকো কেন? জল খেয়ে নাও, আমি অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম লাগিয়ে দেব। তুমি ডাক্তারের কাছে গেলেই পারতে।

—তাই তো যাচ্ছিলাম। হঠাৎ রিকশা না থামতেই লাফ দিয়ে ফেললাম। সীতানাথ আমাকে বলেছে, ও আমাকে দেখবে। ডাক্তারি দেখাই নয়, সত্যিকার দেখা। খাঁটি বন্ধুর মতো। কিন্তু আর তো সীতানাথের কাছে যেতে পারব না।

—কেন? উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসা উর্বীর।

কৃষ্ণ জবাব দেয় না। গেলাসটাকে মুখের উপর আলগোছে তুলে মুখের সঙ্গে বেশ খানিকটা ব্যবধান রেখে হাঁ করে গলায় জল ঢালতে চেষ্টা করে।

—অমন করে খাচ্ছ কেন? ভাল করে খাও। তোমার হাত কাঁপছে। গেলাস মুখে ঠেকিয়ে খাও। ওই তো ফেলে দিলে, পারলে না! দাও। আমিই তোমার মুখে ধরছি। বলে কৃষ্ণের চেয়ারের পিছনে দাঁড়ানো উর্বী হাত বাড়ায়। গলায় ঠিক মতো না পড়ে জল বাইরে পড়ে শুভেন্দুর বুকের জামা কিছুটা ভিজে উঠেছে। কৃষ্ণ কিন্তু গেলাসটা উর্বীকে ধরতে দেয় না। চট করে গেলাসধরা হাতটা অন্যদিকে প্রসারিত করে ঠেলে শূন্যে ধরে থাকে গেলাস।

কৃষ্ণ তারপর বলে— আমিই পারব উর্বী। আমাকে ওইভাবেই খেতে হবে।

উর্বী বলল— বুঝলাম না। কাচের গেলাস। ভাল করে ধুয়ে তোমায় জল দিয়েছি। নোংরা তো নেই।

— নেই, তা জানি। কিন্তু আমাকে ওইভাবেই খেতে হবে।

— কেন?

BanglaBook.org

কৃষ্ণ বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। গেলাসটা নিজের বুকের কাছে টেনে আনে। যেন সে গেলাসের জলের সঙ্গে কথা বলবে, সেইভাবে জলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে চেয়ে থাকে। জলের উদ্দেশে সে বলে ওঠে— এখন পর্যন্ত অন্তত দুবার তুমি 'কেন' বলেছ। কেন আমি সীতানাথের কাছে যেতে পারব না? কেন আমি গেলাসের জল আলগোছে খেতে চাই?

— সত্যিই তো, কেন?

জবাব না দিয়ে কৃষ্ণ তার দৃষ্টিকে জল থেকে তুলে সামনের টেবিলের উপর ফেলে এবং দৃষ্টি একটি খোলা খাতার কতকগুলি হস্তাক্ষরে আটকে যায়। কেমিস্ট্রির একটি বইও খোলা অবস্থায় রয়েছে। উর্বী পড়তে পড়তে উঠে গিয়ে দরজা খুলেছে। কৃষ্ণ লক্ষ করে, খাতার একেবারে গোড়ার পাতাটি খোলা। উর্বীর এটি রসায়নের কোনও একটা প্র্যাকটিক্যালের খাতা। পাতাটিতে স্পষ্ট সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা রয়েছে— ``Love men and do not be afraid of their sins; Love man in his sin."- Dostoyevsky.

কথাগুলি প্রতি নিমেষে কৃষ্ণকে প্রভূত আনন্দ দিতে লাগল। ভিতরে ভিতরে সে একটি অভূতপূর্ব উত্তেজনা অনুভব করছিল। প্রায় পাগলের মতো নাড়া খেয়ে বলে উঠল— তুমি যা লিখেছ উর্বী, তুমি তা বিশ্বাস করো? বলো আমাকে! যেন কৃষ্ণের চোখে জল এসে পড়তে চাইছিল।

আকস্মিক উত্তেজনা, আকস্মিক ভাববিহ্বলতা, উর্বীর দু'বার বলা 'কেন'র হিসেব করা, আলগোছে জল খাওয়ার গোঁ, চলন্ত রিকশা থেকে লাফ দেওয়া— সবই কেমন অদ্ভুত ঠেকছিল উর্বীর। সে মনে মনে যথেষ্ট শঙ্কিত হয়ে উঠছিল।

উর্বী বলল— তুমি আগে জল খাও, তারপর বলছি।

— হ্যাঁ, হ্যাঁ। খাচ্ছি। খাব না কেন, নিশ্চয় খাব। বলে আবার আলগোছে মুখের উপর গেলাসটা তুলে ধরে কৃষ্ণ।

— আবার ওইভাবে খাচ্ছ। আমি তোমার ছাত্রী। তোমাকে গেলাসে ধরে জল খাওয়াতেই পারি।

—ছাত্রী, তার বেশি তো নও! দ্যাখো, জল আমাকে এভাবেই খেতে হবে, আবার বলছি, তুমি চেয়ার ছেড়ে একটু সরে দাঁড়াও। নইলে জল পড়ে যাবে। তোমার ছায়া পড়ছে জলে। জলটা পরিষ্কার দেখা দরকার। কী খাচ্ছি, না বুঝে খাব? সরে দাঁড়াও!

উর্বী আহত হয়ে সামান্য পিছনে সরে আসে। ঈষৎ অভিমান বশে ঠোঁট সামান্য ফুলিয়ে সে বলল— আমার ছায়া যদি তোমার উপর পড়ে, তুমি সরে যাবে কৃষ্ণদা! প্রশ্নের একটি অভিমান-ব্যাকুল ঘনতা কণ্ঠে খেলা করে।

—ওহ্, এ সিম্পল জলের ব্যাপার উর্বী। তুমি বুঝবে না। বলে জল গলায় ঢালার চেষ্টা করে কৃষ্ণ। তার হাত থরথর করে কেঁপে ওঠে। হাতটা আবার নামিয়ে ফেলে। এবং বলে— আমি অসুস্থ উর্বী।

—জানি।

—আমি একটি পাপ গোপন করে তোমার কাছে এসেছি। তুমি বলো, তুমি ওই

BanglaBook.org

কথাগুলি বিশ্বাস করো? তুমি কোনও পাপীকে ভালবাসতে পারবে? লভ ম্যান ইন হিজ সিন। ভীত হবে না?

—কী করেছ তুমি?

—আমি ক্রমাগত তোমার কাছে গোপন করে গিয়েছি। আমার রোগ, আমার পাপ, আমার সব। আমি কারখানার মালিক নই। শ্রমিক। আমি বিদ্যা দিয়ে নিজেকে বিষাক্ত করেছি।

— তুমি সীতানাথের কাছে যাবে না কেন? তোমাকে যে দেখবে, তার কাছে যাবে না! আমার কাছে এসেছ কেন?

— আজ তোমাকে আমি হারিয়ে ফেলব জেনেই এসেছি।

— হারিয়ে ফেলবে মানে! তুমি কি আমাকে পেয়েছ যে হারিয়ে ফেলবে!

— পাইনি?

— না। ওই তো বললে, আমি তোমার ছাত্রীর বেশি নই। ফের পাওয়ার কথা তুলছ কেন?

— বলেছি?

— এই তো বললে।

কৃষ্ণ এবার চোখ কটমট করে ঘাড় অর্ধেকটা ঘুরিয়ে চেয়ারের পিছনে অল্প পাশে সরে দাঁড়ানো উর্বীকে দেখল। ওই চোখ দেখে ভয় সামান্য পেলেও উর্বী দমল না। বলল— এই তো তুমি ছাত্রীকে দৃষ্টি দিয়ে শাসাচ্ছো। আমি কিন্তু স্যার পাপীকে তার পাপের মধ্যেই ভালবাসতে পারি। খুনির সঙ্গেও প্রেম করতে পারি।

— যদি আমি খুন করি, যদি আমি নিঃসহায়কে হত্যা করি, ভালবাসবে?

— তোমার নিজের সহায় কে শ্রীকৃষ্ণ।

— আমি তোমার কাছে পালিয়ে এসেছি উর্বী।

— খুন করে?

— ধরো তাই। তারই বিচার হবে আজকে সন্ধ্যায়! কতটা গরল, কতটা পাপ।

রসায়ন বিজ্ঞানের ছাত্রী উর্বী কারখানার জলভর্তি বোতলটার কথা মনে করে। গরল এবং পাপের আনুপাতিক মাত্রা সম্বন্ধে কৃষ্ণের হিসেব, তাকে অস্পষ্ট হলেও একটা কিছু বুঝে ওঠার বুদ্ধি দেয়।

উর্বী মুখে একটা উদ্ভাস এনে বলে— আবার বলছি মাস্টার মশাই। আমি অসহায় খুনিকে নিশ্চয় ভালবাসতে পারি। স্যার তুমি অনুমতি দাও, তোমাকে আমি ভালবাসি। তুমি আমাকে রোগের ভয় দেখাও! দেখাবে না। যে পারে সে পারে। যে পারে না, সে পারে না। আমি তো ভাবছি.....

— কী ভাবছ?

— জল না খেলে আমি আর বলব না।

জলকে তবু কৃষ্ণ একই ভাবে খেতে চায়। পারে না। হাত কাঁপতে থাকে।

উর্বী হঠাৎ বলে ওঠে— আমিও গোপন করতে পারি স্যার! অর্থাৎ সে বলতে চেয়েছিল, আমি তোমার বোতলটা গোপন করেই রেখেছি। কিন্তু গোপন করা শুনেই

BanglaBook.org

কৃষ্ণের চোখ সরু হয়ে এল। থরথর করে কেঁপে উঠল শুভেন্দুর গেলাস ধরা হাত। মুখের গহ্বরে সে জল পৌঁছে দিতে পারল না। ধৈর্য হারিয়ে কৃষ্ণ তার বুকে গেলাসের প্রায় সমস্ত জল ফেলে দিল।

সহসাই কৃষ্ণ নিজের ভেজা বুকের দিকে চেয়ে হাহা করে হেসে উঠে বলল— প্রেম একটা আশ্চর্য উন্মত্ততা উর্বী; আমি তোমার স্যার বলছি। এই জলে বিষ আছে, তাই আমি কায়দা করে ফেলে দিলাম। বলে আরও উচ্চ গলায় আরও বেদম হেসে ওঠে কৃষ্ণ। তারপর গলা নামিয়ে সন্দিগ্ধ স্বরে বলে ওঠে— দ্যাখো, ওই সেই বোতলটা থেকে ঢেলে এনেছ জল। আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। কিছুতেই পারবে না।

কথাগুলি বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে থেমে পড়ে কৃষ্ণ। উচ্চে প্রক্ষিপ্ত হাসিও তাকে ক্লান্ত করেছিল। চেয়ারে ঘাড় কাত করে এলিয়ে দেয়। তার হাত থেকে গেলাসটা মেঝেয় খসে পড়ে ভেঙে যায়। চমকে উঠে কৃষ্ণ বলে— কন্ডেন্সারটা ভেঙে গেল উর্বী! মস্তিষ্কের ক্লান্ত চাপে তার চোখ মুদে আসতে চাইছে।

উর্বী হতবাক হয়ে কৃষ্ণকে একদণ্ড দেখে। তারপর কোনও কথা না বলে মেঝেয় ঝুঁকে নেমে পায়ের উপর শরীরের ভর রেখে উবু হয়ে ভাঙা কাচগুলো হাতে করে গুছিয়ে তুলতে থাকে। দ্রুত সেগুলো কোথায় ফেলে দিয়ে আসে। এসে দেখে কৃষ্ণ চোখ বুজে চেয়ারে পড়ে আছে। তার সারা মুখে জমে উঠেছে ঘামের ফোঁটা।

একটি তোয়ালে এনে সমস্ত মুখ, গলা পর্যন্ত মুছিয়ে দেয় উর্বী। ফ্যানের পয়েন্ট বাড়িয়ে দেয়। দ্রুতই সব করে। পুকুরের জল ভরা বোতলটা ফ্রিজের ভেতর থেকে এনে টেবিলের উপর রাখে। তারপর ডাক দেয়— কৃষ্ণদা। চেয়ে দ্যাখো, এই তোমার বোতল। দ্যাখো, একবার চোখ খুলে দ্যাখো, ভর্তি জল। একফোঁটা জলও এখান থেকে নড়েনি। আমি তোমার কথা মতো লুকিয়ে রেখেছিলাম কৃষ্ণদা। কেউ দেখেনি, কেউ জানে না। বাবা-মা দেখেছেন বটে, কিন্তু তাঁদের আমি পুরো ব্যাপারটা অন্যভাবে বলেছি, তাঁরাও কিছু জানেন না।

চোখ মেলে কৃষ্ণ। হঠাৎ সে যেন কোথায় চলে গিয়েছিল। আগের মুহূর্তের সমস্ত ঘটনা ভুলে গেছে। চোখ মেলে চেয়ে প্রথমে কিছুটা বিস্মিত হয়। মনে করতে পারে না, এখানে কেন সে? তারপর ধীরে ধীরে মনে পড়ে, উর্বীর কাছে সে পালিয়ে এসেছে। রাত বারোটার আগে বাড়ি ফিরবে না। কারণ সন্ধ্যায় মিটিং। মিটিঙের কথা উর্বীকে বলা ঠিক হবে কি না চিন্তা করে। তারপর বোতলটা সামনে দেখে আঁতকে ওঠে।

হঠাৎই বলে উঠল— আমি তোমার কাছে খাওয়ার জল চেয়েছি উর্বী। তুমি বোতলটা আনলে কেন? এটা তো তোমাকে সাবধানে রেখে দিতে বলেছি। যাও, এটা ঠিক করে রেখে দাও। যখন তখন যার তার সামনে বার কোরো না। জলটার ল্যাবরেটরি টেস্ট দরকার।

—ও, আচ্ছা! আমি ভাবলাম, তুমি বুঝি বোতলটা নিয়ে যেতে চাও! ঠিক আছে, আমি খাবার জলই আনছি। বলে প্রায় ছোঁ মেরে বোতলটা তুলে নেয় উর্বী। এবং চলে

BanglaBook.org

আসে রেফ্রিজারেটরের সামনে, ভাল করে পলিথিন প্যাকেটে জড়িয়ে একটি কোণে রেখে পাল্লা বন্ধ করে। সে বেশ বুঝতে পারছে, কৃষ্ণ নিজের বলা কথা এবং আচরণ মুহূর্তে ভুলে যাচ্ছে। সব কেমন অসংলগ্ন। অসম্ভব যন্ত্রণা পাচ্ছে তার স্যার। এটি নিশ্চয়ই ওই কারখানাটার কুপ্রভাব। ভাবতে ভাবতে ফ্রিজের সামনে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেলে উর্বী। বোতলটায় কারখানার জল ভরেছে কেন কৃষ্ণ? জল পরীক্ষা করাতেও চায়। ফের বোতলটা লুকিয়ে রাখতেও বলে। তার অনেক ধরনের অসুখ হয়েছে। সে কাউকে হত্যা করেছে। এটা কি তার কোনও কল্পনা? জলকে সন্দেহ করছে কৃষ্ণ।

জলের উপর এই ঘোর সন্দেহ সভ্যতার নতুন অসুখ। রাসায়নিক বিষ মানুষের ভাবাবেগের উপর হস্তক্ষেপ করে। শরীরকে খেয়েই নিস্তার দেয় না, প্যাশনকেও ঘিরে ধরে; মানুষের সংবেদনশীলতার মধ্যে ঢুকে গিয়ে সৎ আবেগকে তছনছ করে দেয়। ভয়ংকর সেই সংকটকে বইতে হয় মানুষকেই। কৃষ্ণ তার কাছে এসেছে কোনও এক অব্যক্ত তৃষ্ণা নিয়ে, অথচ জল খেতে পারছে না। জলকে সন্দেহ করছে। হায় বিজ্ঞান-দেবতা এ তুমি কী করে কৃষ্ণকে পাঠালে আমার কাছে! চাপা কান্না ঠোঁটে চেপে দমন করবার চেষ্টা করে উর্বী। মনকে শক্ত না করলে কৃষ্ণকে রক্ষা করা যাবে না। চোখের জল মুছে ফেলে উর্বী। সে নতুন একটি গেলাস বার করে একবার কৃষ্ণকে দেখানোর ছলে কৃষ্ণের সম্মুখ দিয়ে ঘুরে আসে। উঠোনের দিকে দরজা খুলে দেয়। টিউব-ওয়েলের জল পড়ার শব্দ শোনায় কৃষ্ণকে। জল পড়ার দৃশ্য দেখানোর জন্য ডাক দেয়। বলে— কী সুন্দর জল পড়ছে, এসে দেখে যাও কৃষ্ণদা।

ঘাড় ঘুরিয়ে বসে বসেই দেখে কৃষ্ণ। বলে— জলের আবার কী দেখব উর্বী। তুমি দিচ্ছ, আমি খেয়ে নেব। মরলে মরব। কতই তো মরছে।

উর্বী রেগে উঠে বলল— তাহলে খেও না। বলে গেলাসের সব জল ফেলে দেয় কৃষ্ণের চোখেরই উপর। ইচ্ছে করেই ঘটনাটা ঘটায়। কৃষ্ণ এবার কলের কাছে ছুটে আসে।

উর্বী বলে— তুমি মানুষকে বিশ্বাস করো না? তাহলে এসেছ কেন আমার কাছে! বোতলের জল লুকিয়ে রাখতে দিয়েছ কেন? তুমি চলে যাও।

—আমি আজকের দিনটা, রাত বারোটা পর্যন্ত তোমার সঙ্গে থাকব। আমি লুকিয়ে থাকব। সন্ধ্যায় মিটিং হচ্ছে। লোকে কারখানাটা বন্ধ করে দিতে চাইছে। কারখানার পাশের বাড়ির একটি বাচ্চা মেয়ে চারদিন হল মারা গেছে। কারখানার দোষে মরেছে বলে ধরা হচ্ছে।

জলের গেলাস ভরে কলের ওখান থেকে ছোট ধাপের তিনটি সিঁড়ি ভেঙে ঘরের মেঝেয় চৌকাঠ পেরিয়ে এসে দাঁড়ায় উর্বী। দাঁড়ায় চৌকাঠের কাছে এসে দাঁড়াল কৃষ্ণের কাছে। গেলাসটা বাড়িয়ে ধরে বলে— নাও, খাও তো। এখন আর কিছুই ভাবতে হবে না।

— ভাবব না।

— না।

— মিটিঙে যাব না?

BanglaBook.org

— না।

— তুমি বুঝতে পারছ সব?

— কী?

— না গেলে কথা হবে।

— হতে দাও। এখনও জল খেলে না!

— ও, হ্যাঁ। বলে সব ভুলে কৃষ্ণ গেলাসের কানায় চুমুক দিয়ে সব জল এক নিঃশ্বাসে শুষে নেয়।

— আর খাবে?

— হ্যাঁ, দাও।

পরপর তিন গেলাস জল নিঃশেষ করে কৃষ্ণ এবার চেয়ারে নয়, উর্বীর বিছানায় দেহটাকে ফেলে দেয়। গেলাসটা টেবিলে রেখে দেয়।

— তুমি শুয়ে থাকো। আমি চা করি। বালিশটা ঠিক করে টেনে নাও। শোনো, একসঙ্গে হাজারটা চিন্তা করবে না। তুমি শ্রমিক, তাই তো। মালিক নও। শ্রমিকরা কী করে?

— কী করে?

— নিজের বিদ্যাকে দুষে না। হাজার সমস্যাকে একসঙ্গে অ্যালাউ করে না। একটার পর একটা। আগেরটা আগে, পরেরটা পরে চিন্তা করে। তাঁরা মানুষকে বিশ্বাস করে শ্রীকৃষ্ণ। তুমিই একদিন বলেছ। শ্রমিকরাই সবচেয়ে দৃঢ় মানুষ।

— আমি কারখানার চারআনির মালিক। আমার সমস্যা অনেক। আমি জানি, আমি কী করেছি।

রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়েছিল উর্বী, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বাঁকা চোখে বিছানায় শোয়া তার স্যারকে এক সেকেন্ড দেখল, তারপর বলল—তুমি তাহলে মিটিঙে যেতে চাইছ।

— হ্যাঁ।

'হ্যাঁ' শুনে একমুহূর্ত দেরি না করে নিজেকে যেন একটা ধাক্কায় রান্নাঘরের ভিতরে ঠেলে দিল উর্বী। চায়ের জল চাপাল। জল কেবলই উষ্ণ হয়ে উঠেছে, এমন সময় ফট করে একটা কাচের মতো কী ফেটে পড়ার শব্দ শোনা গেল। কী ভাঙল! বলে দ্রুত সে রান্নাঘর ছেড়ে বাইরে আসে। নিজের ঘরে ঝুঁকে দেখে টেবিলে গেলাসটা নেই, তার মাস্টার মশাই মাথার চুল দু'হাতে খামচে ধরে বিছানায় বসে ঘাড় গুঁজে রয়েছে। কলতলার দিকে উর্বী চেয়ে দেখে, টিউবওয়েলের লোহার ডাঁটিতে আছড়ে পড়ে গেলাসটা চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। কাচগুলো নানা আকারে এখান ওখান ছিটকে পড়েছে, কলের গোড়ায় পাতা ইটে কিছু টুকরো পড়ে আছে। চৌকাঠের গোড়ায় এসে ঘটনাটা বুঝে নিয়ে কাউকে কোনও মন্তব্য না করে আবার সে চায়ের ফুটন্ত জলের কাছে আসে।

দুধছাড়া চা করেছে উর্বী। কৃষ্ণ যা ভালবাসে। প্লেটে চায়ের চিনেমাটির কাপ বসিয়েছিল, গা-লাগা দু'খানি গোল বড় বিস্কুট। পা বাড়িয়ে থেমে প্লেট উচ্চ শানের

BanglaBook.org

উপর রাখল। গ্যাস নেবাল। তারপর একটি স্টেনলেসস্টিলের প্লেট এবং কাপ ধুয়ে চা সেই নিষ্কলঙ্ক ইস্পাত পেয়ালায় ঢালল। তার এখন স্যারের কাছে যেতে ভয় করছিল। আবার সব কিছু ছুঁড়ে দেবে না তো!

ধীরে ধীরে সভয়ে খানিকটা দূরত্ব রেখে উর্বী দাঁড়াল কৃষ্ণের সামনে। মুখ তার কিছু শুকিয়ে উঠেছে। স্বল্পস্ফুট স্বরে বলল—চা খাবে না?

দু'হাতে আঁকড়ে ধরা চুল ছেড়ে দিয়ে কৃষ্ণ মুখ তুলল, চোখে বন্য হিংসা ধকধক করছে, সঙ্গে আভাসিত করুণ অশ্রু, মুখের চামড়ার কাঠিন্যে অসহায়তা। ভয় পেয়ে পিছনে কিছুটা সরে আসে উর্বী। সহসা নরম হয়ে গেল কৃষ্ণ। হাত বাড়িয়ে বলল—কই দাও।

ইতস্তত করেও সামান্য এগোল উর্বী, বলল—তুমি ছুঁড়ে ফেলবে না? এমন করলে আমি পারব না স্যার। আমরা গরিব। মা জানতে চাইবে, কী করে গেলাস দুটো ভাঙল। আমি কী বলব!

এই কথা শোনামাত্র চরম অপরাধবোধে কৃষ্ণের মুখটা কালো হয়ে উঠল। বলে উঠল—আমার যক্ষ্মা উর্বী। আমার অনেক অসুখ আছে। আমার এঁটো কোথাও থাকা উচিত না। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি এখনই চলে যাব। আমি কী করব কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। সীতানাথের কাছেও যেতে পারছি না। সুদেব মানা করেছে।

চা টেবিলের উপর রাখল উর্বী। কোনও কথা না বলে চুপচাপ কলতলায় চলে এল। কাচগুলো তুলে ফেলার জন্য পা বাড়াতেই কাঁচ ওর পায়ের তলা চিরে দিল। 'আহ' করে আচমকা বিদ্ধ হওয়ার শব্দ বার হল মুখ দিয়ে। পা তুলে বেঁধা কাচের টুকরো ফেলে দিতেই গলগলিয়ে রক্ত বার হয়ে আসতে লাগল। সে পা তুলে তুলে লেংচে নিজের ঘরে ঢোকে। তাক থেকে তুলো আর মারকিউরোক্রোমের শিশিটা নেয়। সরু ব্যান্ডেজের কাপড় দিয়ে ক্ষতস্থান ওষুধ ভেজানো তুলোয় বেঁধে নেবে। চায়ে দু'বার চুমুক দিয়েছিল কৃষ্ণ, একখানা মাত্র বিস্কুট খেয়েছিল। টেবিলে কাপপ্লেট রেখে দিয়ে বিছানা ছেড়ে দ্রুত নেমে মেঝেয় বসে পড়া উর্বীর পায়ে হাত দেয়।

উর্বী সঙ্গে সঙ্গে না না করে ওঠে এবং বলে—তুমি প্লিজ চা খাও, আমি একাই পারব। ছেড়ে দাও, তুমি স্যার, ছাত্রীর পায়ে ওভাবে হাত দিও না। কত অপরাধ হচ্ছে আমার! প্লিজ।

কৃষ্ণ শুনল না। তুলো, লাল-ওষুধের মারকিউরোক্রোমের শিশি, ব্যান্ডেজের সরু ফিতে, সব কেড়ে নিল। হাঁটু মেঝেয় পেতে উর্বীর পা-কে প্রায় কোলের কাছে নিয়ে, লাল-ওষুধ ভেজা তুলো ক্ষতস্থানে চেপে ধরল। ব্যান্ডেজ বাঁধল। উর্বীর পায়ের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে দাঁত দিয়ে ব্যান্ডেজের ফিতে ছিঁড়ে দিল। তারপর বেঁধে ফেলে মুখ তুলে বলল—আমার রক্তের দোষ থেকে তোমাকে আমি বাঁচাতে পারব না উর্বী। আমি জানি না, আমি কী করছি!

উর্বী তার স্যারের একটি কথাও আর শুনতে পাচ্ছিল না। কৃষ্ণ যেই তার পা দু'হাতে ধরেছে, সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা মেশানো একটি আশ্চর্য কামনা তার শরীরময় ছড়িয়ে পড়েছে। পা বেয়ে বেয়ে উঠে আসছে বিস্ময়কর যন্ত্রণাময় ভাললাগার

BanglaBook.org

অনুভূতি। লাল-ওষুধে শীতল হয়ে আসে, ভাললাগার সেই অনুভূতি আরও বেড়ে ওঠে। উর্বীর দু'চোখ মুদে আসতে চায়।

উর্বীর বন্ধ দু'চোখের দিকে চেয়ে কৃষ্ণ ছাত্রীর সৌন্দর্যে আবিষ্ট হয়ে ওঠে। উর্বীর পায়ের পাতায় কৃষ্ণের একটি চুম্বন এঁকে দিতে ইচ্ছে হয়েছিল। যক্ষ্মা রোগীর কখনও কারও মুখচুম্বন করা উচিত না। মুখমণ্ডল থেকে দৃষ্টি বুক ছুঁয়ে পায়ের পাতায় এসে পড়ে। চোখের পাতা মদির আবেশে ঢুলে এলেও, পাতা দু'টি স্বল্প ফাঁক করে উর্বী কৃষ্ণকে দেখছিল। কৃষ্ণ তার কোলে উর্বীর বিক্ষত ব্যান্ডেজ বাঁধা পাখানিকে দেখছে, একটি হাত এখনও ব্যান্ডেজের উপর স্পর্শ করে রয়েছে। পায়ের গোছ চোখে পড়ছে, কাপড় কিছুটা সরে গেছে। মৃদু আলোকময় রোমগুলি কুসুমের মতো সুন্দর। হাতটা সেদিকে সরে যায়। স্পর্শমাত্র উর্বীর গলায় শিহরন খেলে ওঠে, সমস্ত দেহ বেজে ওঠে। মুখে রক্তোচ্ছ্বাস হয়, নিঃশ্বাস ঘন হয়ে ওঠে। আর লোভ সামলাতে পারে না কৃষ্ণ। খুব আলতো করে ঠোঁট দিয়ে চুম্বন দিয়ে বসে।

উর্বী এবার তার আবেগকে শাসনে এনে পা টেনে নেয়। দ্রুত বলে ওঠে—এমন কেন করছ স্যার! ওভাবে ছুঁলে কেন আমাকে! না, ও রকম করবে না কখনও! একী, তোমার চোখে জল!

— হ্যাঁ, উর্বী। যক্ষ্মার রোগী এভাবেই চুমু খায়। মানুষের পায়ে। তুমি কিছু মনে করলে না তো!

— হ্যাঁ, করেছি। বলে উঠে দাঁড়ায় উর্বী। তার স্যারকে বড্ড অদ্ভুত লাগে। স্যারের প্রেমের মধ্যে বরাবরই আশ্চর্য স্নেহ 'উছল' হয়ে ওঠে। ভালবাসাকে স্নেহের পুর দিয়ে ঢাকতে চায়। স্যার যদি পাখি হত, তাহলে উর্বী বলত, অসুখ-কীটদষ্ট বুকে তীব্র কামনা, ডানায় বলিষ্ঠ স্নেহ। স্যার চল্লিশ, সে বাইশ। বয়সই কি স্যারকে অমন ধীর সংযত করেছে, নাকি তার অসুখ।

'হ্যাঁ, করেছি' বলে উঠে দাঁড়ানো উর্বী স্যারের পায়ে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে বলে—এইটুকু তোমার প্রাপ্য মাস্টারমশাই। চাইলে সারাজীবন এই প্রণাম তুমি পাবে।

— এ তো ভক্তি।

— না, শুধু ভক্তি কেন হবে। এটি একটি পুরনো ধরনের ভালবাসা। আগেকার বউরা, স্বামীদের এই রকম করত। তোমার ভাল লাগে না। বলেই কাচে কাটা পাখানা মেঝেয় ভাল করে পাততে গিয়ে কাতরে ওঠে উর্বী। একটু টলে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ তাকে ধরে ফেলে এবং নিজের দিকে আকর্ষণ করে, উর্বী অবলীলায় স্যারের বুকের মধ্যে চলে যায়।

উর্বীকে এভাবে বুকের মধ্যে এই প্রথম পেয়েছে কৃষ্ণ। ভাবতে আশ্চর্য লাগছে, সেই খুদে মেয়েটা কীভাবে আজ তারই বুকের মধ্যে এসে পৌঁছাল। পুরনো কোনও ভালবাসার মতো হয়ে এসেছে বলে উর্বী আত্মমুগ্ধ। যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে কামনার পরিপূর্ণ জন্ম হল আজ। একটি অকালবৃদ্ধ মরুর জিবের তলায় এসে জড়িয়ে গেল একটি উচ্ছলিত পূর্ণ যৌবনা নদী। দ্যাখো শুভেন্দু, আমার মাথায় সাদা চুলে একদিন

BanglaBook.org

নিশ্চয় কালো রং ধরবে। মরুভূমির বুকে একটি নদী কী করে বাঁচে মরুপ্রকৃতিই তা বলতে পারে।

শুভেন্দু হঠাৎ বলে উঠল— এভাবে তুমি তোমার অন্তঃপ্রকৃতির তারিফ করছ কৃষ্ণ! মৌকে মেরে ফেলার পরও তুমি এভাবে তোমার হৃদয়ের প্রশংসা করো? একটু আগেও তুমি উর্বীর দেওয়া গেলাসের জলকে সন্দেহ করেছ। করনি?

কৃষ্ণ কেন করলাম?

শুভেন্দু : এ যুগে সন্দেহই মানুষের মুখ্য ধর্ম। প্রেমকে অপমান না করলে মানুষ সুখ পায় না। উর্বী কাতরাচ্ছে, সেই যন্ত্রণা তোমার ভাল লাগছে। প্রেম নয়, উর্বী তোমার কাছে খাদ্য মাত্র। কারখানার মতোই তুমি ওকে গিলতে চাও। দিতে চাও তোমার রোগ এবং দূষণ। তুমি উর্বীকে জড়িয়ে ধরে বুঝতে চাইছ, তোমার আসলে সেক্স-অ্যাবিলিটি আছে কি না!

কৃষ্ণ : আমার মূত্রদ্বারে জ্বালা করে শুভেন্দু। ক্যাডমিয়াম জ্বালা ধরায়, প্রস্রাবের সঙ্গে প্রোটিন বার করে দেয়। চুলের রং পালটে দেয়, সাদা-হলদেটে হয়ে যায় চুল। আমি কী করব? দ্যাখো, আমার হয়তো ব্রঙ্কের অসুখ। এ কিছু না।

শুভেন্দু : নিজেকে এ-ভাবে প্রবোধ দেবে না কৃষ্ণ। উইদিন ইন্ডাস্ট্রিজ, কেমিক্যাল ফ্যাকট্রি ইজ দ্য মেন কালপ্রিট। তোমার হয়তো অ্যাসবেস্টোসিসও হয়েছে। হাঁফের টান ধরে না? কারখানাটা কী আসলে! মাথায় অ্যাসবেস্টসের চাল। গনগনে গরম, নরককুণ্ড।

কৃষ্ণ : আমাকে এই ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গন থেকে বিচ্ছিন্ন কোরো না শুভেন্দু, প্লিজ।

শুভেন্দু : তুমি উর্বীর ভিতর কণিকা খেয়ে শেষ করে ফেলতে চাও।

কৃষ্ণ : হ্যাঁ চাই।

শুভেন্দু : অ্যাসবেস্টস ইনভাইটস ক্যানসার। মনে রাখবে।

ইয়েস। আই নো এভরিথিং। কিন্তু ফুরোবার আগে, তুমি জেনে রাখো, এই ক্ষুদ্র সুন্দর নদীটিকে একা আমি পান করে যাব। আজ একে আমি ছাড়ব না। বলেই কৃষ্ণ তার বুকের মধ্যে পড়ে থাকা উর্বীর মাথাটাকে দু' হাতে শক্ত করে ধরে ফেলে আচমকা। উর্বীর ঠোঁট তখন সামান্য স্ফুরিত হয়ে ওঠে। নরম সেই ঠোঁটে নিজের ঠোঁট ডুবিয়ে দেয় কৃষ্ণ। উর্বীকে শুষে নেবার চেষ্টা করে। উর্বীর চোখ কামনা আর বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। সে তার স্যারের জামার পিঠ জড়িয়ে খামচে ধরেছে দু'হাতে।

আচমকাই ঠোঁটে তুলে নিয়ে অদম্য আবেগে সশব্দে ডুকরে ওঠে কৃষ্ণ। তার বুক বেয়ে গ্যাসের মতো কিছু বিষিয়ে বিষিয়ে উঠতে থাকে। চোখ ফেটে জল এসে পড়ে। সম্পূর্ণ পাগলের মতো দেখায় কৃষ্ণকে। সে উর্বীকে সামান্য ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বিছানায় বসে পড়ে। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলে এবং তার কান্নাকে চাপতে চায়। উর্বী অত্যন্ত বিমূঢ় হয়ে গেছে। স্যারের কাছে এগোতেও তার সাহস হচ্ছে না।

— আমি জেল থেকে প্রচণ্ড একটি জৈব তৃষ্ণা আর খিদে নিয়ে বেরিয়েছিলাম শুভেন্দু। দ্যাখো, এই-ই তার আসল চেহারা। এই মানুষ কখনও বিপ্লব করে না।

BanglaBook.org

— তবু তুমি একটি অস্ত্রগারের স্বপ্ন দ্যাখো। কেন দ্যাখো?

— কেন দেখি?

— স্যার। বলে উর্বী সাহস করে স্যারের কাঁধে স্পর্শ করে, সরে আসে কাছে, তারপর বলে ওঠে—শোনো, তুমি যা করলে, ঠিক করেছ, এতে কোনও পাপ হয়নি। আমার কিছু হবে না, দেখে নিও।

— উর্বী।

— হ্যাঁ, কৃষ্ণ। বলে কৃষ্ণের কোলে মাথা রেখে ধীরে ধীরে চেয়ারে বসে পড়ল উর্বী। চোখ বন্ধ করে ফেলল পরম নিশ্চিন্তে।

চোখ বন্ধ রেখেই উর্বী বলে উঠল—সেই ঘটনাটা জান নিশ্চয়।

— কোন্ ঘটনা?

— কোথায় পড়েছি, মনে নেই। পরে মনে পড়বে। তবে ঘটনাটা নিশ্চয় অদ্ভুত।

—কী সেটা?

— আমি বলি কী, এটাই পৃথিবীর শেষ রূপকথা। একদল বিজ্ঞানীর গবেষণার জন্য দরকার হয়েছিল নির্মল বৃষ্টির জল। কিন্তু কোথায় সে জিনিস পাওয়া যাবে।

— কোথায়?

— তাঁরা কোথাও তা না পেয়ে, অনুসন্ধান করেছিলেন গ্রিনল্যান্ডের বরফের গভীর তলদেশে। সেখানে তাঁরা পেয়ে গিয়েছিলেন পঞ্চাশ বছরের পুরনো জমাটবাঁধা শুদ্ধ জল। আজ বিজ্ঞানীরা সাধারণ বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করতে পারেন না। তাঁরা প্রাকৃতিক বৃষ্টির জলকেও সন্দেহ করেন। বলে কোলের উপর মাথা কাত করে রেখে উর্বী তার স্যারের মুখের দিকে চোখ তোলে।

— আমি তোমাকে বিষাক্ত করেছি উর্বী। হাহাকার করে ওঠে কৃষ্ণের কণ্ঠ।

উর্বী বলে ওঠে—তোমার কোনও দোষ নেই শ্রীকৃষ্ণ। বলে পুরো উপুড় হয়ে স্যারের কোলে মুখ গুঁজে দেয় সে। খুবই অবাক হয়ে কৃষ্ণ উর্বীর পিঠের উপর চেয়ে থাকে। তার কাঁধের উপরভাগের চুলের রিংগুলো লক্ষ করে। উর্বীর হাতফাঁসে বাঁধা খোঁপা শিথিল হয়ে সামান্য খুলেছে, তবে পিঠে খসে ছড়িয়ে পড়েনি। এই রিংগুলো সরু লতার মতো কুণ্ঠিত হয়ে কিছু একটাকে জড়াতে চায়। কোনও আঙুল? নিজের একটি তর্জনী লক্ষ করে কৃষ্ণ।

—এই গবেষণার কাজটাকে তুমি পৃথিবীর শেষ রূপকথা বলছ বুঝলে?

— নয়? সব রূপকথাতেই নায়ক একটা কিছু খোঁজে। খুব দুর্লভ কিছু। পায়ও শেষ পর্যন্ত। তবে অনেক কষ্ট করতে হয়। আমার আজকাল খুব দোষ হয়েছে, মাথার মধ্যে। কী সব ভাবতে ভাললাগে। ওই গল্পটা, না, ঘটনাটা মনে করে একটা আশ্চর্য ভাব মাথায় এসে জমে।

— কী?

— পৃথিবী তার নির্মল জলকে, যদি বলো শুদ্ধতা, তাহলে তাকে, খুব গভীরে গোপন করে রেখে দেয়। সে জানে, একদিন এই পদার্থটার খোঁজ করবে মানুষ। আমি কিছু ভুল বলছি না তো।

BanglaBook.org

— না না। তা কেন বলবে।

— তাহলে বিশ্বাস করছ তো! বলে ঘাড় তুলে স্যারকে একবার দৃষ্টি কাত করে দেখে নেয় উর্বী। তারপর ঘাড় তুলে রেখেই বলে—পৃথিবী মানুষের সমস্ত আঘাত সইবার জন্য বুক পেতে রেখেছে। হাইড্রোজেন বোমার আঘাত গর্ভে লুকিয়ে রাখে, আবার সেই নির্মল জলকেও ফেলে দেয় না, গোপন করে রাখে। আমি এই পৃথিবীকে ভীষণ ভালবাসি শ্রীকৃষ্ণ! কেননা আমিও গোপন করতে পারি। সেই যে তখন বললাম তুমি বুঝতেই পারনি।

— তোমার কাছে আছে উর্বী?

— কী?

— সেই পবিত্র জল?

— আছে বইকী। তুমি খুঁজলেই পাবে। আমি তোমার ব্যাধি আর ভালবাসা, দুই-ই এই বুক দিয়ে সহ্য করব শ্রীকৃষ্ণ। বলো, তুমি এই জীবনকে ভয় পাবে না?

কৃষ্ণ এবার চুপ করে রইল। মনে মনে ভাবল, তাহলে কি সত্যিই আজ বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর পুরনো নির্মল জল খুঁজছেন আর মানুষ খুঁজছে কোনও পুরনো গোপন ভালবাসা? কিন্তু পৃথিবী কি জানে, একটি পাপাত্মা শকুনবৎ খুঁজে ফিরছে একটি সামুদ্রিক কচ্ছপের ডিম? হায় বোকা মেয়ে, তুমি জানই না আমি আদিগঙ্গার বদ্ধ জলে বন্দি করেছি একটি শিশু জলপরীকে, প্রকাশকে দিয়েছি পুনাম-বাসের অধিকার।

কী মনে করে সহসা স্যারকে ছেড়ে, চেয়ার ছেড়ে একটি তাকের কাছে উঠে আসে উর্বী। কী একটা হাতড়ায়। অ্যান্টিসেপটিক ক্রিমের একটি প্রায় ফুরিয়ে যাওয়া টিউব হাতে করে লেংচে বিছানায় এসে বসে। আঙুল দিয়ে টিপে একটুখানি ক্রিম বার করে নেয়। তারপর বলে—এসো, সরে এসো। আমাকে তখন অমন করলে, তোমার লাগেনি। বলে খুব আস্তে করে কৃষ্ণের অল্প ফুলে থাকা ঠোঁটে ক্রিম লাগিয়ে ঘষে দেয়, যেন সে একটি শিশুর মুখে ভীষণ মমতায় এই পদার্থটি মাখিয়ে মিশিয়ে দিচ্ছে। কৃষ্ণের মনে এখনও লালার চুম্বন-নিষিক্ত উষ্ণতা লেগে রয়েছে, মনে পড়ে, তার ফোলা ঠোঁটে কী আরাম দিয়েছে, যেন একটি শুশ্রূষা হয়েছে তখন। সেই বিহ্বল মুহূর্তেও উর্বীর সজ্ঞান জিহ্বা, সতর্ক অধর কৃষ্ণকে সেবা দিতেই চেয়েছিল, কামনাঘন অনুভূতির মধ্যেও গ্রহণের ব্যাকুল তৃষ্ণা উর্বীকে ভুলতে দেয়নি, কৃষ্ণের ঠোঁটে আঘাত রয়েছে। নিজে বিক্ষত হয়েও উর্বী এমনটি করতে পারল!

কৃষ্ণ অনুভব করছিল, উর্বীর স্নেহসংযত গভীর আঙুল। সে উর্বীর মমতা-উন্মুখ চোখ দু'টির দিকে অপরাধে আর কৃতজ্ঞতায় চেয়ে থাকতে না পেরে চোখ মুদে ফেলল। সে স্পষ্ট বুঝেছিল, তার ঠোঁটের ব্যাথাটুকু উর্বী তার অধর এবং জিহ্বা দিয়ে শুষে নিয়েছে। গভীর মমতা উর্বীকে গ্রহণের জন্য স্ফুরিত অধর আর জিহ্বা দিয়ে স্বল্প লেহনের বুদ্ধি দিয়েছিল তখন, কামনার বিহ্বলতা ছিল, কিন্তু তা মমতাকে, মায়াকে ছাপিয়ে যেতে দেয়নি।

অথচ উর্বীকে কৃষ্ণ কাচ বিঁধিয়ে বিক্ষত করেছে। উর্বী তখন তার পায়ের ব্যথা

BanglaBook.org

ভুলে গেল কী করে? কৃষ্ণ বারংবার ভাববার চেষ্টা করে, কী করে পারল উর্বী! যে পারে সে পারে, যে পারে না সে পারে না। এটাই কি এই ঘটনার জবাব? চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত কৃষ্ণ একটি অনাঘ্রাত পুরুষ। কোনও নারী কখনও তার আঘ্রাণ নেয়নি। সেই সুযোগ তার জীবনে ঘটেনি। কিন্তু যখন ঘটল, তাও হয়ে উঠল এমনই যে, নারীস্পর্শে একটি অব্যক্ত মহাবিস্ময় রচিত করে তুলল। সমস্ত জীবন এই একটি চুম্বনের কাছেই সমর্পণ করা যায়, সারাটি জীবন এই স্মৃতি থেকে যায় রক্তে। নারীর অধর ধরে রাখে একটি পুরুষের সমস্ত ব্যথিত, নিরাশ্রয়, যন্ত্রণামথিত হৃদয়কে, প্রেমই শেষ পর্যন্ত মানুষের যন্ত্রণাকে এমনই কৌশলে স্পর্শ করতে পারে। প্রেম কী, কৃষ্ণ তা কখনওই বুঝিয়ে উঠতে পারবে না, কারণ চুম্বনের এই স্বাদ একটি অব্যক্ত অভিজ্ঞতা হয়ে থেকে যাবে। প্রেম একটি আশ্চর্য পদার্থ, যার যৌগ ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রেম একটি অন্ধ চুম্বন, জিহ্বা এবং অধরের অনাস্বাদিত ব্যবহার, যা চোখে দেখা যায় না। প্রেম শুধু মমতা-উন্মুখ দেহ, যাকে কাচ বিদ্ধ করেছে। উর্বীই প্রেম, আর কিছু নয়। প্রেম অন্যের যন্ত্রণাকে শুষে নিতে নিতে নিজেকে ব্যথিত করে তোলে।

কৃষ্ণ এক গভীর কৃতজ্ঞতায় উর্বীর সেবাপ্রলিপ্ত হাতকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে। তারপর বলে—থাক উর্বী। একটি জন্মে এর বেশি পেতে নেই। আজ এভাবে এসে তোমার ইউনিভারসিটির ক্লাশ মাটি করলাম। তুমি রান্না করবে না? বাবা দুপুরে খেতে আসবেন নিশ্চয়?

— না। আমি এখনই টিফিন কেরিয়ারে করে বাবাকে খাবার দিয়ে আসব। তুমি আসার দশ মিনিট আগে রান্না শেষ করেছি। বাবা দোকানে বসেই খায়। পর্দা ফেলে। ভেতরে একটা ছোট ঘর আছে। ইউনিভারসিটি যাওয়ার পথে বাবাকে খাবার পৌঁছে দিই, আমার ডেলি রুটিন। আজও তাই-ই করব, তবে ইউনিভারসিটি যাব না। বাবা ফের খিদে সহ্য করতে পারে না। বিক্রির লোভে সারা দিন দোকান খুলে রাখে। ছোট দোকান তো। বন্ধ করে খেতে আসতে চায় না। বলে বাবা সম্পর্কিত কথা শেষ করে উর্বী। তারপর রান্নাঘরে ঢুকে কেরিয়ারে করে বাবার জন্য খাবার সাজিয়ে নেয়। কেরিয়ারটিকে নিজের ঘরে টেবিলে রেখে বলে—তুমি চান করে নাও। বাথরুমে তোয়ালে, সাবান, তেল সব আছে। দোকান থেকে ফিরে তোমাকে খেতে দেব।

— কিন্তু আমার জন্য তো রান্না করনি।

— সে কী করেছি তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি খেয়ে নিলে পর, যদি দেখি, আর কিছুই নেই, আমি তখন নিজের জন্য ফুটিয়ে নেব। ঠিক আছে, তোমাকে খেতে দিয়ে আমি ফের রান্না চড়াব। ভেব না তো। বলে উর্বী পায়ে খুব সাবধানে হাওয়াই স্যান্ডেল গলিয়ে বাইরে সামান্য খোঁড়াতে খোঁড়াতে বার হয়ে গেল।

রাত দশটা নাগাদ কৃষ্ণকে উর্বী স্টেশনে পৌঁছে দেবার জন্য বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে আসে। স্টেশনে ওরা অপেক্ষা করছিল। আপ ট্রেন ধরবে কৃষ্ণ। তার আগেই একটি ডাউন ট্রেন এসে লাগল স্টেশনে। রাত হয়েছিল বলে ট্রেন থেকে এই স্টেশনে নামল খুব অল্পই মানুষ। রাত বাড়লে যাত্রী সংখ্যা কমেই। আপের গাড়ি ধরবার

BanglaBook.org

লোকও তাই নিতান্তই কম। স্টেশন ফাঁকা, দু' চারজন ছড়ানো ছেটানো মানুষ, চায়ের দোকানেও দু'তিন জন। একটি দু'টি কুকুর আলাভোলা মেজাজে স্টেশনের বাতাস শুঁকে ফিরছে।

দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে যারা নেমেছে এবং লাইন পেরিয়ে এদিকে এসে গ্রামে ঢুকবে তাদের মধ্যেই মা এবং শান্তনুকে দেখতে পায় উর্বী। শান্তনুও দিদিকে দেখেছে মনে হচ্ছে। একবার হাত তুলল। হেসে উঠে দিদিকে হাত নাড়িয়ে তাদের পৌঁছে যাওয়ার আনন্দ জ্ঞাপন আরও একবার স্পষ্টভাবে করে লাফিয়ে লাইন পার হয়। দৌড়ে চলে আসে দিদির কাছে। মা ওদিকে দাঁড়িয়ে রইলেন গেটের কাছে। তাঁর পায়ের কাছে একটি ভারী ব্যাগ নামিয়ে দিয়ে শান্তনু ছুটে এসেছে। ব্যাগে অমরেন্দ্র বসুর দেওয়া নতুন কাপড়চোপড় রয়েছে। শান্তনু সেই কারণেই হয়তো উল্লসিত। দিদিকে কী একটা আনন্দ-সংবাদ বলতে গিয়ে কৃষ্ণকে দেখে চেপে গেল। চোখে একটা লাজুক ভাব ফুটিয়ে তুলে মিষ্টি করে হাসল। এই হাসিটা কৃষ্ণকে দেখলেই বরাবর হাসে শান্তনু। লজ্জায় খুব একটা কিছু বলে উঠতে পারে না, বলবার কিছু পায়ও না তেমন। ওই হাসির মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে কৃষ্ণ আর তার দিদির প্রতি গোপন সমর্থন। কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে থেকে মা বুঝিয়ে দিলেন, তিনি কৃষ্ণের প্রতি তত আগ্রহী নন, এত রাতে তাকে দেখে বিশেষ সন্তুষ্টও হতে পারেননি।

হাসির বিনিময়টুকু সেরেই শান্তনু তার জামার বুক-পকেট থেকে একটি সাদা ধবধবে কাগজে লেখা চিঠি বার করে দিদির দিকে এগিয়ে ধরে বলল—ছোট মামা তোকে লিখেছে। বলেছে খুব জরুরি। তোকে দেখা করতে বলেছে।

— তুই পড়েছিস?

— না। তোর চিঠি আমি পড়তে যাব কেন। মামা দিয়েছে, ডাইরেক্ট পকেটে রেখে দিয়েছি। আমি খুলিইনি। বাব্বাঃ, মামার চিঠি আমরা পড়তে যাব। বলতে বলতে দিদির হাতে চিঠিটা তুলে দিয়ে ক্লাস নাইনের ছাত্রটি কৃষ্ণকে বলল—আসছি, বলে আবার হেসে মাথা নোয়াল। তারপর পিছনে সরে ঘুরে দ্রুত হেঁটে চলে গেল গেটের দিকে।

মামার প্যাডে লেখা চিঠি। খুলেই উর্বী পড়তে শুরু করে কৃষ্ণের পাশ থেকে খানিকটা সরে চলে যায়। চলে যায় আরও খানিকটা, যেন সে আলোর তলায় যেতে চাইছে। কৃষ্ণ একটুও না নড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

ছোট মামা লিখেছেন :

উর্বী মামণি,

তোমাকে আমার দরকার। শুভেন্দু সম্পর্কে তোমাকে কিছু কথা বলবার আছে। ওর কারখানা সম্বন্ধে বেশ মারাত্মক অভিযোগ এসেছে আমার কাছে। আজকে সন্ধ্যায় স্থানীয় নাগরিক সমিতি একটি মিটিং ডেকেছে, আমাকে উপস্থিত থাকার জন্য দু'জন লোক নিজেরা আমার বাড়ি এসে অনুরোধ করে গেছে। অন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকায় ওই মিটিঙে যাব না। না গেলেও, নাগরিক সমিতির বক্তব্য আমাকে শুনতে হবে। ওই কারখানার জল পরীক্ষা করে একটি রিপোর্ট তৈরি করে দেবার জন্য ওই

BanglaBook.org

দু'জন সমিতি-সদস্য আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করল। আমি তাদের বলেছি, ওরা আমার কাছে কারখানার আশেপাশের বাসিন্দাদের সইযুক্ত একটি আবেদনপত্র নিয়ে এলে, জল পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই অবস্থায় একটি কাজের ভার তোমার উপর দিতে চাই। তুমি নিজে গিয়ে এক বোতল পুকুরের জল সংগ্রহ করে আনবে। মানুষের আবেদনে সাড়া দেওয়া কর্তব্য। কারখানার কেউ যদি, তোমাকে জল নিতে বাধা দেয়, তুমি শুভেন্দুকে বোলো যে, এই জল আমিই সংগ্রহ করতে বলেছি। তাকে আরও বলে দিও, সে তার স্যারকে দেওয়া কথার খেলাপ না করে থাকলে, তার ভয় নেই। আমি কারও জীবিকার শত্রু নই, তবে দূষণ মাত্রা ছাড়ালে আমি নিশ্চয় তার প্রতিরোধ করব। জল তুমি অবশ্যই আনবে, এই কারখানা আমার পরামর্শে গড়ে উঠেছে, এর থেকে কোনও খারাপ ঘটনা ঘটলে তার দায় আমার ঘাড়ে এসেও পড়তে পারে। এমতাবস্থায় আমি যথেষ্ট শঙ্কিত এবং উদ্বিগ্ন রয়েছি। সমস্ত ঘটনা কৃষ্ণেরই আমাকে জানানো উচিত ছিল। সে অনেক কাল দেখা করে না। হয়তো আর দেখা করবে না। অতএব তুমি, যা বললাম করবে। শিগগির করে করবে। ইতি আশীর্বাদক ছোটমামা।

পুনশ্চ দিয়ে মামা লিখেছেন—

জলের স্যাম্পলিং সম্পর্কে তোমাকে আশা করি খুব বেশি খতিয়ে বলতে হবে না। তবু অধ্যাপকসুলভ সতর্কতা থেকে সামান্য কিছু নির্দেশ দিচ্ছি। তোমাদের ওষুধের দোকান থেকে হাজার এম. এল. জল ধরে এমন দু'টো বোতল সংগ্রহ করবে। বোতল দুটিকে নাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে ভাল করে ঝাঁকিয়ে ধুয়ে নেবে। তারপর ডিআইওনাইজ্‌ড্‌ ডিসটিল্ড ওয়াটার দিয়ে বার কতক ধোবে। অতঃপর পুকুরের জল দিয়ে তিনবার ধুয়ে নিতে হবে। ধোয়ার কাজ এই পর্যন্ত।

দু'টি বোতলের একটি হাতে রাখো। এই বোতলে পাঁচ এম. এল নাইট্রিক অ্যাসিড ঢুকিয়ে বোতলের ভেতরের গায়ে মাখিয়ে পদার্থটাকে বোতলের তলায় ফেলে রেখে দাও। এবার দ্বিতীয় বোতলটাকে ছিপি এঁটে পুকুরের জলের যতটা সম্ভব গভীরে নামিয়ে ছিপি খুলে জল ভরে নাও। আমি চাইছি বৈশাখ মাসের পুকুরের তলানি জলের সারস্টনস অর্থাৎ তলার গাঢ় জল। কেন তা বুঝবে আশা করি।

দ্বিতীয় বোতলে ধরে নেওয়া জল পাঁচ এম. এল নাইট্রিক অ্যাসিড ভরে রাখা প্রথম বোতলে সাবধানে ঢেলে নিয়ে ছিপি বন্ধ করো। বোতলটাকে বাড়ি এনে রেফ্রিজারেটরে চালান করে রেখে দেবে। It is essential to protect sample. পরের দিন এই জল আমার কাছে পৌঁছে দাও যদি, অতি উত্তম হয় জানবে।

তোমার ব্যস্ততা নিশ্চয় আছে। তাই বলি, ফ্রিজে রাখা বোতলের জল অতি অবশ্য সাত দিনের মধ্যে পাওয়া চাই, নইলে ওই জলে কাজ হবে না। তোমাকে শিক্ষকের নির্দেশই দিলাম।

আমার কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে তোমাকে নতুন করে বলার নেই, তুমি তোমার ছোটমামাকে নিশ্চয়ই বোঝো। মানুষ দল বেঁধে এসে আমাকে বলুক না বলুক, কারখানার বিষয় আমাকে অবগত হতে হবে। একটি প্রাথমিক পরীক্ষা এখনই আমি

BanglaBook.org

করে রাখতে চাই। এক্ষেত্রে তোমাকেই আমি নির্ভরযোগ্য মনে করি। অতএব তুমি দেরি কোরো না।

এই অংশটা দু'বার পড়ল উর্বী।

একটি অন্ধ বিচারসভা

সুভাষগ্রাম স্টেশন থেকে আপের গাড়ি ধরে কৃষ্ণ যখন সোনারপুর এসে পৌঁছাল তখন রাত হয়েছে। ট্রেন থেকে নেমে অটোরিকশা করে আরও কুড়ি মিনিট আসতে হল। তারপর রিকশা স্ট্যান্ডে এসে কৃষ্ণ রিকশা পেল না। রিকশার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতেও তার ভাল লাগল না। সে হাঁটতে শুরু করল। আজ সীতানাথের চেম্বারের দিকে গেলই না, অন্য পথ ধরে হেঁটে আসতে লাগল।

কৃষ্ণের নিজেকে কেমন চোর চোর মনে হচ্ছিল। ঘড়িতে এগারোটা বেজে গিয়েছে। মোড়ের চায়ের দোকানটায় কারা সব গুঞ্জন করে কথা বলে চলেছে। ঘাড় নিচু করে হেঁটে আসছিল কৃষ্ণ। তার বারংবার উর্বীর মুখটা মনে পড়ছিল। হাতে ধরা ছোটমামার চিঠি। চোখেমুখে ফুটে ওঠা কেমন একটি জটিল উদ্বেগ, মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিল সমস্ত মুখটা। কী ছিল চিঠিতে? জানতে চাইল কৃষ্ণ, ততক্ষণে ট্রেন এসে লেগেছে প্ল্যাটফর্মে। ট্রেনে চড়ে বসে জানলার কাছে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো উর্বীকে পেলেও, প্রশ্নের উত্তর পেল না কৃষ্ণ। ট্রেন ছেড়ে দিল। এক মিনিটও পুরোটা, ট্রেন সিগন্যাল পেলে ছোট এই স্টেশনে দাঁড়ায় না। উর্বী জবাব ঠিক দিল না শুধু বলল— পরে বলব তোমাকে। মামা দেখা করতে বলেছেন। তুমি যাও। আচ্ছা, বোতলের জল কবে নিয়েছ?

কৃষ্ণের মনে অজানা একটা ভয় ওই চিঠিকে ঘিরে বুনে উঠতে চাইছিল। তার সম্বন্ধে কোনও কথা ওই চিঠিতে নেই তো। কী থাকবে? সে তো কতকাল স্যারের সঙ্গে দেখাই করে না। কেন করে না, স্যার কি আজ তা টের পেয়ে গেছেন। বোতলে জল নেওয়ার কথা ওইভাবে জানতে চাইল কেন উর্বী? সেই বা কেন সহজে বলে দিল, পাঁচদিন আগে ভরা হয়েছে! তাহলে কি ওই জল তার স্যার চাইছেন? ভেবেই তীব্র বিষণ্ণতায় ভরে উঠল মন।

কৃষ্ণের স্যার বিখ্যাত মানুষ, যশস্বী অধ্যাপক, স্থানীয় লোক তাঁকে একজন বৈজ্ঞানিকের সম্মান দেয়। মানুষের মৃত বিবেককে খোঁচা দিয়ে স্যার জাগিয়ে তোলেন। রিটায়ার করার পরও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে স্যারের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। সম্মানিত অধ্যাপক হিসাবে এখনও ক্লাশে যান। পয়সা নেন না। বিদ্যা তাঁর কাছে দাতব্য, তিনি সব সময় বিবেক পরিষ্কার রাখেন। ডাবসন কারখানাটি শব্দদূষণের কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেই কাজটি একাই লড়ে করেছেন অমরেন্দ্র বসু। তাঁর এই হিতকর্মের কাহিনী একটি ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত হতেও দেখা গেছে।

এই মানুষের সামনে আজ আর মাথা তুলে দাঁড়ানোর সাহস রাখে না কৃষ্ণ। সবিতা দত্ত যদি অধ্যাপক বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকে, তাহলে কৃষ্ণের জীবিকা

BanglaBook.org

পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে। এই বুদ্ধি কি কেউ তাদের জুগিয়ে দেবে না? নাগরিক সমিতি কি চুপ করে বসে আছে?

আসলে নাগরিক সমিতি ক্ষমতাসীন দলেরই নিয়ন্ত্রিত কমিটি। তার সদস্যদের মধ্যে অবশ্য অন্য ধরনের দু'একজন রয়েছে। ঘুরে বাবুদের লোকও রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে, ক্ষমতাসীন দলে থেকেও সুযোগ-বঞ্চিত বিক্ষুব্ধ দল-সমর্থক, দলকে মানে না তারা। এবং রয়েছে অন্য ধরনের মানুষ, যারা সরাসরি কোনও দলের নয়, কিন্তু দলের বিরুদ্ধে কড়া করে কথা বলতেও চায় না, তবে অবস্থা বিশেষে কঠিন হতে পারে। এদের সংখ্যা কতটা কৃষ্ণ জানে না। অথচ বাঁচতে হলে কৃষ্ণের এই সবই জানা উচিত। জানা উচিত, ঠিক এই ধরনেরই একজন মানুষ ডা. সীতানাথ মণ্ডল। অবশ্য তাঁকে তাঁর পেশাকে বাঁচিয়ে ছক মেনে চলতে হয়, ক্ষমতাসীন দলকে চটালে তাঁর ডাক্তারি ব্যবসার ক্ষতি হবে। আবার খানিকটা সাচ্চা ইমেজও বজায় থাকা চাই। নইলে সরকার-বিরোধী মানুষ তাঁর চেম্বারে ভিড় করে আসতে চাইবে না। সমাজের প্রতিষ্ঠিত মানুষরা সুচতুরভাবে মধ্যপন্থায় চলে, তাদের সৎ উপকারী ভাবমূর্তি নষ্ট যে কেন হয় না, তা কৃষ্ণ বুঝে দেখতে চাইবে না কেন?

সীতানাথ মৌয়ের সুচিকিৎসা চান, আবার কৃষ্ণকেও দেখবেন বলে আশ্বাস দেন। মৌ মরে গেল, এখন মুখে রক্ত তোলার পরও কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর চেম্বারে যেতে পারছে না। সীতানাথের দোষ কোথায়? আজকের মিটিঙে সীতানাথ গিয়েছিলেন? কী হল সেখানে, কী বললেন তিনি? কৃষ্ণের জানা উচিত।

কৃষ্ণ মোড়ের চায়ের দোকানের সামনে এসে চোখ তুলেই থমকে দাঁড়াল। তাকে দেখে এগিয়ে এল শংকরপ্রসাদ। খপ করে কৃষ্ণের হাত চেপে ধরে বলল— চলো। তোমাকে এগিয়ে দিই বাড়ি পর্যন্ত।

—কী হয়েছে?

—কী আবার হবে! চলো, বলছি।

—দোকানে এতক্ষণ কী করছিলে? কারা সব বসে যেন!

—আমাদেরই লোক। তুমি সবাইকে চিনবেও না, চলো। বলে প্রসাদ কৃষ্ণের হাত ধরে টান দিল।

প্রসাদ কৃষ্ণকে পাশে করে প্রথমে কিছুক্ষণ দ্রুত হেঁটে আসে, তারপর পথ নির্জন দেখে পায়ের গতিবেগ শিথিল করে দেয়।

কৃষ্ণ প্রশ্ন করে— মিটিঙে লোক কেমন হয়েছিল? তুমি ছিলে?

শংকরপ্রসাদ এবার তার গলা খুলে বলে উঠল— আমরা কেউ মিটিঙে ছিলাম না শুভেন্দু। তুমি যেমন ছিলে না, আমরাও যাইনি। প্রথমে কথা হয়েছিল, সুদেব আর বাবা মিটিঙে থাকবে, তুমি আমি থাকব না। ঠিক আছে?

—সীতানাথ ছিল?

—হ্যাঁ।

—কী বলল?

—কী বলবে? কাকে বলবে? কে শুনবে? লোক হয়েছিল গুনাগুনতি সাতজন।

BanglaBook.org

না, ন'জন। তার মধ্যে ফরিয়াদী দু'জন। সবিতা আর সবিতার শ্বশুর। সবিতার স্বামীটাও আসেনি। ট্রেন বন্ধ ছিল দু'ঘণ্টা। এসে যখন পৌঁছল, তখন মিটিং ভেঙে গেছে। কে ব্যাটা প্রকাশকে কারখানা থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, জানতে হবে। তবে যা শুনলাম, প্রকাশ শুধু একবার 'হাম্বা' করা ছাড়া, কিছুই গুছিয়ে বলে উঠতে পারেনি। বলে প্রসাদ হা হা করে হেসে উঠল।

কৃষ্ণ সহসা গম্ভীর গলায় বলে উঠল— মিটিঙে লোক হল না কেন?

প্রসাদ হঠাৎই কেন যেন রেগে উঠে বলল— কেন হল না, তুমিই বলো।

চুপ করে রইল কৃষ্ণ। প্রসাদের চোখ তাকে যেন রাঙিয়ে উঠতে চাইছে। মুহূর্তেই তার মন থেকে প্রসাদের প্রতি সমস্ত আগ্রহ ফুরিয়ে গেল, প্রসাদের কথা আর শুনতে চাইছিল না কৃষ্ণ।

কৃষ্ণের নিরাসক্ত এবং চাপা অসহিষ্ণু চোখের দিকে চেয়ে প্রসাদ আক্রমণাত্মক সুরে বলে উঠল— তুমি কৃষ্ণ কিছু মনে কোরো না, রাজনীতি না করেই জেল খেটেছ বলে গর্ব করো, কিন্তু পলিটিক্সের কিস্যু বোঝো না। বাবা যে মিটিঙে অ্যাটেন্ড করে না, সেই মিটিঙে লোক হয় কী করে! বাবা অসুস্থ সেজে বিছানায় শুয়ে রইল, মিটিং হবে এমনি সময়, ঠিক আটটা নাগাদ, সুদেব সীতানাথকে চেম্বারে গিয়ে বলে এল, কমিশনার একেবারে শুয়ে পড়েছে, এখনই একবার চলুন। তার আগে সকালে সুদেব সীতানাথকে আমাদের প্রোডাক্টের তালিকা দেখিয়ে বলে এসেছে, এই আমাদের কারখানার মাল, দেখুন। দত্তদের মেয়ে মরেছে, আমরা তার কী করব।

—ঘুরে বাবুরা এল না?

—না।

—কেন?

—তুমি সামন্তকে ঘুস দিলে কি মাগনা? সামন্তই ঘুরেদের সামলেছে, বলেছে, ও মিটিঙে কিছু হবে না। সামন্ত তিনদিন হল ছুটিতে, তার আগেই ঘুরেদের ডেকে কথা বলে গেছে। রইল বাকি দু'একজন বাবুটাবু গোছের, তাদের কী?

—বাবাকে সীতানাথ দেখলেন গিয়ে?

—হ্যাঁ। স্কুলের মাঠে মিটিং। লোক নেই। সীতানাথ বাবাকে দেখতে এল। বাবা সীতানাথকে আধঘণ্টার ওপর আটকে দিল। নরম সুরে একটা একটা কথা। বেকার ছেলেরা কারখানা চালায় ইত্যাদি। সীতানাথ বাবার সামনে অনেকটাই দমে গেল। বাবা শেষে শুধাল, তুমি কি তাহলে মিটিঙে যাচ্ছ সীতানাথ? ডাক্তার আমতা আমতা করে বলল, দেখি! ব্যস, হয়ে গেল। তবে আমরা নিশ্চয় বুঝেছি, সীতানাথের অন্য রকম ইচ্ছে ছিল।

—কী রকম?

—তোমাকে মিটিঙে পেলে সীতানাথ জেরা করত। ডাক্তার জানে, কার কাছ থেকে খোঁচালে কথা বেরিয়ে পড়বে। আর হ্যাঁ, শোনো। যেটা আসল কথা, বিপদ কিন্তু নতুন করে হতে পারে শুভেন্দু। শুনছি, কারা দু'জন প্রফেসর ডাবসনের কাছে গিয়েছিল, এই মিটিঙে থাকার জন্য বলেও এসেছিল, ও এলে কী হত বলা যায় না।

BanglaBook.org

খুবই কাঠিবাজ লোক, প্রফেসর আর ডাক্তার, এই দু'জনকে সামলানোর দায়িত্ব অ্যাকচুয়্যালি তোমার। বাঁচার জন্য কিছু মিথ্যা কথা বলতে হয় শ্রীকৃষ্ণ। যদি না পার, তাহলে সরে থাকো। সংসারের হিতবাদী লোকগুলোকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

—স্যার না থাকলে এই কারখানা হত না প্রসাদ। তাঁর সঙ্গে আমার কিছু কমিটমেন্ট ছিল। আমি কথা রাখিনি। স্যার সম্বন্ধে ব্যঙ্গ করাটা ঠিক হচ্ছে না। খুব খারাপ লাগছে, আজ আমাকে লুকিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। তোমাদের বিচার কখনও হবে না, কিন্তু আমার বিচার শুরু হয়ে গেছে। মাথার মধ্যে কারখানাটা আরও বড় হয়ে যাচ্ছে। কারণ আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না। আমি না বললে কেউ কখনও জানতেও পারবে না।

—তুমি কী জান, যা আমরা জানি না? আমাকে বলতে হবে শুভেন্দু। তুমি পার্টনার, তোমাকে সব কথা বলতে হবে।

—তোমাদের দু'নম্বরি খাতার কথা বলেছ আমাকে? বলনি। লাভের একটা গোপন অংশ তুমি আর সুদেব ভোগ করো। আমাকে জানতেও দাও না। অর্ডার নাও কীভাবে, জানতে পারি না। কী করছি জানি, কতটা আসছে জানি না। অতএব আমি...

—অতএব তুমিও যা জান না, আমাদের তা বলবে না। তোমাকে আমরা ঠকিয়েছি বলে এখন তুমি কারখানাই তুলে দেবে। তুমি সুদেব বা আমাকে বলবে না, কিন্তু প্রফেসর ডাবসনকে সব বলবে। বাঃ। চমৎকার!

প্রফেসর অমরেন্দ্র বসুকে দ্বিতীয়বার ডাবসন বলায় চরম অপমান বোধ করে কৃষ্ণ। বলে ওঠে— সাবধান শংকরপ্রসাদ। স্যারের নামে যা তা বলবে না। আমি আজকাল সহজেই উত্তেজিত হই। তোমার মুখ আমি ভেঙে দেব।

কৃষ্ণের এই আচম্বিত আক্রমণের জন্য তৈরি ছিল না প্রসাদ। মুহূর্তে তার মাথা গরম হয়ে গেল, এতদিনের ভদ্রশান্ত মূর্তিটা তার ভেঙে পড়ে গেল। চেহারায় ফুটে উঠল বুনো হিংসা, কৃষ্ণকে একটুও সহ্য হল না তার, মুখের ভাষা একেবারেই আলগা হয়ে গেল— তাই নাকি রে শালা। বড্ডই চোপা হয়েছে তোমার! নকশালি নকশা মারাচ্ছ হামবাগ। তোমার মুরোদ জানা আছে। চড় মেরে তোমাকে সিধে করা উচিত। যাঃ। চলে যা। তবে এমন করলে খেতে পাবি না বলে দিলাম। পথে বসে যাবি। হারামের টাকা তোমার ঘরে ঢোকে না। আজ বাবাকে আমাদের জন্য রোগী পর্যন্ত সাজতে হল, খেয়াল করলে না। তোর বিদ্যে দিয়েই কারখানা টিকে নেই, শালা! মারব থাবড়া মুখের উপর। বলে প্রসাদ চড় দেখায় কৃষ্ণকে।

কৃষ্ণ অসহায় নরম সুরে গলা খাদে করে বলল— মারবে! মারো না। বলে চোখ পিটপিট করে এবং বুঝতে পারে, আজ তার সমস্ত মর্যাদা পথে লুটিয়ে শেষ হয়ে গেল।

শংকরপ্রসাদ হঠাৎ নরম হয়ে বলল— তোমাকে মারা না মারা সমান কথা। আছেই বা কী তোমার! চরিত্র। তা যদি থাকত, ভেবেছিলাম আছে। এখন দেখছি, তুমি তলে তলে অন্য মানুষ।

—মানে।

BanglaBook.org

—আমাদের সামনে আর ক্যারেকটার ফলাবে না শ্রীকৃষ্ণ। খবর্দার গুমোর দেখাবে না। তোমাকে শুধোচ্ছি, ট্রেনে আসতে আসতে ভিড়ের মধ্যে মঞ্জুর সঙ্গে কী ব্যবহার করেছ, ও এসে আমাদের সামনে কেঁদে পড়ল সেদিন! কী করেছ তুমি?

—আমি কী করেছি! মঞ্জু কে? কী বলছ তুমি শংকরপ্রসাদ!

—উ বাব্বাঃ! এ যে আকাশ থেকে পড়ে দেখি। মঞ্জু কে জান না! মিষ্টি সুন্দর শিক্ষিত বউটাকে দ্যাখনি কখনও? প্রত্যেক রোববারে জিতুকে যখন মিশন হস্টেলে দেখা করতে যাও, মঞ্জুর সঙ্গে দেখা হয় না? ওর বাচ্চাও তো হস্টেলে থেকে পড়ে! কী হে? কাদের ভরসায় এই সব মেয়েরা পথেঘাটে চলাফেরা করবে! রক্ষক ভক্ষক হয়ে যাচ্ছে! ছিঃ! এই তোমার জেলখাটা! ছিঃ শুভেন্দু! মঞ্জুর কথা শুনতে শুনতে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছিল। সুদেব তখন শুনতে শুনতে পথ না পেয়ে বলল, কী বলল জান?

—মঞ্জুকে আমি চিনতে পেরেছি শংকরপ্রসাদ। সামন্তকে যেদিন ঘুষ দিলাম, প্রথমে মিশনে, পরে ঢাকুরিয়ায় ওই বউটার সঙ্গে দেখা হয়েছে। ট্রেনেও একসঙ্গে ফিরেছি।

—জানি। মিথ্যা মঞ্জু বলেনি। সুদেব বলল, অ্যাট ফার্স্ট উই পলিউট আওয়ারসেলভ্স দেন ইউ পলিউট দ্য ইন্ডাস্ট্রি। তুমি চরিত্র না হারালে সরকারের ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে স্পেশাল সলভেন্ট বানিয়ে বেচতে নাকি! এখন যেখানে পৌঁছেছ, তাতে করে, যা জানো, তা আর বলতে পারবে না। কারও সামনে কোনও তেজ দেখাবে না শুভেন্দু। বাড়ি যাও, চুপ করে থাকো।

ভয়ংকর বিস্ময়ের চাপে কৃষ্ণ বোবা হয়ে গিয়েছিল। মঞ্জুর সুন্দর নিষ্পাপ মুখটা মনে পড়ছিল। চাপা চুড়ির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল শুভেন্দু। সামন্তর বন্ধ বাথরুমের দরজা মনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিল। ট্রেনে মঞ্জু তার বুকের কাছে দাঁড়িয়ে, ভেজা বস্ত্রের পলিথিন প্যাকেট কৃষ্ণকে ছুঁয়েছে, জলভর্তি বোতলটাও মঞ্জুর গায়ে লাগছে। ট্রেন থেকে নেমে টিকিট না কাটার অপরাধে বউটা পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিল টিকিট কালেকটারকে। শুভেন্দুর কারখানার টাকা, ঘুষের টাকা এবং অতঃপর দেহদানে কামানো সেই একই টাকা। ঝকঝকে টাকা। 'আপনার ইন্ডাস্ট্রি কেমন চলছে কৃষ্ণবাবু? ভাল?'

কৃষ্ণ এখন প্রসাদের সামনে দাঁড়িয়ে জবাব দিল— হ্যাঁ।

আসলে শুভেন্দু এই 'হ্যাঁ' বলেছে স্মৃতি-ঘেঁষে দাঁড়ানো বউটাকে, প্রসাদকে নয়। কিন্তু প্রসাদ সামান্য খুশি হয়ে বলল— তাহলে যাও। প্রকাশকে একটু সাবধান করে দিও।

—না, প্রসাদ। তোমাকে বলা দরকার। বলে ওঠে কৃষ্ণ। কৃষ্ণকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য শংকরপ্রসাদ পা বাড়িয়েছিল, ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল— হ্যাঁ, বলো।

—আমি উর্বীকে বিয়ে করছি।

—ও, তাই নাকি!

প্রসাদ এবার অদ্ভুত করে নিঃশব্দে হাসল। সেই হাসি দেখে শুভেন্দু বলল— তুমি

BanglaBook.org

কি বিশ্বাস করছ না।

—বিশ্বাস কেন করব না। তবে মঞ্জুর ঘটনার পৃষ্ঠে সংবাদটা দিলে!

—তাই-ই দিলাম প্রসাদ।

—এ তোমার কেমন হল, শুনবে! ঘরে আমার বউ আছে, আমি কেন অমুকের বউকে ইয়ে করতে যাব। এইসব নীতিফিতি আগেকার কালে মানুষকে গেলানো যেত। এখন এ সব যুক্তি শুনে মানুষ হাসে। আমার এক আত্মীয় বিয়ের রাতে শালীকে সোহাগ করে বউয়ের কাছে ফুলশয্যা করেছে। এ সব এখন কোনও ব্যাপার না।

—তোমাকে আমি আর বুঝতে পারছি না শংকরপ্রসাদ। মঞ্জুকে কেঁদে পড়তে দেখে বিচলিত হয়েছ, অথচ...

—আমার আত্মীয়র আচরণেও হয়েছি। শোনো, ওটা কিন্তু শ্যালিকা, বরের খুব বেশি গায়ে পড়াতে কুকীর্তি হয়েছে। কিন্তু মঞ্জু তোমারই পাড়ার বউ। মানুষ এখনও পাড়ার ব্যাপারে নাক গলায়।

—কারখানার ব্যাপারেও তাহলে নাক গলাবে শংকর।

—সেটা যাতে না পারে, সেটাই তো দেখতে হবে। ঠিক আছে, এখন যাও দেখি, বিয়েটিয়ে করো। তবে মামাশ্বশুরটিকে বেশি প্রশ্রয় দিয়ো না। ওর কথায় নাচলে, ওই বিয়ে টিকবে না। আমাদের কনজুগ্যাল লাইফে বেশি এথিকস ঢোকানো ঠিক না।

—পাড়ার ব্যাপারেই শুধু নোজ অফ এথিকস মুভ করবে শংকরপ্রসাদ। হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি শালা কুয়াশার মধ্যে মানুষ খুন করতে চাও। মঞ্জু সেকথা জানে? জানে না।

—তোমাকে আর ওয়ান ইঞ্চ টলারেট করা যায় না শুভেন্দু। এ রকম হারামখোর অকৃতজ্ঞ লাইফে দেখিনি। তোমাকে মেরে রাস্তায় শুইয়ে দিতে পারি। তা না করে মঞ্জুকেই আমি এমন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করব যে, উর্বীকে আর বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হবে না। তোমাকে স্ট্রিক্টলি সাবধান করে দিচ্ছি। তুমি চুপ করে থাকো। কথা না বলে বাড়ি চলে যাও। উর্বী বিয়ে করতে চেয়েছে বলে এই বুড়ো বয়সে এতটা তড়পানো তোমার ঠিক হচ্ছে না। কারখানায় ঢুকেছ, বার যখন হবে, নিজেকে তখন আর চিনতে পারবে না। এই তোমাকে বলে রাখলাম। যেমন আছ, তেমনি থাকো, চুপ করে থাকো। যাও।

'যাও' বলে শংকরপ্রসাদ আর দাঁড়ায় না, হনহনিয়ে হেঁটে ফিরে চলে যায়। একবারও ফিরে দেখে না শুভেন্দুর কী হল! অথচ কৃষ্ণকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে চেয়েছিল প্রসাদ। কৃষ্ণ প্রসাদের ফিরে চলে যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেল। সড়কের উপর যেন তার পা পুঁতে গেছে। গলা দিয়ে তার অপমান ঠেলে ঠেলে উঠতে চাইছে। বারবার মঞ্জুর মুখটা মনে পড়ছে। মনে পড়ে, 'আপনার ইন্ডাস্ট্রি কেমন চলছে কৃষ্ণবাবু? ভাল?'

সহসা নির্জন পথের উপর একটি মোটর বাইকের শব্দ ভেসে ওঠে। আকাশে বৈশাখের মাসশেষের গোল চাঁদ, ক'দিন আগে পূর্ণিমা গেছে। জ্যোৎস্নায় মোটরবাইক আরোহীকে দেখা যায়। দূর থেকে হলেও বাইকের মানুষটিকে চেনা লাগে কৃষ্ণের। এ নিশ্চয় ডাক্তার সীতানাথ। যেই একথা মনে হয়, কৃষ্ণ ভয় পায়।

BanglaBook.org

সঙ্গে সঙ্গে সে দৌড়তে শুরু করে। এত ক্ষিপ্রতায় সে ছোটে যে, তাড়া খাওয়া উদ্‌ভ্রান্ত সেই চেহারা আকাশের চাঁদই কেবল দেখতে দেখতে তার সঙ্গ নেয়— ছুটে এসে শুভেন্দু পাড়ার একটি গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে। একা একা হাঁপায়। এই গলিটা সংকীর্ণ। দু'খানি রিকশা পাশাপাশি যেতে পারে না। দৈর্ঘ্যেও গলিটা ছোট, এক মুখে একটি রিকশা ঢুকলে, অন্য প্রান্তের বিপরীতমুখী রিকশাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। একটি বেরিয়ে আসে, তারপর আর একটি ঢোকে। এবম্বিধ অসুবিধার কারণে, সাধারণত, অন্য গলি দিয়েই রিকশা চলাচল হয়, এ গলি রিকশা এবং গাড়ি বর্জিতই বলা চলে, মাঝে মাঝে কেউ কেউ ঢোকে। এই গলিতেই মঞ্জুর বাড়ি।

কৃষ্ণের হঠাৎ খেয়াল হয়, সে মঞ্জুর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাত সাড়ে এগারোটা। মঞ্জুর ঘরে আলো জ্বলছে। সহসা ধক করে লাশপচা গন্ধ এসে শুভেন্দুর নাকে লাগে। সে বেশ বুঝতে পারে, মঞ্জুর বাড়িতে মানুষ মরেছে। বাড়ির ছাদে একটি প্রকাণ্ড শকুন বসে রয়েছে। চাঁদের আলোয় শকুনটাকে স্পষ্টই দেখতে পেল কৃষ্ণ। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শুভেন্দু। তারপর একটু একটু করে বাড়ির দরজার সামনে আসে।

আশেপাশের অন্যান্য বাড়িগুলি অন্ধকার। ঘুমিয়ে পড়েছে। লাশপচা গন্ধের মধ্যে কী করে মানুষ ঘুমায়, বুঝতে পারে না কৃষ্ণ। ভ্যাপসা গরম, বাতাস নেই। শকুনটা নড়ছে না। ছাদের রেলিঙ থেকে পাখিটা পড়ে যাবে না তো। ফের পথে ফিরে এসে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ একটি পাথর তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারে। পাখির গায়ে লাগে না। পাখি নড়েও না। পাথরের মতো বসে থাকে।

একবার পাথর ছুঁড়েই কৃষ্ণ বুঝতে পারে, লাশের গন্ধে অভিভূত হয়ে বসে রয়েছে শকুনটা, মার খেলেও নড়বে না। আবার বাড়ির দরজার কাছে আসে শুভেন্দু। কলিং বেল টেপে। ভিতরে ডিংডং আওয়াজ হয়। বার তিন বেল বাজিয়েও সাড়া পায় না কোনও।

এবার দরজায় ধাক্কা দেয়, তারপর ডেকে ওঠে—সুবলদা।

সাড়া নেই। তখনই কৃষ্ণের মনে হয়, সুবলদা মরে গিয়েছে। তার লাশটাকে পাওয়া যাবে সোফার খোলের মধ্যে দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায়। এই অবধি ভাবা মাত্র, কৃষ্ণ গলায় জোর দিয়ে ডেকে ওঠে—সুবলদা। মিসেস দাস, দরজা খুলুন।

মঞ্জু দাস দরজা খুলতে এগিয়ে আসে না। কৃষ্ণ তখন বিড়বিড় করে বলে ওঠে— মার্ডার হয়েছে। সুবলদা মঞ্জুর হাতে খুন হয়ে গিয়েছে। মঞ্জু আর তার প্রেমিক মিলে সুবলকে খুন করেছে, তারপর সোফার খোলে মৃতদেহকে শুইয়ে বেঁধে ফেলে পুরী বেড়াতে গেছে। ওরা পুরীর হোটেলে ফুর্তি মারছে, এদিকে লাশ পচে যাচ্ছে। নইলে এত রাতে শকুন আসে না।

— ওগো, সুবলদা। রাইটার্সের ইউ. ডি. ক্লার্ক সুবল দাস, শুনুন, আমি কৃষ্ণ।

— কে?

—আমি কৃষ্ণ, মিসেস দাস বলছেন?

— হ্যাঁ।

BanglaBook.org

— শুনুন। আমি জানতে চাইছিলাম...

— ওরা কেউ নেই। পুরী বেড়াতে গেছে। ওরা দাশগুপ্ত, আমরা দাস, এই যে এদিকে।

কোন বাড়ি থেকে মেয়েগলা ভেসে এল বুঝতে পারে না কৃষ্ণ।

— ওরা নেই? আবাক হয়ে প্রশ্ন করল কৃষ্ণ।

উত্তর এল—বললাম তো, পুরী গেছে বেড়াতে। আলোটা নিবিয়ে যেতে ভুলে গেছে। পাখাও চলছে। এত রাতে কী দরকার আপনার? আরও তিনচার দিন বাদে ফিরবে।

— বলে গেছে?

— অনুমান করছি।

— ও।

— হ্যাঁ।

— আসলে আপনিও অনুমান করছেন, আমিও করছি। খবরের কাগজে অনেক কিছুই তো বেরুচ্ছে আজকাল।

— কী বললেন?

— বলছি আর কই, অনুমান করছি। আচ্ছা, দাশগুপ্তদের ঘরের মেঝে কি মাটির, বলতে পারেন? খুঁড়ে গর্ত করা যায়? কুঁয়ো মতন করে, ধরুন তার উপর মাটি ফেলে মাদুর বিছিয়ে তোষক পেতে শোয়া যায়? প্রেমিকের সঙ্গে? শুনছেন?

— না, শুনছি না। আপনি মদ খেয়েছেন। শুনুন, এরা ভাল মানুষ। আপনি বাড়ি যান।

— আপনি কচু জানেন। কচু।

— বেশ, তাই-ই জানি। এবার যান তো দেখি।

— শকুন বসেছে, দেখেছেন?

— না।

— তাহলে আপনি কী করে বুঝছেন, সুবলদাও মঞ্জুর সঙ্গে গেছে?

— কিছুই আমরা বুঝছি না। ওরা ফিরে এলে বোঝা যাবে। আপনি কি চাইছেন বলুন তো।

— আমি সামন্তকে চাইছি।

— তাহলে মঞ্জুর বাড়িতে বেল বাজাচ্ছেন কেন? গলির ওদিকের মাথায় যে বাড়িটা ওটাই প্রভু সামন্তদের বাড়ি। মাতাল আর কাকে বলে। কী চাইছে লোকটা বলো তো। সরো তো, দেখি ভাল করে।

কৃষ্ণ এবার ভয় পেয়ে মুখে রুমাল চেপে ধরে পালাতে শুরু করে। হনহন করে হাঁটে। আচমকা পাথর কুড়িয়ে তুলে নিয়ে ল্যাম্পপোস্টের মিটমিটে বাল্‌বে ছুঁড়ে মেরে বাল্‌বটা ফাটিয়ে দেয়। বিড়বিড় করে বলে—শালারা ঘুমিয়ে থাকে, গন্ধ পায় না। মানুষের নোজ অব এথিকস নাক ডাকাচ্ছে, মানুষের লাশ পচে যাচ্ছে। ওই দিকে শ্মশানঘাটে মৌ সাঁতার কাটে, মায়ের কাছে আসতে পারে না। কেউ জানেও না

BanglaBook.org

সেকথা। শকুনটা অমন করে বসে আছে, কেউ দেখল না পর্যন্ত।

ছোট গলিটা পেরিয়ে আসার সময় পিছনে ফিরে চাইছিল কৃষ্ণ আর গজরাচ্ছিল। এবং মনে মনে আনন্দও পাচ্ছিল, তাকে কেউ আর চিনতে পারছে না। নইলে যে মেয়েটা এতক্ষণ কোনও একটা দোতলার জানালার কাছে দাঁড়িয়ে জবাব দিচ্ছিল, সে কেন কৃষ্ণকে চিনল না। অবশ্য এ পাড়ায় ভাড়া নিয়ে নতুন হয়তো এসেছে।

চিন্তা করতে করতে কৃষ্ণ নিজেদের কারখানার রাস্তায় এসে পড়ে। তারপর সম্মুখে ওদের দু'জনকে দেখতে পায়। সবিতা তার শ্বশুরের হাত ধরে আস্তে আস্তে হাঁটিয়ে নিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছে। ওরা এতক্ষণ কোথায় ছিল? বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে কৃষ্ণ। সবিতা শ্বশুরের হাত ধরে বাড়ির গেট ঠেলে ঢুকল। চাবি দিয়ে ভিতরের গ্রিলের গেটের তালা খুলছে। খুলে ঘুরে দাঁড়িয়েই কৃষ্ণকে দেখতে পেল।

অন্ধ শ্বশুর স্পষ্ট গলায় রাত্রিকে শুনিয়ে বললেন — আগেই জানতাম, মিটিঙে লোক হবে না। খামোকা আমাদের ডাকা হল। সীতানাথ ডাক্তার বোকার মতো বসে রইল। মাঝে থেকে হল কী, প্রতিবেশীকে শত্রু বানালাম। আমার নাতনি মরেছে, তাতে জগতের কী এমন এসে যায়।

— চুপ করুন বাবা! লোকে শুনলে হাসবে।

— কে শুনবে বউমা। কেউই তো শুনল না। ভাবছি, মহিমার কাছে আমি মাফ চেয়ে নেব। মনে রেখো, মৌয়ের মরা খাটে কৃষ্ণ কাঁধ দিয়েছে, বিপদে পড়লে তাকেই ডাকতে হবে।

— আপনি যাই-ই বলুন বাবা, ডাক্তার সীতানাথ বললেন, আমার মেয়ের মাইওপিয়া হয়েছিল, মার্কারি সিম্পটম লক্ষ করেছিলেন ডাক্তার নন্দী। বিষে খেয়েছে, আমার মেয়েকে।

— না, লক্ষ তাঁরা করেননি, এখন অনুমান করছেন। মেয়ে বেঁচে থাকলে প্রমাণ হত। আর কী হবে বউমা। শত্রু বাড়বে। কার সঙ্গে টোক্কর দেবে? কে আছে তোমার? তুমি তো প্রফেসর অমরেন্দ্র বসু নও। বলি কী, এরপর মিটিং ডাকলে আমি আর যাব না।

— তাই করবেন। এখন চুপ করুন। কান পেতে রয়েছে।

— কে?

— রাস্তার উপর একটা চোর।

— চোর?

'চোর' শোনামাত্র কৃষ্ণ চোরের মতোই ছুটে পালিয়ে আসে বাড়ির মধ্যে। মরা আমগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে আকাশে চোখ তোলে। দেখতে পায় একটি কালো মেঘ চাঁদটাকে গেলবার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু একটুও নড়ছে না। কোথাও একটু বাতাস বইছে না, পুকুরে কেবল একটি মাছ লাফ দিয়ে জল ভাঙল প্রচণ্ড শব্দে। চমকে উঠল কৃষ্ণ।

BanglaBook.org

সমস্ত রাত বিছানায় শুয়ে ছটফট করেছে উর্বী। চোখের দুটি পাতা এক করতে পারেনি। চোখ বন্ধ করার কিছুক্ষণের মধ্যেই কীসের একটা আচমকা ধাক্কা খেয়ে চোখ খুলে ঘরের সিলিঙে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকেছে। এখন সে কী করবে? ভাবতে ভাবতে বিছানায় উঠে বসেছে। বাড়ির সমস্ত আলো নেবানো। জিরো ওয়াটের আলোতেও বাড়ির কেউ ঘুমাতে পারে না। অন্ধকারে বিছানার উপর বসে থাকে উর্বী।

মাঝে মাঝে বিছানা ছেড়ে নেমে টেবিলের ড্রয়ারের কাছে আসে। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালে। ড্রয়ার খুলে মামার চিঠিটা বার করে নেয়। চেয়ারে বসে টেবিলের উপর চিঠিটা খুলে মেলে ধরে। আগাগোড়া চিঠিটা পড়ে ফেলে। তারপর ভাঁজ করে ড্রয়ারে ঢুকিয়ে ড্রয়ার বন্ধ করে। টেবিল ল্যাম্পের সুইচ অফ করে বিছানায় ফিরে আসে। বালিশে মাথা রেখে চিত হয়ে শুয়ে অন্ধকারে চোখ মেলে চেয়ে থাকে। এইভাবে সে কতবার উঠল, আলো জ্বালল, চিঠি খুলে পড়ল এবং আলো নিবিয়ে দিল। কিন্তু ঘুমাতে পারল না।

লভ ম্যান ইন হিজ সিন। মনে পড়ল কতবার। কিন্তু উর্বী জানে না, কৃষ্ণের পাপ কতখানি এবং বোতলটায় কতটা গরল। এখন সে মামার নির্দেশ কীভাবে পালন করবে? ভেবেই উর্বী অন্য ঘরে ফ্রিজের কাছে আসে। ফ্রিজের পাল্লা খুলতেই ঠাণ্ডা এসে গায়ে লাগে। খানিকটা আলো বাইরে ছড়ায়। কেউ জানতে পারে না। কেউ কোনও প্রশ্নও করে না তাকে।

বোতলটা টেনে বার করে নেয় উর্বী। কৃষ্ণই তাহলে জল ভরেছে। কেন ভরেছে? টেস্ট দরকার। কেন দরকার?

দরকারই যদি তাহলে বোতলটা কেন লুকিয়ে রাখতে বলে কৃষ্ণ? কৃষ্ণ কি তার পাপ উর্বীকে গোপন করতে বলেনি? বলেছে যেমন, তেমনই আবার গরলের মাত্রাও জানতে চেয়েছে। জলকে সন্দেহ করে কৃষ্ণ। এটি মানুষের নতুন অসুখ। অতঃপর বোতলের জল নিয়ে কী করবে উর্বী? পরীক্ষার জন্য মামার হাতে তুলে দেবে? মামার কর্তব্যবোধ অত্যন্ত কঠিন। কারখানা অচল করে দেবেন মামা। কিন্তু ঘটনাটা ঘটবে উর্বীরই হাত দিয়ে। পাপকে গোপন নয়, তার মাত্রাকে উন্মোচনই করতে হবে তাকে! এটা কি কোনও বিশ্বাসঘাতকতা হবে? নাকি গোপন করলেই সেটা হবে মানুষের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা, মামা যখন জানবেন, মামা কী মনে করবেন তাকে?

কৃষ্ণই যা টেস্ট করবার জন্য দিয়েছে, তার পরীক্ষা কেন করবে না উর্বী! কিন্তু আদৌ কি দিয়েছে কৃষ্ণ? বোতলটাকে আবার ফ্রিজে ঢুকিয়ে নিজের ঘরে ফিরে আসে উর্বী। শুয়ে পড়ে। ঘুম আসে না।

হঠাৎ মনে হয়, কৃষ্ণ কাউকে হত্যা করেছে। কাকে মেরেছে তার কারখানার বিষ? ঘটনাটা কি সত্যিই ঘটেছে? ঘটে থাকলে সেই ঘটনায় কৃষ্ণের ভূমিকাই বা কী, কতখানি?

BanglaBook.org

অসহায় খুনিকে উর্বী প্রেম দিতে পারে, কৃষ্ণকে কথা দিয়েছে সেই উর্বীই। কিন্তু খুনি কি সত্যিই অসহায়? জল দেখে কৃষ্ণের যে আতঙ্ক, তা কি জলাতঙ্কের মতোই তাকে অসহায় করেনি?

খুব ভোরে, সবার ওঠার আগে ফ্রিজ থেকে বোতলটাকে বার করে এনে কলতলায় ছিপি খুলে দেয় উর্বী। তখনও হালকা আঁধার ছিল বাতাসে, আকাশে ছিল কোনও একটা উজ্জ্বল তারা। সেই তারার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে জল গড়িয়ে ফেলে দেয় সে। তারপর তার চোখে জল এসে পড়ে, তারাকে উর্বী বলে, হে তারা, আমি তোমার কাছে মানুষের পাপ গোপন করলাম, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও।

কিন্তু সমস্ত জল বোতল থেকে বেরিয়ে চলে গেলে উর্বীর মনে হল, পাপটা সে নিজেই করল। যেই সে একথা ভেবে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, উর্বীই কাউকে হত্যা করেছে। বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল তার। সে কিছুটা শব্দ করেই কেঁদে উঠল। তখনই মা বিছানা ছেড়ে কলতলার দরজার মুখটায় এসে দাঁড়িয়েছেন।

— ওখানে কী করছিস মা!

— কিছু নয় মা। বলে বোতলটায় জল ঢোকাতে শুরু করে উর্বী।

— কলের জল টেস্ট করবি নাকি?

— হ্যাঁ।

সারাটা সকাল প্রপার সাম্পলিং প্রোসিডিওর মাফিক কলের জল বোতলে ভরে নেয় উর্বী। তার মা যেন তাকে বুদ্ধি জুগিয়েছেন। কী আশ্চর্য, সে নিজেই কী যে করছে, বুঝতে পারছে না।

ইউনিভারসিটির উদ্দেশে বেরিয়ে সেই বোতলের জল কী মনে করে পথের উপর ফেলে দিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। আজ সে শান্তনুকে দিয়ে বাবার জন্য দোকানে খাবার পাঠিয়েছিল। মেয়েকে ফিরে আসতে দেখে মা অবাক হলেন। মেয়ে বলল— শরীরটা খারাপ করছে, আজ আর যাব না।

রাত্রে একটুও ঘুম হয়নি, চিন্তার জটিল চাপ তাকে অসম্ভব কাহিল করে তুলেছিল। বাড়ি ফিরেই জামা কাপড় না ছেড়ে বিছানায় পড়ে গেল উর্বী। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু ঘন্টা দেড়েক ঘুমও তার হল না। চটকা লেগে ভেঙে গেল। চোখ জ্বালা করছে। চোখেমুখে বিঘ্নিত ঘুমের বিষণ্ণতা একটি চুলের মতো জড়িয়ে গিয়েছে। চোখ থেকে জল গড়িয়ে না পড়লেও, মণি দুটো হালকা জলে সব সময় ভেসে থাকতে চাইছে।

উর্বী তাদের দোকানে এল। মামার নির্দেশ মতো আরও একটি বোতল সংগ্রহ করে নিল। তারপর সাম্পলিং-এর মামা-নির্দেশিত প্রসেস শুরু করে দিল। কৃষ্ণেরই কাপড়ের ব্যাগে দু'টি বোতল ভরে নিয়ে দুপুর বেলায় শুভেন্দুদের বাড়ি উপস্থিত হল উর্বী।

বাড়িতে ঢোকার মুখে অদ্ভুত সুন্দর একটি দৃশ্য দেখেছে উর্বী। সবিতা দত্ত একটি বাটিতে কলাপাতা ঢাকা দিয়ে কোনও রান্না করা বস্তু কারখানার মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে। অনেক দিন পরে কৃষ্ণদের বাড়ি এসেছে উর্বী। যখন কৃষ্ণ স্যার তাকে পড়াতেন, তখন

BanglaBook.org

মাঝে মাঝেই এসেছে। ইউনিভারসিটিতে ঢোকার কিছু আগে থেকে সেই আসাযাওয়া প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছে। দু'একটি দিন এসেছে মাত্র। তাহলেও এখানকার পরিবেশ বিশেষ বদলায়নি। উঠোনে দাঁড়িয়ে উর্বী সচকিত হয়ে ওঠে, আমগাছটা মরে গিয়েছে। পাওয়ারফুল হার্বিসাইডের কবলে পড়ে গাছটার মৃত্যু হয়েছে। বাড়িতে কাউকে দেখতে না পেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে উর্বী। পরিবেশ তাহলে বদলেওছে নিশ্চয়।

পথের উপর বর্জ্য পদার্থের অদ্ভুত স্রোত। তার পায়ের চটি ডুবে গেল। বাড়ির দেওয়ালের গোড়ায় একটি গর্ত দিয়ে চোঁ চোঁ করে কারখানার জল ঢুকছে। বুঝতে পারল গাছ কীভাবে মরেছে। বুকের ভেতরটা কেমন খাঁ খাঁ করে উঠল উর্বীর। এই সময় খালি হাতে কারখানা থেকে দত্তদের বউটা সসংকোচে বার হয়ে দ্রুত ছুটে গেল বাড়ির দিকে। গ্রিলের দরজায় শব্দ করে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

উর্বী ভয়ানক আশ্চর্য হয়েছে। সে এগিয়ে আসে কারখানার গেটের কাছে। দরজা সামান্য ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ে। কারখানায় ডিস্টিলেশনের কাজ চলেছে। বেশ ভিতরে এসে যথেষ্ট অবাক হল সে। ফ্লাস্কে যেন ডালিমের পাকা বীজরঙের পদার্থ ফুটছে। সোকপিট উপচে যাচ্ছে বর্জ্যপদার্থযুক্ত জল। মেঝেতেও জল। সেই জলের মধ্যে উবু হয়ে বসে ভাত খাচ্ছে প্রকাশ।

একমনে যত্ন করে খাচ্ছিল ছেলেটা। কারখানা চালু রয়েছে। প্রকাশ ভাত খাচ্ছে। আর কেউ নেই কোথাও। শরীরের ঊর্ধ্বভাগে জামাকাপড় নেই। এই পরিবেশকে অত্যন্ত ভয়াবহ মনে হল উর্বীর।

বউটা তরকারি দিয়ে গেল তখন। প্রকাশ পিছনে ফিরে চাইছে না। উর্বীকে দেখছেও না চেয়ে।

হঠাৎ অদ্ভুত আর্তনাদ করে উঠল প্রকাশ। পরিষ্কার বাংলায় চেঁচিয়ে উঠল— মাছি। সেই মাছিটা কৃষ্ণদাদা। হায় ভগবান, এ কাকে ভেজে দিলে রামজি।

উর্বী প্রকাশের আর্তনাদে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। থতমত করে বলে— কী হয়েছে প্রকাশ।

প্রকাশ যেই ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে চাইতে যাবে, এমন সময় খাবার পাতের একপাশে কোথা থেকে ছিটকে এসে পড়া বড় সাইজের রোমশ মাছিটা, যা কারখানার ভাসমান জলে বসে সবিতার দুধের পাত্রে গিয়ে পড়েছিল, সেই মাছিটাই পাত থেকে নড়ে উঠে লাফিয়ে গালে আছড়ে পড়ল প্রকাশের। মোটা মাছি, ভয়ানক রোমশ, মাথাটায় প্রচুর পারদের মতো ঝকঝকে চোখ। এটি কোনও স্বাভাবিক মাছি নয়, বিষ খেয়ে খেয়ে মোটা হয়েছে।

গালে আছড়ে পড়ার পর আবার পাতে গিয়ে পড়ল, ভাতের উপর। প্রকাশ থালার দিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখল। গালে বাঁ হাত দিয়ে স্পর্শ করে বলল— উর্বীদিদি, মাছি গো। হে রাম!

— কই, মাছি! বলে এগিয়ে আসে উর্বী। মাছিটাকে সত্যিই সে দেখতে পায়। দেখতে না দেখতে ভয়াবহ মাছিটা পাত ছেড়ে বাতাসে উড়ে পড়ে। অদ্ভুত তীব্র

BanglaBook.org

আওয়াজ করে উড়তে থাকে। বোঁ বোঁ সেই শব্দটা যেন ক্ষুদ্র উড়ো জাহাজের শব্দ। ক্ষুদ্র কিন্তু সুতীব্র। ঘরটার এখানে ওখানে উড়ে গিয়ে ধাক্কা খেয়েও পড়ে যাচ্ছে না।

— এই মাছিটাই দিদি মৌকে খেয়েছে। আলবাত ইয়ে সবকা দুশমন হোগা, হে রাম!

— ভয় পেও না প্রকাশ, আপনা থেকেই চলে যাবে।

— নহি।

প্রকাশ ভয়ে চোখ মুদে ফেলে। দেওয়ালে এবারে ধাক্কা খেয়ে উড়ে এসে মাছিটা প্রকাশের কানের উপর আছড়ে পড়ে। তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত তীব্র মৃত্যু-সমাচ্ছন্ন গলায় প্রকাশ ঘোষণা করে ওঠে— কানমে ঘুস গয়া দিদি। আমার মাথার ভিতরে ঢুকে গেল দুশমনটা। আহ্। হে রাম। মাথার মধ্যে কারখানা বসে গেল শিউজি। কারখানা চালু হো গয়া কিষনজি। কারখানা চলছে। একটা কাপের মধ্যে পড়ে গিয়ে খালি ভোঁ দিচ্ছে, পাখা মারছে, উড়ছে না। হাঃ হাঃ হাঃ। করে বেদম হেসে উঠল এঁটো মুখে প্রকাশ। এঁটো হাত দিয়ে নিজেরই গালে চড় মেরে আরও বেগে হেসে উঠল সে। তারপর মেঝেয় গড়িয়ে পড়ে গেল।

থ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে উর্বী। কী করবে বুঝতে পারছে না। কোনও তাল না পেয়ে বাইরে ছুটে আসে। ঘরের বারান্দায় ঝাড়ন হাতে দাঁড়িয়ে থাকা সবিতাকে কাতর গলায় ডেকে ওঠে— দয়া করে একটু আসবে বউদি। প্রকাশের কী হল বুঝতে পারছি না।

সবিতা ঝাড়ন ফেলে ছুটে আসে। সিধে ঢুকে পড়ে কারখানায়। পিছু পিছু এসেছে উর্বী। সবিতা প্রকাশকে মেঝেয় পড়ে থাকতে দেখেই শুকনো মুখে বলে উঠল— জ্ঞান হারিয়েছে উর্বী। ধরো, একে ডাক্তারের কাছে নিয়ে চলো।

দুটি মেয়ে মিলে প্রকাশকে রিকশা ডেকে সীতানাথ ডাক্তারের কাছে আনে। ডাঃ মণ্ডলের স্পর্শে চোখ মেলে প্রকাশ। বিড়বিড় করে বলে— মাছি ডাগদারবাবু। আমাকে বাঁচাও। মাছিটা বার করে দাও। কানমে ঘুসে গিয়েছে।

উর্বীর মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে ডাঃ মণ্ডল যন্ত্রপাতি বার করলেন এবং ঠোঁটে হালকা হাসি ফুটিয়ে বললেন— মিসেস দত্ত, আপনি একবার কারখানায় চলে যান। গিয়ে দেখুন, ভাতের থালার ওখানে মাছিটা পড়ে আছে কি না। যদি দেখেন আছে ...

— নিয়ে আসব? বলল সবিতা।

— হ্যাঁ। সাবধানে তুলে আনবেন। কাগজে করে তুলে নেবেন। যান, দেরি করবেন না।

— নহি ডাগদারবাবু। মাছি পাবে কোথায়? আমার মাথার মধ্যে চলে গিয়েছে। বলে উঠল প্রকাশ।

ডাঃ মণ্ডল খানিকটা হতভম্বের ভঙ্গি করে সামলে নিয়ে সবিতাকে বললেন— আপনি আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না। মাছিটাকে পাওয়া দরকার। যান ছুটে গিয়ে নিয়ে আসুন। আমি তোমার মাথার ভিতর থেকে মাছির চোদ্দো পুরুষকে চিমটি দিয়ে বার করে আনব প্রকাশ। ভয় পেয়ো না।

BanglaBook.org

সবিতা রাস্তায় নেমে রিকশা ধরে চলে যেতেই উর্বী ডাঃ মণ্ডলকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠে— মাছিটা আমি দেখেছি ডাক্তারবাবু! কথাটি দ্বিতীয়বার ঘোষণা করে উর্বী।

ডাঃ মণ্ডল চেয়ারে প্রকাশকে বসিয়ে প্রকাশের ঘাড়টা এলিয়ে ফেলে রেখেছেন চেয়ারের কাঁধে। প্রকাশের মুখ ঈষৎ হাঁ, দু'চোখ বন্ধ, মাথার মধ্যে তার কারখানা চলছে। মাথার ভিতরে বাইরের কোনও কথা হয়তো স্পষ্টভাবে পৌঁছতে পারছে না। প্রকাশের সারা মুখে ঘামের ফোঁটা। ডাঃ মণ্ডল মাছিটার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। হাতে ধরা তাঁর অস্ত্রপাতি। ডাক্তারের চোখেমুখে সূক্ষ্ম অসহায়তার ছাপ ফুটে উঠেছে।

ডাক্তার মণ্ডল বললেন— মাছিটার সাইজ কেমন? বড়?

উর্বী জবাব দিল— লোমঅলা বেশ হোঁতকা ধরনের মোটা মাছি, মাথায় সাংঘাতিক চোখ! আমি গেলেই হত ডাক্তারবাবু।

— যাবেন। সবিতা না পেলে, যাবেন। কথা হচ্ছে, প্রকাশের কানের মধ্যে মাছি যায়নি। ওটা হয় কারখানার মেঝেয় মরে পড়ে আছে, নয়তো উড়ে চলে গেছে। মাথার মধ্যে যে মাছি যেতে পারে না, একথা প্রকাশকে কে বোঝাবে! স্নায়ুতন্ত্রের এটা ব্যাধি। তবু ও যখন বলছে, মাছিটাকে আমি ওর মাথার ভেতর থেকেই বার করে দেব। আপনি যখন মাছিটাকে দেখেছেন বলছেন, তখন আপনিই হবেন সাক্ষী। আমি বার করে দেব, আপনি শনাক্ত করবেন। বলবেন যে, এটাই সেই মাছি। ঠিক আছে?

উর্বী মাথা নাড়তে গিয়ে বিস্ময়ে এবং কষ্টে প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। কেবলই তার মনে হতে থাকে, এ সে কী দেখছে। কোথায় এসে পৌঁছেছে সে?

হঠাৎ ডাক্তার মন্তব্য করলেন— আমি সবিতাকে দেখে খুব আশ্চর্য হচ্ছি, ক'দিন আগে ওর একমাত্র সন্তান মৌ মারা গেল। তাকেই কি না আমি কারখানার মাছি খুঁজে আনতে পাঠালাম!

উর্বী এবার চেয়ারে নড়েচড়ে বসল। মৌ কেন মারা গেল, প্রশ্ন করতে পারল না।

— মেঝেয় উবু হয়ে বসে টিনের থালায় করে প্রকাশ ভাত খাচ্ছিল ডাক্তারবাবু। অন্যমনস্কভাবে বলে ওঠে উর্বী, আগেই যদিও সে ডাক্তারকে একই কথা বলেছে।

ডাক্তার বললেন — ওই ভাতেই মাছিটা ছিটকে এসে পড়েছে। বুঝতে পারছি।

— নহি ডাগদারবাবু। পহেলা ওহি মচ্ছি দুধমে গিরা থা। চোখ বন্ধ রেখেই বলে উঠল প্রকাশ।

সীতানাথ মৃদু নিঃশব্দ হেসে মন্তব্য করলেন— খাটালের কথা বলছে প্রকাশ। খাটালটা মাথা থেকে নড়াতে পারল না, অথচ একটা আস্ত কারখানা মাথার মধ্যে ঢুকে গেল। ওই মাছিটাকে বার করতে না পারলে কিছুই বার হবে না।

উর্বী বেশ অসহায় হয়ে বলে উঠল — সবিতা বউদি না পেলে, আমি নিশ্চয় যাব।

— অবশ্যই যাবেন। তবে থাকে যদি, তাহলে সবিতা খালি হাতে ফিরবে না। ওর মতো সহিষ্ণু, বুদ্ধিমতী মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি।

— খাওয়ার সময় সবিতা বউদি প্রকাশকে বাড়ি থেকে তরকারি এনে দিয়েছিল।

BanglaBook.org

বলল উর্বী।

— তাই নাকি! বলে ওঠেন ডাক্তার।

ঠিক তখনই কৃষ্ণ এবং সবিতা ডাক্তারের চেম্বারের ভিতরে ঢুকে চলে আসে। সবিতাকে দেখে সপ্রশ্ন তৎপর চোখ তোলেন ডাক্তার — পেয়েছেন?

— না। সবিতার এই না বলাই কাল হল প্রকাশের। প্রকাশ হা হা করে হেসে উঠে বলল— পাবে কোথায়, মাছি তো আছে আমার মাথার মধ্যে। মৌ সুর লাগাত উর্বীদিদি, ভাতে পড়ল মাছি, কোদাল লেকে চাঁছি। কোদাল হ্যায় আপকা, ডাগদারবাবু? হ্যায় কিষনজি, মাথেমে কারখানা চল রহা হ্যায়। মাথার মধ্যে কারখানা বসে গেল শিউজি, হে রাম! বলে চোখ বন্ধ করে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল প্রকাশ।

রাম, কৃষ্ণ, শিব কেউই প্রকাশকে বাঁচাতে পারল না। প্রকাশ পাগল হয়ে গেল। একটি রিকশায় কৃষ্ণ আর প্রকাশ। অন্য একটিতে সবিতা আর উর্বী। তারা ডাক্তারের চেম্বার থেকে ফিরে এল।

কৃষ্ণের কাঁধে মাথা রেখে চোখ মুদে রিকশায় বসে রইল প্রকাশ। দু'টি রিকশা চলেছে, কারও মুখে কোনও কথা নেই। কারখানার কাছে এসে রিকশা থেকে নেমে উর্বী কারখানায় ঢুকে পড়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজল, কোথাও মাছিটা নেই। সবিতা আজ এই প্রথম অনেক কাল পরে কৃষ্ণের বাড়িতে ঢুকে আসে। প্রকাশকে ঘরের বারান্দায় বেঞ্চিতে বসাল কৃষ্ণ। সে এতক্ষণ পর্যন্ত একটি কথাও বলেনি। তার মনে হল, প্রকাশের মাছিটা সুবলদার লাশের উপর গিয়ে বসেছে এতক্ষণ, পৃথিবীর কেউ তা জানতে পারল না।

সহসা কৃষ্ণ উর্বীর কাঁধের ব্যাগটার দিকে খেয়াল করে স্তম্ভিত হয়ে গেল। চোখের দৃষ্টি দৃঢ় হয়ে উঠল। তারপর প্রকাশের গায়ে হাত রেখে বসে থাকা সবিতার উপর সেই দৃষ্টি তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলল। কোথাও না বসে বারান্দায় মেঝের উপর ব্যাগ কাঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে উর্বী। মহিমা কী কাজে পাড়ারই কোথাও গেছেন, এখনও ফিরে আসেননি।

কৃষ্ণ কথা বলে উঠল— জলের টেস্ট রিপোর্ট এনেছ? খুবই ঠিক সময়ে তুমি এসে পড়েছ উর্বী।

উর্বী এবার নিজের ভিতরে কেঁপে উঠল। বলল— ওই জল টেস্ট করা যেত না বলে ফেলে দিয়েছি। ওই জলে একটি মরা মাছ ভাসছিল। জলের প্রপার সাম্পলিং দরকার।

— ও আচ্ছা! ব্যাগের ভিতরে বোতল আছে?

— আছে। মামা আমাকে পুকুরের জল সংগ্রহ করে আনতে পাঠিয়েছেন।

— ও, তাহলে তুমি রেডি হয়েই এসেছ। গুড্। ভেরি গুড। দাও বোতল, আমিই ভরে দিচ্ছি। বলে উর্বীর কাঁধের ব্যাগ টেনে নিল কৃষ্ণ। বোতল দুটো বার করে ফেলল।

— দুটো বোতল! ঈষৎ বিস্ময় প্রকাশ করে কৃষ্ণ।

উর্বী বলল— হ্যাঁ। নাইট্রিক অ্যাসিড আছে একটাতে। ফাইভ এম.এল। ওটা

BanglaBook.org

আমার হাতে থাক। নাও। বলে অন্য বোতলটি এগিয়ে ধরল।

বুঝেছি। বলে কৃষ্ণ বোতলটা হাত বাড়িয়ে ধরে নিল। তারপর সবিতার দিকে চেয়ে বলল— কারখানাটি আর থাকবে না সবিতা। প্রকাশ পাগল হয়ে গেল। আমি কমপ্লিটলি বেকার হয়ে গেলাম। জিতুর পড়াশুনাটা কীভাবে চলবে, তাই ভাবছি। সুমির বিয়েটাও আর দিতে পারব না। কেন যে সরকার আমাকে জেল থেকে ছেড়ে দিল। আমার জীবনের গল্পটা ভারী সুন্দর। এর নাম হল, আবার তুই ইঁদুর হ। আমি যথা হইতে আসি তথায় ফিরিয়া যাই। আমি যদি তোমার মেয়ের সঙ্গে যেতে পারতাম। বলে চুপ করল কৃষ্ণ।

সবিতা শিউরে উঠল।

কৃষ্ণ বলল— আবার আমাকে জেলে যেতে হবে সবিতা। আমার শমন আমাকেই প্রস্তুত করতে হবে। এ খুব তুচ্ছ ঘটনা। যিশু তাঁর ক্রুশ মৃত্যুর আগে নিজের কাঁধে করে বধ্যভূমিতে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাধ্য হয়েছিলেন। মানুষ আজও বাধ্য হয় উর্বী। আচ্ছা সঙ্গে এসো। বলে দাও, কীভাবে কালেক্ট করব। বলে লাফ দিয়ে উঠোনে পড়ল কৃষ্ণ।

এইভাবে লাফিয়ে পড়ার মধ্যে কোনও স্বাভাবিকতা ছিল না। এতে পা মচকে, কোমর ভেঙে যেতেও পারত।

সবিতা ভয়ে 'আহ্' করে উঠল। উর্বী বোবা হয়ে গিয়েছিল। কৃষ্ণ কিন্তু হাহা করে হেসে উঠে বলল— আবার তুই ইঁদুর হ। এই অভিসম্পাত দেবেন আমার স্যার অমরেন্দ্র বসু। আমি তাঁর কাজ করে দিয়ে জেলে যাব। তোমরা স্যারের সাক্ষী হবে সবিতা। তুমি আর প্রকাশ।

প্রকাশ এবার ঘাড় সিধে করে চোখ খুলল, তারপর বলল— জি কৃষ্ণদাদা। পহেলা মচ্ছি দুধমে গিরা থা।

— গিরা থা। বলেই কৃষ্ণ উঠোনে দাঁড়িয়ে স্থির মূর্তি হয়ে গেল কিছুক্ষণ। সে তখন দেখতে পেল প্রকাশের সারা মুখে মৃত্যুর নীল জাল পড়েছে। তার মনে হল, প্রকাশ খুন হবে। এই প্রথম স্পষ্ট হয়ে গেল, 'পানিমে ক্যা থা'— একথা প্রকাশ জেনে গিয়েছে। উন্মত্ত অবস্থায় প্রকাশ সবই প্রকাশ করে দেবে, সে আর চেপে রাখতে পারছে না। দ্রুত লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠে আসে কৃষ্ণ।

প্রকাশের মুখের কাছে ঝুঁকে নেমে শুভেন্দু বলে— চোপ শালা! কারখানা চালু হয়ে গেছে, আবার কথা কীসের গাই কা বাচ্চা। কিছু মনে কোরো না সবিতা। সুদেবরা জানতে পারলে .... না আর কথা নয়। আমি আসছি। বলে একই ভাবে উঠোনে অস্বাভাবিক লাফ দিয়ে পড়ে কৃষ্ণ।

পুকুরের ধারে চলে আসে। কারখানা কিছুক্ষণ আগে বন্ধ হলেও রাস্তার বর্জ্য জলধারা পুকুরে এখনও অল্প অল্প গড়াচ্ছে, ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরছে যেখানে, সেখানে এসে দাঁড়ায় কৃষ্ণ। বিষজলের প্রপাতে ফুলে ওঠা জায়গাটার মাটি, তাতেই টুপিয়ে পড়ছে জল। সেই জলে বোঁ বোঁ করছে অসংখ্য রোমশ মাছি। কৃষ্ণ দেখে, এ এক আশ্চর্য পাপ শুষে খাচ্ছে মাছিরা, এদের গুঞ্জনে ভরে উঠছে সভ্যতার মস্তিষ্ক। এই

BanglaBook.org

মাছিকে প্রকাশ চিনে ফেলেছে। এদের মধ্য থেকে কৃষ্ণের মাত্র একটি মাছি প্রয়োজন। জল ভরে উর্বীর হাতে তুলে দেওয়ার পর একটি মাছিকে হত্যা করবে কৃষ্ণ। ভাবতে ভাবতে জলে পা ডোবানোর জন্য পুকুরের পাড়ের জল সরে নেমে যাওয়া স্বল্প ভেজা মাটিতে পা রাখল। জল রয়েছে পুকুরের মাঝখানে। কৃষ্ণ সেদিকে এগিয়ে গেল।

সবিতা রয়েছে প্রকাশের কাছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে উর্বী পুকুর পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

কৃষ্ণ বোতল হাতে পুকুরের মাঝ বরাবর চলে আসে। গায়ের জামা খুলে পুকুর পাড়ে ফেলে রেখে এসেছে। পরনের ফুলপ্যান্টকে গুটিয়ে তুলেছে থাই পর্যন্ত। জলে পা ডুবিয়ে দিয়েছে। দেখা গেল, বোতলের ছিপি না খুলেই বোতলটা জলের ভিতরে ডুবিয়ে দিল। দু'হাত দিয়ে ধরে জলের তলায় যতদূর সম্ভব নামিয়ে ছিপি খুলে দিল কৃষ্ণ। জলের ভিতরেই ছিপি লাগিয়ে বোতলটাকে উপরে ওঠাল।

ততক্ষণে পুকুর পাড়ে দু'চার জন লোক জমে এসেছে। জুটে এসেছে সুদেব আর শংকরপ্রসাদ। তাদের দেখে মুখ শুকিয়ে গেল কৃষ্ণের। জলের মধ্যেই সে থমকে দাঁড়াল। পাড়ে দাঁড়ানো উর্বীর চোখেমুখে ফুটে উঠল চরম অসোয়াস্তি আর ভয়। মনে হল, এখনই সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটবে। আজ উর্বী কৃষ্ণকে জল নয়, জীবনেরই মস্ত পরীক্ষার সামনে ঠেলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণের পাপকে সে গোপন করতে আসেনি, এসেছে উন্মোচন করতে, এ কথাই তাহলে সত্য। কৃষ্ণকে সে জেলে ঢোকানোর ব্যবস্থা করবে। অথচ যাকে সে জেলে ঢোকাতে চাইছে, সে বেচারি শারীরিক এবং মানসিকভাবে মোটেও সুস্থ নয়। উর্বীর প্রেম কৃষ্ণকে আজ আর কোনওই আশ্রয় দিতে পারে না। এই ঘটনার পর কৃষ্ণ কি উর্বীকে ঘৃণা করবে? জীবিকাচ্যুত মানুষ কাকেই বা ক্ষমা করে?

কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, কৃষ্ণের পার্টনাররা এই মুহূর্তে কী ঘটনা ঘটাতে পারে ভেবে পাচ্ছে না উর্বী। ভয়ে তার শরীর কুঁকড়ে যেতে চাইছে। পাড়ে উঠে চলে এল কৃষ্ণ। উর্বীর হাত থেকে অন্য বোতলটা নিয়ে ভর্তি জলের বোতল থেকে অতি সাবধানে জল ঢেলে নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে মিশিয়ে দিল। তারপর ছিপি এঁটে দিয়ে বলল— নাও, সাবধানে নিয়ে স্যারের কাছে চলে যাও। বলে সুদেব শংকরের দিকে চাইল কৃষ্ণ।

সুদেব সহিংস দৃষ্টিতে শুভেন্দুকে প্রশ্ন করল— এই জল কী হবে শুভেন্দু? কোথায় পাঠাচ্ছ?

কৃষ্ণ সুদেবের প্রশ্নের জবাব দেবার আগে দেখতে পেল, সবিতা প্রকাশকে সঙ্গে করে পুকুরের পাড়ে না এসে খানিকটা তফাতে পথের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের এক ঝলক দেখে নিয়ে সুদেবের প্রশ্নের জবাব দেয় কৃষ্ণ। সহজ গলায় বলে— স্যার এই জল টেস্ট করবেন বলে চেয়েছেন।

— তুমি এই জল দিচ্ছ, আমাদের বলেছ? সুদেব জানতে চাইল।

কৃষ্ণ বলল— স্যার ইউনিভারসিটির স্কুল অব এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজের

BanglaBook.org

সদস্য। এই জল পরীক্ষা করতেই পারেন। উনি চাইলে আমাদের দিতে হবে। আমরা না দিলেও স্যার সংগ্রহ করে নিতেন।

— সে তিনি কী করতেন, আমরা বুঝতাম। তুমি চুরি করে, কাউকে না জানিয়ে কী সাহসে দিচ্ছ শুভেন্দু! এই শত্রুতার মানে কী? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল! অ্যাই শংকর, এর কী করা যায় বল তো।

— কী করবি! জলের মধ্যে নিয়ে চল। চ। বলে কৃষ্ণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল শংকরপ্রসাদ। সুদেবও তেড়ে এসে কৃষ্ণের বাহু খামচে ধরে সোহাগের গলায় বলল— চ কৃষ্ণ। জল কতটা মেপে আসি। বলে হঠাৎ হেঁচকা টান দিয়ে ওঠে।

ওরা দু'পাশ থেকে কৃষ্ণের দুটি হাত চেপে ধরে পুকুরের দিকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যায়। কৃষ্ণ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু তার শরীরে এত বল ছিল না, যাতে করে সুদেব শংকরকে ঠেকিয়ে দিতে পারে, ধাতুবিষ তাকে ভিতরে ভিতরে খেয়ে অনেকখানিই শেষ করে দিয়েছিল। তার বুকে যক্ষ্মা, গায়ে জ্বর, শ্বাসে হাঁফ ধরে। যৌনাঙ্গে ঘা। তার হাড় তত আর পোক্ত নয়। তার মাথার মধ্যে প্রকাশের কারখানা।

কৃষ্ণ চিৎকার করে উঠল— আমি নাফা চাই না, জীবন চাই সুদেবশংকর। আমাকে ছেড়ে দাও। ওই জলে বিষ আছে, আমি মরে যাব। তোমরা আমাকে কুয়াশার মধ্যে মেরো না, জলের মধ্যে মেরো না। এ ভীষণ পাপ সুদেবশংকর। বন্ধুকে এভাবে মারে না। আমাকে কারখানা থেকে ছাঁটাই করে দাও, কিন্তু মেরে ফেলো না। মহিমা মা ... আ আ .. আ ... বলে আর্তনাদ করে উঠল কৃষ্ণ। মহিমা শব্দের শুধু মা-টুকু পুকুরের জল ছুঁয়ে ওদিকের বাগানে প্রতিধ্বনিত হয়। হয় ক্ষীণভাবে। উর্বী শুনতে পায়।

উর্বী বোতল দু'টি ব্যাগে ঢুকিয়ে কাকে ধরতে দিয়ে পুকুরের ভিতরে নেমে পড়ে চেঁচিয়ে ওঠে— ওকে ছেড়ে দাও তোমরা। জল নিতে এসেছি আমি, আমাকে মারো। ওর কোনও দোষ নেই।

জলের ভিতরে কৃষ্ণকে চুবিয়ে ধরেছে সুদেবশংকর। জলের ভিতর থেকে ঠেলে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে ঢোকে ঢোকে বিষাক্ত জল কৃষ্ণের পেটের মধ্যে চলে যাচ্ছে। শক্ত করে জলের মধ্যে কৃষ্ণকে চেপে ধরেছে ওরা। এমন সময় সবিতা আর প্রকাশ পুকুরের জলের কাছে ছুটে আসে।

উর্বী, সবিতা, প্রকাশের টানাটানিতে কৃষ্ণকে অবশেষে ছেড়ে দেয় সুদেবশংকর। ছেড়ে দিয়ে সুদেব বলে— যাঃ! এবার শরীরটা পরীক্ষা কর গে যা। দেখি তুই কেমন করে মরছিস। কারখানার টাকা খেয়েছিস, এবার জল খেয়ে ছাখ, কেমন মিষ্টি লাগে। আমাদের মুখের অন্ন কেড়ে নিতে চাও শুভেন্দু। বেইমান। আর শোনো, ডাবসনের ভাগ্নী, এই রকম একটা নোংরা লোকের কাছে তুমি আস কেন! এর কী আছে, এ শেষ হয়ে গিয়েছে। পাগল হয়ে গিয়েছে। জলের বোতল পুকুরের জলে ফেলে দিয়ে বাড়ি চলে যাও। এখানে এসে চরিত্র নষ্ট কোরো না।

প্রসাদ বলল— প্রেম একটা শুদ্ধ জিনিস খুকি। কারখানার জলে জিনিসটাকে খামোকা নষ্ট করতে এলে কেন? কাঁদছ কেন। ছিঃ।

BanglaBook.org

প্রকাশ বলল ছিঃ! এহি তুমহারা দোস্তিকা নমুনা হ্যায় শংকরজি! দোস্তকো মার ডালোগে, তব হম গবাহ দেঙ্গে। হম সবকুছ জানতে হ্যাঁয়। দুনিয়াকো বতলা দেঙ্গে হম। খাটাল কিঁউ চলা গয়া বোলেঙ্গে হম, মৌকি মউৎ কিঁউ হুয়ি, হম জানতে হ্যাঁয়। সবকে পিছে মচ্ছি হ্যায়, মচ্ছি। হা হা। হেসে উঠে কটমট করে সুদেব শংকরকে দেখল একবার প্রকাশ।

— তুই কী বলছিস রে প্রকাশ। এ ব্যাটাও পাগল হয়ে গিয়েছে। তোকে আমরা আজ থেকে ছুটি করে দিলাম। আমরা নতুন লোক আনব। বলে উঠল সুদেব।

শংকরপ্রসাদ বলল— না না। ও থাকবে। কাউকে আমরা তাড়াব না। চলো।

সবিতা আর উর্বী কৃষ্ণকে দু'পাশ থেকে ধরে পুকুরের পাড়ে তুলে আনে। পাড়ে ধপ করে বসে পড়ে কৃষ্ণ। সবিতা তার কাপড়ের আঁচল দিয়ে কৃষ্ণের গা মাথা মুছিয়ে দিতে থাকে। সালোয়ার কামিজ পরা উর্বী অবাক হয়ে ঘটনাটি দেখতে থাকে। সুদেব শংকর একদণ্ডও আর পুকুরপাড়ে দাঁড়ায় না। দ্রুত স্থান ত্যাগ করে পথ দিয়ে চলে যায়, কোথায় গেল, কেউ বুঝতে পারে না। হঠাৎ উর্বী ব্যাগের ভিতর থেকে বোতল দু'টি বার করে পুকুরের জলের দিকে ছুঁড়ে দিতে গিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে সবিতা বাধা দিয়ে বলল— এ কী! এত ঘটনার পর ধরা জল ফেলে দিচ্ছ কেন। নিয়ে যাও। পরীক্ষা করো। এরা কী ভেবেছে। দুনিয়া এদের ছেড়ে দেবে ভাবছ। আমি তো ছাড়ব না।

কৃষ্ণ অল্প মুখ খুলে হঠাৎ বলল— এরা জানে না, এরা কী করছে!

সবিতা বলল— সব জানে। তোমাকে মেরে আমাদের ভয় দেখাতে চাইছে। তোমাকে আর চাইছে না সঙ্গে, তুমি বুঝতে পারছ না। ঠিক আছে, তুমি এখন আর কথা বোলো না। চলো, বাড়ি চলো। তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না উর্বী, চলে যাও। প্রকাশ, দাদাকে ধরো।

কৃষ্ণ বলল— না না। এখনই একা উর্বীর যাওয়া ঠিক হবে না। আহ্, আমার বমি পাচ্ছে সবিতা। শিগগির ওঠাও আমাকে।

সবিতা কৃষ্ণকে খাড়া করে তোলবার চেষ্টা করে, উর্বী কাঁধ লাগায়। দু'পাশ থেকে দুই নারী প্রায় কাঁধে করে বাড়িতে বয়ে আনে কৃষ্ণকে। উঠোনে পৌঁছে দুই নারীর কাঁধে ভর রেখে পেট খোঁদল করে শরীরের শিরাউপশিরা নিংড়ে বমি করে ফেলে কৃষ্ণ। বমির সঙ্গে তার মুখ দিয়ে রক্ত বার হয়ে আসে।

কৃষ্ণকে কাঁধে করেই উঠোনে বসে পড়ে সবিতা এবং উর্বী। সবিতা কৃষ্ণকে একা উর্বীর কাঁধে ফেলে কৃষ্ণের শরীরের তলা থেকে বেরিয়ে বারান্দায় উঠে আসে। একটা বালতি আর মগ নেয়। উঠোনের টিউবওয়েল থেকে জল নিয়ে কৃষ্ণের কাছে আসে। একখানা গামছাও বারান্দায় মেলে রাখা তারের উপর থেকে টেনে এনেছে সবিতা।

মগ থেকে হাতে করে জল নিয়ে কৃষ্ণের মুখ ধুইয়ে দেয় সবিতা, উর্বী কৃষ্ণকে ধরে থাকে। মুখ ধুইয়ে, ভেজা গামছা নিংড়ে মুখগলা সব মুছিয়ে দিয়ে সবিতা বলল— এবার তোলো। ধরো ভাল করে, উপরে নিয়ে চলো।

সারা বাড়ি একটা তীব্র দূষিত দুর্গন্ধে ভরে গেছে। উর্বী সহ্য করতে পারছিল না,

BanglaBook.org

আবার কথা বলতেও পারছিল না। সে কেবল আশ্চর্য হচ্ছিল সবিতার সেবা দেখে। একটুও ঘৃণা করছে না। কণামাত্র বিচলিত দেখাচ্ছে না তাকে।

সিঁড়ি দিয়ে সাবধানে ধরে কৃষ্ণকে তোলা হল বারান্দায়। কৃষ্ণের ঘরের মধ্যে নিয়ে আসা হল কৃষ্ণকে। প্রকাশও ঢুকে এল ঘরের মধ্যে। কৃষ্ণকে শুইয়ে দেওয়া হল খাটের উপর। কৃষ্ণের পায়ের কাছে বসে পড়ল প্রকাশ। দুই নারী খাটের পাশে দাঁড়িয়ে। সবিতা কৃষ্ণের মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে দিল। ফ্যান চলছে পাঁচ পয়েন্টে।

কৃষ্ণ সবিতার মুখের দিকে চোখ মেলে বলল— কী করে সহ্য করছ সবিতা! আমাকে ছেড়ে পালাও। আমার রক্ত, বিষবমি, ঘেন্না হয় না?

সবিতা ক্ষীণ হেসে জবাব দিল— না। মৌ যখন মরে বিষবমি করেছিল, রক্তও উঠেছিল কৃষ্ণ। সেই একই গন্ধ পাচ্ছি তোমার শরীর থেকে। ঘৃণা করে আমার উপায় আছে! বলে আরও একবার কৃষ্ণের চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দেয় সবিতা। তারপর উর্বীর মুখের দিকে চেয়ে বলল— তুমি ভাই ততক্ষণ কৃষ্ণকে দ্যাখো, আমি শ্বশুরকে একটু দেখে আসি। যাব আর আসব। পনেরো মিনিট, তার বেশি না। মাসিমা এলে তোমাকে আমি গিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব।

চৌকাঠ পর্যন্ত পা বাড়িয়েছে সবিতা, এমন সময় কৃষ্ণ বলে উঠল— তুমি আমাকে এভাবে ক্ষমা করে দিচ্ছ কেন সবিতা? তোমার মুখের 'প্রশ্ন' কবিতাটা এখনও আমার মনে আছে।

সবিতা দরজায় হাত রেখে নিজের গতি রুদ্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল। একটু অবাক হওয়ার ভঙ্গি করে বলল— ও, তোমার মনে আছে! বলেই অসম্ভব গম্ভীর হয়ে বলল— এত সহজে মানুষ কাউকে ক্ষমা করে না কৃষ্ণ। মৌয়ের মরা আজ সাত দিনও হয়নি। এরই মধ্যে তুমি ক্ষমা পেয়ে গেলে। আমাকে তুমি ভুল বুঝেছ!

একটা ঝটকায় দরজার পাল্লা এক পাশে ঠেলে দ্রুত বেরিয়ে চলে যায় সবিতা। উর্বী সচকিত হয়ে দরজার দিকে চেয়ে তার চোখ দুটি মুদে ফেলে। এই ঘটনায় অদ্ভুত সমঝদারের ইঙ্গিতময় সুরে হেসে ওঠে কৃষ্ণের পায়ের কাছে বসে থাকা প্রকাশ। যেন সে এক গভীর আনন্দ পেয়েছে। দুটি নারীর মাঝখানে তার পাগল কৃষ্ণদাদা কেমন করে কষ্ট পাচ্ছে, ভালবাসাও পাচ্ছে ভেবে তার আনন্দ হচ্ছে। দুনিয়ায় এমন গুনাহগারকে ইজ্জত করার মানুষ রামজি জুটিয়ে দিয়েছেন বুঝতে পেরে প্রকাশ যাদবের আহ্লাদ হচ্ছে। কৃষ্ণদাদা সুখ পেলে তার সুখ! কৃষ্ণের আত্মাই তার আত্মা। কৃষ্ণ ক্ষমা পেলে সেও পৃথিবীর কাছে ক্ষমা পাবে।

প্রকাশের হাসিই উর্বীকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয় এ পাগলের হাসি। তবে এ পাগল কৃষ্ণকে আপন প্রাণের চেয়ে ভালবাসে। উর্বী কৃষ্ণের মাথার কাছে খাটে উঠে বসে। কৃষ্ণের কপালে হাত রাখে।

কৃষ্ণ বিড়বিড় করে বলল— মাছিটা এখনও আছে। শোনো প্রকাশ, মাছিটা মাথায় ঢোকেনি।

—নহি কৃষ্ণদাদা। মাথেমে ঘুসে গিয়েছে। ভোঁ মারছে। আমি আর বাঁচব না।

BanglaBook.org

তোমরা ঘর বসাও, আবাদ করো। আমি বরবাদ হয়ে গেলাম। উঁহ্! বহুত সাতাচ্ছে মচ্ছি। দুধমে গিরা থা। বলে উঠল প্রকাশ।

কৃষ্ণ এবার বিছানার উপর উঠে বসল। প্রকাশের দিকে কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তারপর বলল— তুমি বারবার একই কথা বলছ প্রকাশ— দুধমে গিরা থা। এই একটি কথাই যথেষ্ট। আর কিছুই তোমাকে বলতে হবে না। এবার চুপ করো। বলে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ে কৃষ্ণ। চোখ বন্ধ করে।

—স্যার! মৃদুস্বরে বলে উঠল উর্বী।

কৃষ্ণ চোখ খুলে বলল— তুমি আমাকে বাঁচাতে পারবে না উর্বী। সবিতা ঠিকই বলেছে, কখনও সে আমাকে ক্ষমা করবে না। একটি চিঠি তোমার ছোটমামাকে লিখে দিচ্ছি। কারখানার জল পরীক্ষা করবেন এবং তারই সঙ্গে এই চিঠিটাও তাঁকে সত্য উদ্ঘাটনে সাহায্য করবে। তুমি আমার প্রেম, তোমার সামনে আমি আর মিথ্যা লিখব না। আমাকে একটু উঠতে সাহায্য করো। নাও, ধরো।

উর্বী তার মাস্টারমশাইকে টেনে তোলে। কৃষ্ণ খাট ছেড়ে নেমে টেবিলের কাছে যায়। চেয়ারে বসে টেবিলল্যাম্প জ্বেলে চিঠি লিখে চলে। দিনের বেলাতেও সমস্ত জানলা বন্ধ বলে ঘর যথারীতি অনুজ্জ্বল। আলো জ্বেলে পড়াশোনা চালাতে হয়।

কৃষ্ণ লিখল,

পরম পূজনীয় স্যার,

উর্বী কারখানার জল সংগ্রহ করতে এসেছিল। আমি বোতলে জল ভরে দিয়েছি। প্রয়োজন হলে আরও দেব। পুকুরের জল টক্সিক লিমিট কবেই ছাড়িয়ে গেছে। পুকুর পাড়ের খাটালটা এই জল দ্বারাই বিষাক্ত হয়েছিল। পুকুরের ঘাস খেয়েছে গাইগুলো। তাছাড়া প্রকাশ পুকুরের জল বাহকে করে তুলে সেই জল দিয়ে গাভিদের জাবনা দিত। ফলে ধীরে ধীরে গাইদের দুধ বিষাক্ত হতে শুরু করে। ধাতুবিষে আক্রান্ত গাভির বাঁট পর্যন্ত চিরে ফেটে যায়। রক্ত পড়ত। এই অবস্থার পর্যবেক্ষক আমি। ওই দুধ খেয়েছিল সবিতা দত্তর মেয়ে। শৈশবেই বেচারি মৌ ধাতুবিষে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এবং অবশেষে মারা যায়। এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছে আমার চারআনি স্বত্বের কারখানা। আজ বিষচক্রের পুরো চিত্র ধরবার জো নেই। কারণ মৌ বেঁচে নেই, খাটালও উঠে গেছে। প্রকাশ রয়েছে। তার মাথার অসুখ। একটা বেমিশ মোটা মাছি, যা কারখানার বর্জ্যপদার্থযুক্ত জলে বসত এবং একদিন সবিতা দত্তর দুধের পাত্রে পড়ে দুধকে বিষাক্ত করেছিল বলে বিশ্বাস করে প্রকাশ, সেই মাছিই প্রকাশের কান দিয়ে ঢুকে অবশেষে তার মগজে পৌঁছে গিয়েছে। প্রকাশ উন্মত্তাবস্থায় মাছির কথাই বলছে শুধু। 'মচ্ছি পহেলা দুধমে গিরা থা', তার এই উক্তি আপনার কাজে লাগবে। এই সঙ্গে আরও একটি স্পষ্ট স্বীকারোক্তি করি, আপনার ভাগ্নী উর্বীকে আমি ভালবাসি, তাকে বিবাহ করার বাসনা ছিল। কিন্তু আমি নানাবিধ অসুখে ভুগছি। তাছাড়া আমি অপরাধী। অতএব এই বিবাহ অসম্ভব। তাছাড়া যতদুর মনে হচ্ছে, আমাকে আবার জেলে ফিরতে হবে। জেল থেকে বেরিয়ে বেশ কিছুকাল আপনাদের

জ্বালাতন করলাম, এই জন্য ক্ষমা চাই। আপনার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। ইতি

আপনার হতভাগ্য ছাত্র
শুভেন্দু।

কথা ফুরোইনি

স্যারকে লেখা চিঠিটার মুখ আঠা লাগিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল কৃষ্ণ। স্টেশন পর্যন্ত সঙ্গে এসেছিল সবিতা। উর্বীকে ট্রেনে তুলে দিয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে জানলার কাছে সরে এসে সবিতা বলল— প্রফেসর ডাকলে আমি আর প্রকাশ দেখা করব। তুমি মামাকে বলে দিয়ো। আমি বিচার চাই উর্বী। কাউকে আমি ক্ষমা করিনি।

সবিতার কথা শেষ হওয়ার আগেই ট্রেন ছেড়ে দিল। মহিমার একটি মাত্র আর্ত অসহায় উক্তি উর্বীর মনে পড়তে লাগল— আমার কৃষ্ণকে তুই ফাটক খাটাবি সবিতা!

সবিতাকে একথা করুণ সুরে বললেও উর্বীকে মহিমা একটা কথাও বলেননি। উর্বীর কাছে কোনও আবেদনই কি ছিল না তাঁর? স্যারের ভাগ্নীকে কত কঠিন মনে করলেন মহিমা!

—আমার ছেলে শেয়াল কুকুরের মতো করে মরবে, আমি তখন কার কাছে যাব। কত দোষ করেছে আমার শুভেন্দু, কে বলে দেবে। স্যার সব বিচার করবে, ভগবানের করার কিছু নেই? আমার বাড়িতে এ কীসের গন্ধ। তোর মেয়ের গায়েও এই গন্ধই ছিল সবিতা। এই কথাটা মনে রাখিস। মহিমার কণ্ঠস্বর বাতাসে ভেসে ভেসে আসে। চিঠির মুখটা ছিঁড়ে ফেলে উর্বী।

চিঠিটা পড়ে শেষ করে কিছুক্ষণ থ হয়ে বসে থাকে। কৃষ্ণের একটি আশ্চর্য মন এই চিঠির প্রতি ছত্রে জড়ানো। উর্বীর কেবলই মনে হয়, এই মন নিয়ে মানুষ তো সত্যিই বাঁচতে পারে না। এ এমন এক বিচারপ্রার্থীর পত্র, যার অপরাধ বিচার করার যোগ্যতা অন্তত উর্বীর নেই। এই পাপকেই গোপন করবে উর্বী। এ চিঠি পৃথিবীর কাউকেই দেখাবে না। এই পাপ যদি তাকে পাগল করে দেয়, তবুও না। কিছুতেই না।

প্রকাশের কণ্ঠস্বর বাতাসে ভেসে আসে— হম গবাহ দেঙ্গে। হম সব কুছ জানতে হ্যাঁয়। দুনিয়াকো বতলা দেঙ্গে হম। খাটাল কিউ চলা গয়া বোলেঙ্গে হম। মৌ কি মৌৎ কিউ হুয়ি, হম জানতে হ্যাঁয়। সবকে পিছে মচ্ছি হ্যায়। মচ্ছি। হা হা।

এই মাছি গরল ভক্ষণ করে। সভ্যতার সমস্ত পাপ খায়। এই মাছি কীভাবে জন্মায়? ভারতবর্ষ জানে না। জানলেও জবাব দেবে না। কৃষ্ণের চিঠিতে সেই মক্ষিকার জন্মবৃত্তান্ত নেই।

এই চিঠি কেবল নিজের কাছে থাকবে। নিজেকে বলল উর্বী। তারপর চিঠিটাকে সুন্দর যত্নে ভাঁজ করে তার শরীরের কোথাও লুকিয়ে ফেলল।

নিজের বিশ্লেষণী বুদ্ধি দিয়ে চিঠি আর জলের বোতলকে আলাদা করে ফেলল

উর্বী। কারখানার সমস্ত গরল এই চিঠিতে আসতে পারে না। বোতলের জল পাপ স্বীকার করেনি। চিঠি করেছে। সুদেব শংকরের পাপের বিচার কে করবে? তারা কৃষ্ণকে মারল। কৃষ্ণকে জলে ডোবাল। কৃষ্ণের মহিমা বলে সেই তীব্র কষ্টের আর্তনাদ বাতাসকে এখনও মথিত করে তুলছে। উর্বী কৃষ্ণের প্রতিধ্বনিত আর্ত ডাক শুনতে পাচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে, উর্বীকেই তখন অমন করে ডাকছিল কৃষ্ণ। কৃষ্ণের মাথার মধ্যে কারখানা, শরীরে কারখানা— যন্ত্র এভাবে, বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সমস্ত কেমিক্যাল এভাবে ঢুকে গেল কৃষ্ণের দেহে। সে কেবল 'মহিমা' বলে চিৎকার করল। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত ধাতুযৌগ, গ্যাস, বিষ সব সময় মানুষকে ধরবার জন্য, খাবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাছির জন্ম হচ্ছে।

একটি মাছি কোথা থেকে উড়ে চলে আসে। ট্রেনের জানলা দিয়ে শিকে আছাড় খেয়ে ঢুকে উর্বীর কোলে এসে পড়ে। চমকে ওঠে উর্বী, সেই লোমঅলা মাছি তার কোলের উপর পড়ে মরে গেল। হাতে করে তুলতেও ঘেন্না হচ্ছিল উর্বীর। একখণ্ড কাগজ কোথায় পাই ভেবে উর্বী ট্রেনের দেওয়ালে সাঁটা পোস্টারের দিকে চাইল। সেখানে গুপ্তরোগের বিজ্ঞাপন। সেদিকে হাত বাড়াতে লজ্জা করছিল উর্বীর। লোকে এভাবে বিজ্ঞাপন ছিঁড়তে দেখলে কী ভাববে!

পরক্ষণেই উর্বীর মনে হল, পৃথিবীর এখন অনেক গুপ্ত অসুখ। আলাদা করে এই বিজ্ঞাপনের কোনও মানে হয় না। বোতলে করে যা সে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, দেওয়ালে টাঙানো ব্যাধির বিজ্ঞাপন এর চেয়ে মারাত্মক নয়। সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় উর্বী। মাছিটা পায়ের কাছে পড়ে যায়। লক্ষ থাকে তার। পোস্টার টান দিয়ে ছিঁড়ে নেয়। কতকগুলো যাত্রী তার এই কাণ্ড দেখে মুখ টিপে হাসে। একজন কেউ মন্তব্য করে ওঠে— লজ্জা পেয়েছে। একেবারে চোখের উপর কি না। উ বাব্বা। গুপ্ত জিনিস দিয়ে কী করছে মেয়েটা।

উর্বী কান দেয় না। ছেঁড়া পোস্টার দিয়ে মাছিটাকে মেঝে থেকে তুলে নেয়। যাত্রীরা কিছুই আর ঠিক করতে না পেরে ভারী আশ্চর্য হয়। কে একজন বলে— পাগল নাকি!

কোনও কথা না বলে ট্রেন থেকে নেমে পড়ে উর্বী। সে গরল এবং গরল-ভক্ষক মাছি, দুই-ই সংগ্রহ করতে পেরেছে।

উর্বী বাড়ি এসে জলের বোতলটা ফ্রিজে রেখে দিল। চিঠিটাকে রেখে দিল আলমারির ভিতর— যেখানে অন্যের হাত পড়বে না। মাছিটাকে রাখল একটি ছোট কৌটোয়। এবং ঘণ্টা খানেক পরে ওই কৌটো আর বোতল সঙ্গে করে ডা. সীতানাথের চেম্বারে এল। কৌটোর মুখ খুলে ডাক্তারকে মরা মাছিটা দেখিয়ে বলল— এই সেই মাছি ডাক্তারবাবু! ট্রেনে বসে যাচ্ছিলাম, জানলা দিয়ে ছিটকে এসে কোলে পড়ল।

ডা. মণ্ডল মাছিটা দেখে বললেন— শুনুন। মাছি দেখিয়েও প্রকাশের মাথা থেকে কারখানাটা টেনে বার করা যাবে না। তবু আমি একবার চেষ্টা করব, রেখে যান।

—মানুষের এমনটাও হয়।

BanglaBook.org

—হয় যে তা তো চোখের সামনেই দেখছেন।

—আমাকে তুমি করে বলুন ডাক্তারবাবু। এই ব্যাধি কৃষ্ণেরও হতে পারে?

—হয়েছে। কৃষ্ণ নিজেকে প্রকাশের চেয়ে আলাদা কোনও জীব ভাবে না। প্রকাশের যা হয়েছে, কৃষ্ণেরও তাই-ই হয়েছে। কৃষ্ণ প্রকাশের চেয়ে বেশি সেনসিটিভ, বেশি জানে, তাই ওর অসুখ আরও জটিল। সে পাগল হয়ে যেতে যেতে বুঝতে পারে, সে পাগল হয়ে যাচ্ছে। এটাই আরও মারাত্মক। কৃষ্ণ বুঝে গিয়েছে, প্রকাশের এই ব্যাধি সারবার নয়।

—তাহলে কী হবে ডাক্তারবাবু! আমি কী করব?

—কারখানা কৃষ্ণকে আস্তটাই গিলে খাবে। তার আগে, এখনও সময় আছে, ওকে ওই কারখানা থেকে সরিয়ে নিয়ে এসো। এবং তুমিই ওকে বিয়ে করো। বাঁচার জন্য কোনও বিকল্প জীবিকার কথা ভাবো।

—জীবিকা কি খুব সহজ ডাক্তারবাবু!

—সহজ নয়। কিন্তু...

—আমি এখন আসি ডাক্তারবাবু। বলে উর্বী চেম্বার ছেড়ে পথে নেমে আসার জন্য পা বাড়ায়।

পিছন থেকে ডা. মণ্ডল বলে ওঠেন— সব তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারছি না, বিয়ের দেরি হলে কৃষ্ণের ক্ষতি হবে। ওর চিকিৎসা দরকার। বিয়েও দরকার। এখন যদি না করো, পরে কৃষ্ণই হয়তো আর করতে চাইবে না। ভয় পাবে। ভারতের এই ধরনের কারখানা মানুষের জীবন এবং যৌবন দুই-ই কেড়ে নিতে পারে। আচ্ছা, এসো।

রাস্তায় নেমে এল উর্বী। অটোরিকশা ধরে ছোটমামার বাড়ি এল। মামা বাড়িতে নেই। বোতলটা নিয়ে সিধে ইউনিভারসিটি এল সন্ধ্যার আগে। মামার ডিপার্টমেন্টে বোতলটা পৌঁছে দিল। মামাকে পেল না। না পেলেও, মামা এলে যাতে সহজেই বোতলটা পান এবং বোতলের জল যাতে সুরক্ষিত থাকে, সেইভাবে ব্যবস্থা করে বেরিয়ে এল উর্বী।

উর্বীর বার বার মামাকে লেখা কৃষ্ণের চিঠির কথা মনে পড়ছিল। মনে পড়ল,... 'এই বিয়ে অসম্ভব'। মনে পড়ে যাচ্ছিল, কৃষ্ণের চিঠির কণ্ঠস্বর,... 'আমি নানাবিধ অসুখে ভুগছি। তা ছাড়া আমি অপরাধী'।

অসুখ, অপরাধ, পাপ। বিষ, সূর্যালোকহীন ঘর। অ্যাসবেস্টসের ছাদঅলা নরকসদৃশ কারখানা। জেলখাটা একটা মানুষের জীবন এইরকম। হালকা অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে টেবিলল্যাম্প জ্বেলে চিঠি লিখছে কৃষ্ণ। কৃষ্ণকে জলের ভিতরে চেপে ধরে খুন করতে চাইছে বন্ধু-পার্টনাররা। কৃষ্ণ চিৎকার করছে, মহিমা...মা...বলে। কৃষ্ণ বমি করছে। সে বার বার চাপা শাসানো গলায় প্রকাশকে চুপ করতে বলছে। অপরাধে ভারাক্রান্ত কণ্ঠস্বর। কৃষ্ণ যে জলকে ভয় পায়, সেই জলকেই পার্টনাররা তার পেটের মধ্যে সাঁধ করিয়ে দেয়। মার খায় কৃষ্ণ। মারতে পারে না। পুরো একটি কারখানা ঢুকে যায় কৃষ্ণের মগজে।

BanglaBook.org

এই কৃষ্ণ উর্বীকে চুম্বন করেছে। করেছে আহত ঠোঁট দিয়ে। অন্ধ আহত একটি চুম্বন, ভেতরে কত অপমান, চোখে সূক্ষ্ম বেদনা জড়ানো, এই-ই উর্বীর স্যার, তার নায়ক। নিজেকে হঠাৎ মনে মনে শুনিয়ে বলল উর্বী, কোন ভালবাসায় তুমি জাগবে মাস্টারমশাই? এ বিয়ে অসম্ভব, এ আমি মানি না। তুমি জেলেই বা যাবে কেন? তুমি আমার কাছে থাকবে।

এই মুহূর্তেই কৃষ্ণের সঙ্গে একবার দেখা করতে তীব্র বাসনা হয় উর্বীর। এই বাসনাকে বুকের মধ্যে পুরে রেখে উর্বী দুটো দিন কাটিয়ে দেয়। অবশেষে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। একবার অন্তত তার স্যারকে স্পর্শ করবে উর্বী। বুকের মধ্যে কৃষ্ণকে একবার জড়িয়ে নেবে। একটি অনাহত চুম্বন করবে শুভেন্দুকে। চুম্বনের ভিতর দিয়ে কৃষ্ণের ভেতরের সব বিষ শুষে নেবে। উর্বী তার যৌবনের উদ্দাম শক্তিকে ঢেলে দেবে কৃষ্ণের দেহে।

দু'দিন পরে ইউনিভারসিটির একটি ছুটির দিন পায় উর্বী। ছুটে চলে আসে কৃষ্ণের কাছে। কৃষ্ণ তাদের বাড়ির বারান্দায় বেঞ্চির উপর প্রকাশকে পাশে করে বসেছিল। দেখা গেল, সেখানে সুদেবও একটি চেয়ারে রয়েছে। কেউ কোনও কথা বলছে না। দশটা বেজে গিয়েছে।

উর্বীকে উঠোনে দেখে সুদেব একটুখানি চমকে উঠল। মহিমা রান্নাঘর থেকে দু'টি প্লেটে চায়ের কাপ সাজিয়ে বার হয়ে এলেন। সুদেবের দিকে প্লেট এগিয়ে ধরেই উর্বীর উপর তাঁর চোখ পড়ল। কৃষ্ণ ঘাড় গুঁজে বসেছিল। প্রকাশ চোখ বন্ধ করে ঝিমোচ্ছে।

মহিমা উর্বীর আবির্ভাবে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হল না। তিনি সস্নেহে সুদেবকে বললেন— বিস্কুট খেয়ে, তবে চা খাও সুদেবসুন্দর। জল খাবে?

—এক গ্লাস জল, হ্যাঁ, নিয়ে আসুন মাসিমা। বলে প্লেট হাতের উপর নেয় সুদেব।

মহিমা উঠোনের দিকে মুখে ফেরালেন। তারপর উর্বীর উদ্দেশে নীরস সুরে বললেন— তুমি কি কিছু বলছ? উপরে আসবে?

মায়ের কথায় এবার কৃষ্ণ মাথা তুলল। তার চোখও পড়ল উর্বীর উপর। সে কেমন বোকার মতো দাঁড়িয়ে উঠল। প্রকাশ চোখ খুলল।

মহিমার অত্যন্ত ঠাণ্ডা আচরণ উর্বীকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল, সে এখানে কতটা অবাঞ্ছিত। মহিমা তাকে শত্রুই ভাবছিলেন। উর্বীর মনে হল, এই দু'দিনে সুদেব শংকরের সঙ্গে এই বাড়ির একটা মিটমাট হয়ে গেছে। সুদেব এখানে সমাদৃতই এখন। এই ঘটনা কী করে ঘটতে পারে ভেবে পাচ্ছিল না উর্বী। জীবন আর জীবিকার বাঁধনটা কি এমনই শক্ত! জীবিকার তাড়নায় মানুষ দুনিয়ার তাবত গরলকেই হজম করে নেয়? সব অপমানকে মাথা পেতে নেয়?

বারান্দায় উঠে দাঁড়ানো মাত্রই উর্বীকে কৃষ্ণ মন্থর গলায় বলে উঠল— তুমি আবার এসেছে উর্বী! আমি তো আর পারব না। আমি যা দেবার দিয়েছি, স্যার যা ভাল বুঝবেন করবেন। তবে হ্যাঁ, বাঁচতে হলে কারখানা আমাকে যে করে হোক চালু রাখতে হবে। কারখানার এখন থেকে তিন পার্টনারের সমান সমান ভাগ। আমাদের

BanglaBook.org

গোলমাল মিটে গেছে। মার খেয়েও তো দাবি আদায় করতে হয়, আমি সেটা করতে পেরেছি।

সুদেব বলল— এভাবে তুমি বলছ কেন শুভেন্দু! কারখানা চালাতে গেলে হ্যাপা কিছু হয়ই। খুচখাচ বিবাদ-বিসংবাদ হবে না? জল পরীক্ষা হবে, তাতে আমরা ডরিয়ে বসে নেই। কারখানা চলবে। বন্ধ হবে না। আমাদের ব্যবস্থা আছে। বলে মহিমার হাত থেকে জলের গেলাস নেয় সুদেব।

মহিমা উর্বীকে একটু বাঁকা চোখে দেখে বললেন— তুমি আমাদের এভাবে ঘাঁটাচ্ছ কেন উর্বী! তোমার ছোটমামা সাচ্চা মানুষ, তোমরা সাচ্চা। কিন্তু আমাদের তো এত সাচ্চা হলে চলবে না মা! সংসারে কত বড় বড় মানুষ কত সাংঘাতিক দোষ করে ছাড় পেয়ে যাচ্ছে, আমার কৃষ্ণ পাবে না? তুমি কি চাও না আমরা বেঁচেবর্তে থাকি!

উর্বী মুখ খোলার আগে পিছনে ফিরে দেখল, উঠোনে সবিতা এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে দেখে মনে খানিকটা বল পেয়ে সে বলে উঠল— এভাবে মরে বাঁচার তো কোনও মানে হয় না মাসিমা। আপনি জানেন না, স্যারের কী মারাত্মক অসুখ হয়েছে। আমি কারখানা বন্ধ করতেও আসিনি, খুলতেও আসিনি। ছোটমামা জল চেয়েছেন, সেটা দিয়েছি। এই পরীক্ষাটা হতই। আমি না দিলেও হত। এ কথা জানত বলেই শুভেন্দুস্যার জলের বোতল ভরে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁকে মার খেতে হল কেন? এই অপমান আপনার গায়ে লাগল না?

মহিমা কঠিন গলায় বললেন—না। আমার লাগেনি। আমরা পথে বসলে তুমি আমাদের দেখবে? তোমার ছোটমামাও কি দেখবে? আমি ভিক্ষে করব, তাই-ই চাও?

প্রকাশ দুম করে বলে উঠল— দুধমে মচ্ছি গিরা থা। কই নহি দেখা। হম সবকুছ দেখা। বাতলা দেঙ্গে দিদি। গবাহ দেঙ্গে হম।

সুদেব চায়ে চুমুক দিয়েছিল। কোনও ধরনের উত্তেজনা প্রকাশ না করে বলল— তাই-ই দিও প্রকাশ। এই সাক্ষীটাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও উর্বী। উঠোনে দাঁড়িয়ে আর একজন, তাকেও নিয়ে যাও। কিন্তু কৃষ্ণের দিকে হাত বাড়াবে না। কৃষ্ণই আমাদের মাথা। তাকে বাঁচালে আমরাই বাঁচাব, মারলে আমরাই মারব। তুমি উর্বীকে চলে যেতে বলে দাও শুভেন্দু। আমরা আমাদের বন্ধুর বিয়ে কোনও শত্রু-পরিবারে দিতে পারি না। এ বাড়ির বউ হবে বলে মহিমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে পার না তুমি। যাও, ফিরে যাও।

উর্বী সুদেবের আক্রমণে মাথা নিচু করল। ভেবে পেল না, কৃষ্ণকে কী করে সে কারখানার গ্রাস থেকে টেনে নিয়ে যাবে। কারখানাটি বন্ধ না হলে কৃষ্ণ এর কবল থেকে বার হতে পারবে না। একটি দীর্ঘ অজগর তাকে চোয়ালে দাবিয়ে নিয়ে একটু একটু করে গিলবে। এবং গিলছেও, কৃষ্ণ সেকথা বুঝতে পারছে, অথচ সে বার হতেও পারছে না।

উর্বী কোনও কথা না বলে মাথা নিচু করেই বারান্দা থেকে সিড়ি ভেঙে নেমে

BanglaBook.org

উঠোনে চলে আসে। সবিতাকেও কোনও কথা বলে না। ধীরে ধীরে বাড়ির বাইরে পা বাড়ায়। সবিতা উর্বীর পিছু পিছু আসে। একবার স্বল্পস্ফুট স্বরে ডাক দিয়ে বলে— উর্বী। তুমি চলে যাচ্ছ?

উর্বী সবিতার কথায় সময়ের এক লহমা থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু পিছন ফিরে সবিতাকে দেখে না। দ্রুত পায়ে জোর দিয়ে হাঁটতে শুরু করে। পথে রিকশা না পেলেও তার ছুটে চলা থামায় না।

স্টেশনে এসে তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে চুপচাপ ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে উর্বী। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, অসহায় পাপীকে ভালবাসা কি অতই সহজ। যে-মানুষের চারপাশে ধাতুযৌগের বিষ-শৃঙ্খল তাকে কোনও শুদ্ধ পৃথিবীর সন্ধান দেওয়া তার মতো ক্ষুদ্র প্রাণীর সাধ্য নয়। বেকার ভারতবর্ষে তারই বা ভবিষ্যৎ কী, তার কাঁধটাই বা কতখানি চওড়া? কৃষ্ণের বিকল্প জীবিকা কী? তার পরিবারকে কে দেখবে?

হঠাৎ কার হাতের স্পর্শে শিউরে ওঠে উর্বী। নিজের কাঁধে চেয়ে দেখে কৃষ্ণের হাত। দাঁড়িয়ে উঠে উর্বী বলে— তুমি। তুমি কেন এলে?

— তুমি ওইভাবে চলে এলে। কিছুই বললে না?

— না।

— কেন?

— তোমার আর বলার কিছু নেই শ্রীকৃষ্ণ। আমারও নেই।

— অথচ তুমি বলেছিলে, তোমার কাছে গোপন শুদ্ধ জল রয়েছে।

— ওটা কল্পনা। কল্পনা করতে ভাল লাগে। বাস্তবে আমার কাছে চোখের জল ছাড়া কিছুই নেই। তুমি জান, চোখের জল এমন কিছু দামি জিনিস নয়, বলতে কী শুদ্ধও নয়। আমি চলি। ট্রেন এসে গেছে।

ট্রেনে উঠে পড়ল উর্বী। গেটের মুখেই দাঁড়িয়ে রইল লোহার মোটা রড ধরে। তার চোখে বিপন্ন অশ্রু দুলছিল। আধ মিনিট দাঁড়াবে ট্রেনটা। কৃষ্ণ ট্রেনের গেটের কাছে এগিয়ে এল। উর্বীর হাতের উপর একটি হাত চেপে ধরে বলল— আমার কিন্তু কথা শেষ হয়নি উর্বী। গরল-চক্রের আরও একটি গ্রাফ তোমাকে, মানে স্যারকে বলা দরকার।

— স্যারকেই বলবে, আমাকে কেন? আমি কে? মহিমার মুখের অন্ন কেড়ে নেয় যে ভালবাসা, তেমন ভালবাসার প্রয়োজন কী শ্রীকৃষ্ণ।

— কিন্তু আমি যা জানি, তা আর কেউ জানে না উর্বী। আমার কথা এখনও ফুরোয়নি। আমি বলব। আমাকে বলতে দাও। ভুল বুঝো না আমাকে। তুমি নেমে এসো। কাতর গলায় বলে উঠল কৃষ্ণ।

উর্বী তার স্যারের স্পর্শ থেকে হাত টেনে নেয়, অথচ সে তার কৃষ্ণকে স্পর্শ করবে বলে পাগলের মতো ছুটে এসেছিল। ট্রেন ছেড়ে দিল। বোকার মতো প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রইল কৃষ্ণ।

ট্রেন ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, উর্বীর চোখে জল। ওদিকে প্ল্যাটফর্মে চরম অসহায়

BanglaBook.org

একটি মানুষ, আজ যার আঁকড়ে ধরার মতো কিছু নেই। যে হাত বাড়ায়, কিন্তু তার স্পর্শের বাইরে চলে যায় সমস্ত পৃথিবী।

দুপুরের প্ল্যাটফর্ম ছুটির দিন বলে যথেষ্ট নির্জন। একা দাঁড়িয়ে রইল কৃষ্ণ। মুখে তার খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথার চুল হলদেটে সাদা। সমস্ত ঘটনায় মনে মনে হাসি পাচ্ছিল কৃষ্ণের। আপন মনে নিঃশব্দে হাসেও সে।

সেই হাসি আর তার মুখ থেকে সরতে চায় না। সে যে হাসছে, হাসি দেখে বোঝা যায়, ওই হাসিটাকে অনুভব করছে না বেচারি। অননুভূত হাসি পাগলের লক্ষণ। হাসি আর সে আলাদা।

— আমি কোথায় যাচ্ছি শুভেন্দু? হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন করল কৃষ্ণ।

— তোমার অস্ত্রাগার, মনে পড়ে? মনে করায় শুভেন্দু।

— ওখানে আমার একটা অব্যবহৃত বন্দুক রয়েছে।

— চিনতে পারবে?

— হ্যাঁ। জায়গাটার নাম গোয়াস বকুলতলা। অস্ত্রের আলো ঝলমল করছে শুভেন্দু। একটা ভয়ানক ঝলকানি চোখের পাতা পুড়িয়ে দেয়। ভুরু পোড়ায়, তামা হয়ে যায় মুখ। তোমার মনে পড়ে না?

মেঘ

আশ্চর্য মেঘ জমল আকাশে। জ্যৈষ্ঠের দাবদাহকে সেই মেঘ ঠাণ্ডা করল ফ্রিজের দূষিত জলভরা বোতলের মতো। এই মেঘ দেখে কৃষ্ণের মনে পড়ল উর্বীর ভরা চোখের জল। তার শরীরে তীব্র কামেচ্ছা পাতনের বস্তুকণার মতো জমতে লাগল। সে বিছানায় শুয়ে দুই ঠোঁট হাঁ করা পাখির মতো পড়ে রইল। উর্বীর কথা শেষ হয়ে গিয়েছে, আছে কেবল কামনা-নিষিক্ত অশ্রু।

পাগল কৃষ্ণকে আর কেউ চাইবে না। এবার উর্বীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে উর্বীর বাবা মা তাকে তাড়িয়ে দেবে। উর্বী চোখে জল নিয়ে বলবে— তোমাকে আমি চিনি না।

প্রফেসর অমরেন্দ্র বসু বলবেন— তোমার মতো দূষিত ছাত্রকে আমি আর পছন্দ করি না। তুমি মঞ্জুকে কুপ্রস্তাব দাও। তুমি মৌকে হত্যা করো। খুন করার পর কারখানার স্বত্ব বাড়িয়ে নাও। তুমি চলে যাও। আমার ভাগ্নীর দিকে ভুলেও হাত বাড়াবে না।

— আমার স্যার বলার ছিল!

— আমি আর কিছুই শুনতে চাই না শুভেন্দু।

কৃষ্ণ হাঁমুখকে মাছি খাওয়ার মতো কপাত করে বন্ধ করে। তখনই কারখানার মধ্যে চিৎকার করে প্রকাশ। এই চিৎকার অসহ্য। প্রকাশকে খুন করে ফেলতে ইচ্ছে করে। বেশ কতক বার ছুটে গিয়ে খুন করে ফেলার মতলবও এঁটেছে কৃষ্ণ। খাটের তলা থেকে লম্বা একখানা লোহার রডও হাতে তুলে নিয়েছিল।

BanglaBook.org

পারেনি। চিৎকার থেমে গিয়েছিল বলে রডখানা খাটের তলায় ফেলে দিয়েছে। কিন্তু আবার চিৎকার করে উঠেছে প্রকাশ। আবার রড হাতে তুলে নিয়েছে কৃষ্ণ।

পারেনি।

কিন্তু কৃষ্ণও চেঁচিয়ে উঠেছে— শালা মরবার আগে লেকচার দিচ্ছে। তোর মাথায় মাছি ঢুকেছে তো আমি কী করব! তোর জন্যে আমি কি পাগল হয়ে যাব প্রকাশ। মঞ্জুকে আমি যে কুপ্রস্তাব দিয়েছিলাম, সেটা উর্বীকে দিলেই পারতাম। ধুস শালা, এই সব বাজে কথা উর্বীকে বলে নাকি! কাউকেও কখনও বোলো না শুভেন্দু। যা বলেছ, বলেছ! চেপে যাও। যাদবটাকে গলা টিপে দাও, ল্যাঠা চুকে যাক।

আকাশ থেকে মেঘ সরল না। অশ্রুপীড়িত উর্বীর মুখটাও কৃষ্ণের চোখের সামনে থেকে নড়তে চাইল না। উর্বীর ঠোঁট দুটি কৃষ্ণের অধরের কাছে উঠে আসতে লাগল।

— অবদমনে পাপ না ভোগে পাপ শুভেন্দু? কারখানা থেকে বার হয়ে গেলে পাপ না থেকে গেলে পাপ? যাদবকে মারলে পাপ না বাঁচালে পাপ? পাপ কীসে বৃদ্ধি পায়? আমি উর্বীর ঠোঁটে মাছির মতো বসেছিলাম, পাপ হয়েছে? ওকে যদি যক্ষ্মায় ধরে, পাপ হবে?

— কথা না বলে, তুমি পালাও কৃষ্ণ। প্রকাশকে মেরে অনুশীলন শুরু করো। ওকে আর বাঁচিয়ে রেখে কষ্ট দিয়ো না।

— তাই হোক।

— কিন্তু সাবধান, ধরা পড়লে চলবে না। রাত হোক। এখন সন্ধ্যা ঘনাল মেঘে মেঘে। মেঘের রাত। বৃষ্টি হলে আরও ভাল।

— ঠিক বলেছ শুভেন্দু। তুমি ছাড়া আর তো কেউ শুনতে পাচ্ছে না। তাই না?

— হ্যাঁ, কৃষ্ণ।

চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে কৃষ্ণ। উর্বী যেন তার পাশে এসে শুয়েছে।

— উর্বী এভাবে এলে আমি প্রকাশকে দুনিয়া থেকে সরাতে পারব না। আমি একা এই কাজ করতে চাই।

— তাই করো।

— কীভাবে একা হব শুভেন্দু?

— খুন করতে পারলেই তুমি একা হয়ে যাবে। ওঠো, রডটা হাতে নাও।

— কিন্তু উর্বী? আমার পা জড়িয়ে ধরছে কেন? আমার পায়ে মুখ ঘষে দুর্বল করে দিচ্ছে। কামনা দিয়ে খুনিকে বশ করতে চাইছে। আমি পারব না শুভেন্দু।

— পারতেই হবে। পা ছাড়িয়ে নাও। বল, উর্বী তুমি আমার শত্রু। তুমি আমার প্রতিপক্ষ।

— উর্বী শুনবে না।

— ওই দ্যাখো, প্রকাশ চ্যাঁচাচ্ছে। মারো, ওকে মারো, ওটাই তো ঘটনার সাক্ষী। ওকে দুনিয়া থেকে হটিয়ে দাও।

— আমি প্রস্তুত শুভেন্দু। আকাশে মেঘ ডাকছে। হাওয়া দিচ্ছে, হাওয়া থেমে বৃষ্টি পড়লেই আমি বার হব। বিদ্যুৎ ঝিকিয়ে উঠল, অস্ত্রের আলো। চোখ আমার পুড়ে

BanglaBook.org

যাচ্ছে। কী কষ্ট! মাথায় কারখানা চালু হয়ে গেল। কী যন্ত্রণা, মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। মা, মাগো!

বৃষ্টি শুরু হল। চড়াৎ করে মেঘ ডেকে আকাশ চিরে গেল। উঠোনের মরা গাছের পাতায়, মরা আমে বৃষ্টি পড়ছে। মরবার আগেও গাছটা আমের মুকুল দিয়েছিল, ফলও হয়েছিল দু'চারটি, কিন্তু সেই ফলে কোনও প্রাণ ছিল না। গাছটাই বলে দেয় কারখানার দূষণ কী মারাত্মক হয়েছে।

শুয়ে থাকতে থাকতে কৃষ্ণ এ মুহূর্তে বিষ-শৃঙ্খলের একটি ভয়াবহ রেখচিত্র কল্পনা করছিল। ভাবছিল, ভয়ংকর কোনও বর্ষা নামছে পৃথিবীতে। অতি বৃষ্টির দাপটে পুকুর ভরে উঠে উপচে যাচ্ছে বিষাক্ত জল। ছড়িয়ে পড়ছে অন্য পুকুরে এবং ডোবায়। এই সব ঘটছে আদি গঙ্গার বদ্ধ জলের ভিতর। পুকুরের মাছগুলি চলে যাচ্ছে আদি গঙ্গার জলে। একদিন বৃষ্টি থামলে সেই মাছ বাজারে উঠবে। মানুষ সেই মাছ খেয়ে অন্ধ হবে এবং মরবে। এই আদি গঙ্গার জনবসতি শ্মশান হয়ে যাবে। শ্মশান ঘাটে আর খেলা করবে না ডানাঅলা ক্ষুদ্র পরী।

এটি একটি গ্রাফ। কিন্তু বিজ্ঞানের যুক্তিতেই এই গরলচিত্র সত্য হতে পারে। এ কথা কাকে বলবে সে? কে শুনবে তার কথা। বললে ভাববে, লোকটা পাগল। বৃষ্টি পড়ছে। এই কথাগুলি উর্বীকেও বলা হল না। মাছ এবং মাছি, এরা সহজেই ধাতুগরল বহন করে। মাছ পেটের মধ্যে একটা বিষাক্ত পুকুরের সারাংশ রেখে দেয়।

একটি প্রকাণ্ড মাছের আস্ফালন শোনা গেল পুকুরের জলে। ছোট মাছকে খেয়েছে এই মাছটা। অজস্র মায়ামাছ চলে গেছে এর পেটে। এক একটা ছোট কারখানা ঢুকে গেছে এই বৃহৎ মাছের উদরে। এইভাবে ছোট ছোট ভোপাল রচনা করছে ভারতবর্ষ।

উর্বীকে একটি চিঠি লেখার কথা ভাবল কৃষ্ণ। কিন্তু বিছানা ছেড়ে খাড়া হয়ে উঠতে মন চাইল না। বাইরে এলোমেলো বৃষ্টির ঝাপটা চলেছে। রাত বাড়ছে। কোনও প্রকারে সামান্য কিছু মুখে গুঁজে বিছানায় ফিরে এল কৃষ্ণ। মা এই বৃষ্টির মধ্যেই ছাতা মাথায় করে কারখানায় প্রকাশের রাতের খাবার বয়ে দিয়ে এসেছেন। তখনও প্রকাশ চিৎকার করছিল।

এই যাদবের নিশ্চয়ই আর বেঁচে থাকা উচিত নয়। এই বৃষ্টির মধ্যে নিশ্চয় তার গ্রামের কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে তার শৈশবের কথা। মায়ের মুখ মনে পড়ছে। বোনের মুখ মনে পড়ছে। তার গ্রামের পথ, বটতলা, গোঠের কথাও কি মনে পড়ছে না? তারও কি নেই কোনও শৈশবের ক্ষীর নদীর স্মৃতি? নিশ্চয়ই শিউশরণকে মনে পড়ছে তার? যুগযুগান্তের স্মৃতি পথ ধরে উঠে আসছে কোনও অস্পষ্ট পথ, যা ক্ষুদ্র অরণ্যের ভিতর দিয়ে দিগন্তে চলে গেছে। একদিন এমন ছিল পৃথিবীর, যখন গোধূলি আলোয় নির্বিষ গাভিরা তার শাবককে সঙ্গে করে গলার ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে গোয়ালে ফিরে আসত। ফিরে আসত শিবতলার পাশ দিয়ে, ভাটফুলের পুষ্পঘ্রাত ধুলার উপর দিয়ে, বৃষ্টির ফোঁটা লাগা কুকুরশুঁকোর ডালপাতা মাড়ানো দিঘির পথটি ধরে আশ্চর্য বিকেলে। সন্ধ্যার পূজা দিচ্ছেন মা, ঘোমটার তলায় মায়ের স্বেদসিক্ত

BanglaBook.org

মুখ, বড় বড় চোখে শুদ্ধ পৃথিবীর আলো— এ কার মা?

তারও কি মা আমারই মায়ের মতন শৈশবে প্রকাশকে কোলে শুইয়ে আকাশের চাঁদকে মুখ আলো করতে ডাকেননি? এমনই শিশুকে ধাতুবিষ পাগল করে দেবে কেই বা জানত।

ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল কৃষ্ণ। তখনও বৃষ্টির শব্দের আড়ালে চিৎকার করে চলেছে প্রকাশ যাদব। ওর বুঝি আর খিদে তেষ্টাও নেই। আশ্চর্য বাদলার রাত, পাগলের রাত। আকাশে ক্ষীপ্রগতি উন্মাদিনী বিজলির কষায়িত লীলা। অ্যাসবেস্টসের ছাদে বাজ ভেঙে পড়ার শাসানি। উন্মাদ আরও উন্মাদ হয়ে ওঠে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি ছায়াবধূ উন্মাদের আর্তনাদ শুনছিল। তার চোখে বিদ্যুতের চিকুর খেলে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

এভাবে রাত পার হওয়ার আগে ছায়াবধূ বারান্দা থেকে ঘরে এল। তার বর তার উপর আকাশের উদ্ভ্রান্ত বাতাসের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার দেহকে খুঁড়তে লাগল। সেই এক দিশহারা বাদলের রাতে যৌবন-উন্মত্ত নারীগর্ভে মানুষের নূতন জন্মের সফল আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ অঙ্কুর উপ্ত করে দিল। পাগলের চিৎকারের মধ্যেও মানুষ-মানুষীর মিলন বিঘ্নিত হল না।

তখন কারখানার মধ্যে ঢুকে এল বর্ষাতি ঢাকা কালো দু'টি ছায়া। হঠাৎ এক সময় প্রকাশের চিৎকার থেমে গেল।

ভোর হওয়ার আগেই কৃষ্ণের ঘুম ভেঙে গেল। বিছানায় উঠে বসল। আকাশে মেঘ আছে, কিন্তু বৃষ্টি কখন থেমে গেছে। অল্প অল্প হাওয়া বইছে। ঘরের বাইরে বেরিয়ে বারান্দায় দাঁড়ায় কৃষ্ণ। আকাশটাকে ভাল করে দেখবার জন্য উঠোনে নামে। সহসা তার মনে হয়, সারারাত চিৎকার করে প্রকাশ হয়তো এখন ঘুমিয়ে রয়েছে। বেচারিকে একবার দেখতে সাধ হয় শুভেন্দুর। আজ প্রকাশকে ডাক্তার সীতানাথের কাছে চিকিৎসার জন্য একবার নিয়ে যেতে হবে।

সীতানাথ প্রকাশের মাথার ভিতর থেকে মাছিটা বার করে দেবেন। অতএব ভোরে ভোরে প্রকাশকে ডেকে তোলাও দরকার। মাছি কি সত্যিই বার হবে? তাইই কি কখনও হয়? কৃষ্ণ বুঝতে পেরেছে, ডাক্তার যেভাবেই চিকিৎসা করুন না কেন, মাছিটা মাথার ভেতর থেকে কখনও বার হয়ে আসবে না। চিৎকার করতে করতেই প্রকাশ একদিন মরে যাবে।

সেই প্রকাশকেই কেন কৃষ্ণ খুন করতে চায়? ভেবে প্রকাশের উপর বড্ড মায়া হয় শুভেন্দুর। উঠোন থেকে বাথরুমে আসে কৃষ্ণ। চোখেমুখে জল দেয়। ঘুম তখনও চোখের পাতায় জড়িয়ে রয়েছে, জল দিয়ে ঘুমটাকে পুরোপুরি তাড়াবার চেষ্টা করে।

পায়ে পায়ে কারখানার কাছে আসে কৃষ্ণ। আকাশে মেঘ। পরিবেশ এখনও আঁধারে মাখা। কারখানার দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে আসে শুভেন্দু। তার নাকে একটা মিষ্টি পোড়া গন্ধ ঠেলে এসে লাগে। পোড়া গন্ধটা কীসের? কোনও মারাত্মক অ্যাসিডের গন্ধ। মানুষ পুড়ে গেলে এই ধরনের গন্ধ হয়?

কারখানার ভিতরে একটুও আলো নেই। তাহলে আলো নিবিয়েই শুয়ে পড়েছিল

BanglaBook.org

প্রকাশ। কিন্তু অদ্ভুত রহস্যময় এই আঁধারে আলোর জন্য সুইচের কাছে যেতেও ভয় করছিল শুভেন্দুর। পায়ের তলা ভেজাভেজা লাগছে। ভয়ে ভয়ে তবু সুইচ বোর্ডের কাছে এসে সুইচ অন করে দেয়। কিন্তু আলো জ্বলে না। কৃষ্ণের তখন খেয়াল হয়, রাতে তার ঘুমের মধ্যেই লোডশেডিং হয়ে গিয়েছিল। না, তার আগেই বিদ্যুৎ চলে গিয়েছিল।

কৃষ্ণ কারখানা ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে চলে আসে। বাড়ি এসে টর্চ নেয়। আবার ছুটে আসে কারখানায়। যেন সে কীসের একটা সংকেত পেয়ে গেছে। বুকের ভেতরটা অনড় ভয়ের পাথরে চাপা পড়ে স্তব্ধ হয়ে আসতে চাইছে। কেঁপে ওঠে শুভেন্দু।

কৃষ্ণ চাপা ভয়ার্ত গলায় ডাক দেয়—প্রকাশ! ডেকে উঠেই টর্চের আলো ফেলে। তন্মুহূর্তে তার নাকে আবার এসে লাগে মিষ্টি বিষাক্ত সেই গন্ধ। এই গন্ধটা কৃষ্ণের চেনা নয়। মিষ্টি গন্ধ কিন্তু এ বিষ। কেন যেন এ গন্ধটিকে বিশ্বাস করতে পারে না। আলো ফেলেই ওই গন্ধের চরম সন্দিগ্ধ চেতনায় আঁতকে উঠে কৃষ্ণ দেখতে পায় মেঝেয় চিত হয়ে পড়ে রয়েছে প্রকাশ যাদব।

খুবই অদ্ভুত। প্রকাশকে চেনবার উপায় নেই। তার মুখের উপর গ্যাসমাস্ক। চোখের উপর আইপ্রোটেকটিং গ্লাস। দু'টি হাতে সাদা গ্লাভস পরানো। কৃষ্ণের চোখ দু'টি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। সে প্রকাশের খুব কাছে এগিয়ে আসে। প্রকাশের পায়ে বুট জুতো। একটুও নড়ছে না। সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, দেহে প্রাণ নেই। গন্ধটা মিষ্টি, পোড়াপোড়া, তীব্রভাবে বিষাক্ত। নিশ্চয়ই প্রকাশকে বিষ গেলানো হয়েছে। কিন্তু ওই গন্ধটা ছাড়া আর কোনও প্রমাণই নেই। কী চমৎকার সেজে যেন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে রয়েছে প্রকাশ।

মুহূর্তে সমস্ত দৃশ্য কল্পনা করে নিতে পারে শ্রীকৃষ্ণ। সারাজীবনে কখনও এই ধরনের পোশাক পরেনি প্রকাশ যাদব। মৃত্যুর আগে সমস্তই তার জন্য জোগাড় হয়েছিল। তা-ও হয়েছিল জ্যৈষ্ঠের একটি দাহ-পীড়িত বাদলা রাতে। এই পোশাক বড়ই আহ্লাদে পরেছিল পাগল ছেলেটি। যারা একে সুন্দর যত্নে এমন পোশাক পরিয়ে দিল তারা কারা? এমন সুমিষ্ট গন্ধের গরল যারা ওর মুখে তুলে দিল তারা কারা? —এই সব জুতো, গ্লাভস, চশমা, মাস্ক তোর জন্য নিয়ে এসেছি প্রকাশ। তার আগে এই ওষুধটা খেয়ে নে। ভাল ডাক্তারের ওষুধ, খেলে মাথার বিমারি সেরে যাবে। মাছিটা বেরিয়ে চলে যাবে। নে, আচ্ছা, আগে এই জিনিসগুলো পরে নিয়ে খা। ভাত খেয়েছিস? বাইরে ঝড়জল, আমরা বেশিক্ষণ থাকব না।

এই সব সংলাপ যে কল্পনা নয়, তার প্রমাণ প্রকাশের মাথার কাছে পড়ে রয়েছে। একটি শিশি। শিশির গায়ে সাঁটা দাগ নির্ধারক কাগজের চিহ্ন। স্পষ্টতই ওষুধের শিশি। নাকের কাছে তুলে এনে ওষুধের গন্ধ নেয় কৃষ্ণ। বিষেরই গন্ধ পায় সে। ঘাতক চিহ্ন রেখে যায়।

তৎক্ষণাৎ মনে হয়, এই শিশিতে এই প্রথম কারও হাত পড়ল। নিশ্চয়ই এই শিশিতে ঘাতকের হাতের ছাপ নেই। তারা চিহ্ন রাখেনি। তারা শিশিটাকে কোনও হাতমোজা পরে ধরে প্রকাশের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল। ভাবা মাত্র কৃষ্ণ ভয় পায়।

BanglaBook.org

নাকের কাছে আবার ছিপি খুলে শিশিটা শুঁকে দেখে কৃষ্ণ। তখন সে ধীরে ধীরে গুলিয়ে ফেলে ওষুধ আর বিষের পার্থক্য। বুঝতে পারে না, শিশিতে কী ছিল! ঘাতকরা কী পরে এসেছিল এখানে? উপযুক্ত হাতমোজা, গ্যাসমাস্ক, আইপ্রোটেটিং চশমা, কারখানার কাজের জুতো। সর্বোপরি গায়ে চাপানো ছিল বর্ষাতি।

আর ভাবতে পারে না কৃষ্ণ। আরও একবার অদ্ভুত পোশাক পরা পহরেদার, শ্রমিক-বন্ধু প্রকাশের দিকে চেয়ে দেখল কৃষ্ণ। মনে হল, এই শিশিটার সঙ্গে ওর মৃত্যুর কোনও সম্পর্ক নেই। না, নেই। কারণ এতে শুধু ওষুধের গন্ধ। তাহলে কীভাবে মারা গেল প্রকাশ?

কারখানার বাইরে বেরিয়ে আসার আগে প্রকাশের উপর ঝুঁকে পড়ে বিড়বিড় করে কৃষ্ণ বলল—এমন সুন্দর চশমা, জুতো, মাস্ক, মোজা পরে তোকে শেষে মরতে হল প্রকাশ! যেন তুমি কারখানার কাজ করতে করতে মরে গেছ। এইভাবে তোমার মাথার ভেতরের কারখানাটা বন্ধ হয়ে গেল।

বাইরে বেরিয়ে পুকুর পাড়ে এসে দাঁড়িয়ে জলের মধ্যে শিশিটাকে ছুঁড়ে দিল কৃষ্ণ। শুধু তার পায়ের কাছে পাড়ের উপর রইল ছিপিটা। ছিপিটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হাহা করে অট্টহাসি করে উঠল শুভেন্দু। ছিপিটা নাকের কাছে তুলে নিল পাড়ের উপর থেকে। তারপর বলল—এ নির্ঘাৎ বিষ। এ ওষুধ নয়। মিষ্টি এ গন্ধ ওষুধের হয় না। এ আমি কী করলাম।

শুভেন্দুকেই আজ এই প্রথম কৃষ্ণ বলে উঠল—তুমি যা করেছ, ঠিক করেছ শুভেন্দু। এবার পালাও। তুমি শুনে রাখো, অত্যন্ত জটিলভাবে সাজিয়ে প্রকাশকে মারা হল। সবাই জানবে, প্রকাশ কাজ করতে করতে মরেছে। মানুষ বুঝবে, সুদেব শংকরের করার কিছু ছিল না। তুমি শিশিটার জন্য হাহাকার করছ কেন? ছিপিটাও ফেলে দাও। পালাও এবার।

পাগলের মতো ছিপিটাকে হাতের মুঠোয় ধরে কৃষ্ণ বলল—না, এটা আমি ফেলব না। আমার যে জানা হল না প্রকাশ কীভাবে মরল। আমি জানব না। বিষ না ওষুধ, আমি জানব না!

বিষচক্রের রেখাটি কতদূর বেঁকে গেছে শুভেন্দু। তোমার স্যার কী ভাবে জানবেন সেকথা? উর্বীকেও তোমার কিছু বলা হল না। কেউ কিছুই জানাল না, প্রকাশ মরে গেল। অতএব পালাও, আর দেরি করো না।

প্রকাশের মৃতদেহ একবার একটু স্পর্শও করলাম না আমি। ভয়ে করলাম না। পাছে ওর শরীরে আমার হস্তক্ষেপ থেকে যায়। আমি মৌয়ের জন্য অপরাধ স্বীকার করি, প্রকাশের মৃত্যুর জন্য কিছুই করি না। ভয় পাই। প্রকাশের মৃত্যুর প্রমাণ লোপাট করে দিই, কারণ থানাপুলিশ হলে পুলিশ প্রথমেই আমাকে ধরবে। কিন্তু না, পুলিশ কেন ধরবে, প্রকাশ তো কাজ করতে করতে গরমে দম আটকে মরে গিয়েছে। কারখানার দরিদ্র শ্রমিক কত তুচ্ছ কারণেই মরে যেতে পারে। মরেছে, মিটে গেছে। আমি এবার পালাই।

ভাবতে ভাবতে বাড়িতে ঢোকে কৃষ্ণ। কিছু টাকা নেয় সঙ্গে। কাঁধে কাপড়ের

BanglaBook.org

একখানা ব্যাগ ঝুলিয়ে নেয়। দু'একটা জামা কাপড় নেয়। জামা কাপড়ের তলায় রেখে দেয় ছিপিটা, একটি কাগজে মুড়ে। বাড়ির বাইরে চলে আসে। মা এখনও ঘুমিয়ে রয়েছেন। মাকে ডাকে না কৃষ্ণ। উঠোনের গাছটাকে নমস্কার জানিয়ে কৃষ্ণ বলে এসেছে, হে বন্ধু, চলে গেলে, একটু একটু করে তোমাকে আমি মারলাম, আজ আর একজন গেল। তোমরা কেন পৃথিবীতে আস, আমি বুঝতেই পারি না। গরিব দেশে এভাবে কারও উঠোনে জন্মাতে নেই মা!

পথের উপর এসে থমকে দাঁড়ায় কৃষ্ণ। সবিতা বারান্দার একটি চেয়ারে বসে রয়েছে। কেমন আলুথালু দেখাচ্ছে তাকে। বুকের কাপড় পড়ে আছে কোলের উপর। গায়ে জামা নেই। বুক জোড়া চোখে পড়ল হালকা আঁধারের মধ্যে। চোখ নামিয়ে নিল কৃষ্ণ। অন্ধকার ফিকে বলেই দেখা তো যাচ্ছে। পথের দিকে চাইল কৃষ্ণ। কৃষ্ণের এ মুহূর্তে উর্বীকেই মনে পড়ল।

সবিতা দ্রুত হাতে শরীর ঢেকে নিয়েছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—কোথায় যাচ্ছ কৃষ্ণ, এত ভোরে!

কৃষ্ণ পা বাড়িয়ে থেমে ডান হাতে ঘুরে সবিতার গ্রিলের দরজার কাছে আসে।

গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু বলল—আমি একটু গোয়াস বকুলতলা যাচ্ছি সবিতা। আমি চলে যাচ্ছি। আমি পাগল হয়ে গেছি, আমি আর ভাল হব না। চলি! বলে পথে আবার ফিরে আসে কৃষ্ণ। এমনই অসহায় দেখায় তাকে যে সবিতার চোখে জল এসে পড়ে। কৃষ্ণের আজকের বলার মধ্যে কী ছিল কে জানে, সবিতা আর সামলাতে না পেরে বলে উঠল—তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিয়েছি কৃষ্ণ। তুমি চলে যাচ্ছ কেন? তুমি ফিরবে না? কবে ফিরবে? সবিতার প্রশ্নের আর কোনও জবাব দেয় না কৃষ্ণ। দ্রুত হনহনিয়ে হাঁটতে শুরু করে। তার চোখের উপর ঝলমল করে ওঠে একটি আশ্চর্য অস্ত্রাগার।

বিশ্বাস করো উর্বী

রাস্তায় পুলিশ দেখলেই ভয় করছিল কৃষ্ণের। গোয়াস বকুলতলা রওনা দেওয়ার আগে তার একবার উর্বীর সঙ্গে দেখা করা উচিত। সে কেন কোথায় যাচ্ছে অন্তত বুঝবে। স্বপ্নের কথা সবাই তো বিশ্বাস করবে না।

ট্রেনে করে এসে মেঘলা আঁধার ছাওয়া ভোরে সুভাষগ্রামে নামল শুভেন্দু। দ্রুত হেঁটে উর্বীদের বাড়ি এসে কলিংবেল বাজাল। কিছুক্ষণ কোনও সাড়া পেল না। আরও দু'বার বেল বাজিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। বুঝতে পারছিল, বাড়ির এখনও কেউ জেগে ওঠেনি। তবু সে তো ফিরে যেতে পারে না।

হঠাৎ এক সময় দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এল উর্বী। সে কিছুটা সেজে বাইরে কোথাও বার হচ্ছে। স্নান করেছে, নতুন জামাকাপড় পরেছে, কপালে একটা গোল লাল বড় টিপ। গা থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ আসছে। খুবই সুন্দরী দেখাচ্ছিল উর্বীকে।

উর্বী কৃষ্ণকে দেখে সচকিত বিস্ময়ে কেমন শঙ্কিত হয়ে উঠল। দরজা পেরিয়ে,

BanglaBook.org

দরজাটা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে বলল—চলো। পথে যেতে যেতে কথা বলব আমরা।

হাঁটতে হাঁটতে উর্বী পাশে ঘাড় বাঁকিয়ে কৃষ্ণকে দেখছিল। পথ নির্জন।

—কোথায় যাচ্ছ উর্বী? জানতে চাইল কৃষ্ণ।

উর্বী সেকথার উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল—তুমি কোথায় যাচ্ছ?

কৃষ্ণ বলল—ঠিক ধরেছ, আমি চলে যাচ্ছি। মাকে বলে আসা হয়নি। তুমি যদি পার মাকে গিয়ে বলো, আমি চলে গেছি। মা কান্নাকাটি করবে, জিতু অপেক্ষা করে থাকবে। সুমির সঙ্গে হয়তো আর দেখাই হবে না। তুমি প্রত্যেককে বলবে, আমি চলে গেছি। আচ্ছা উর্বী, স্যারকে লেখা আমার চিঠিটা স্যারকে পৌঁছে দিয়েছ?

উর্বী এবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার ফলে কৃষ্ণকেও থামতে হল। কৃষ্ণের মুখের দিকে আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল উর্বী। তারপর মৃদুস্বরে বলল—তুমি পালিয়ে যাচ্ছ কৃষ্ণ, আমাদের ছেড়ে?

—না না, তা কেন, আবার আমি আসব। বলে উঠল কৃষ্ণ।

তৎক্ষণাৎ উর্বীর আকুল জিজ্ঞাসা—আমাদের বিয়ে হবে না? বলেই সে যোগ করে—তুমি আমি মিলে একটা ছোট্ট কারখানা গড়ব শ্রীকৃষ্ণ। সুগন্ধি কারখানা। তাছাড়া সব গ্রিন ক্যাটেগরির প্রোডাক্ট হবে আমাদের। আমি কারখানার জন্য ছোট মামার কাছে সামান্য পুঁজি চাইব। ধার নেব। পরে শোধ করে দেব। তোমার বিদ্যাকে আমি আর দূষিত হতে দেব না। শোনো, তুমি কোথায় যাচ্ছ, আমাকে বলে যাও!

উর্বীর কথা শুনে তার অশ্রু ঘনিয়ে ওঠা চোখের দিকে চেয়ে হাহা করে হেসে ওঠে শুভেন্দু।

—হাসছ কেন! অবাক হয়ে জানতে চায় উর্বী।

—হাসছি এই জন্যে যে, শুধু তোমার আমার ছোট জীবনের জন্য খুব ছোট একটা কারখানাই যথেষ্ট। কিন্তু পাঁচজনকে খাওয়াতে পরাতে হলে, দায়িত্ব বড় হলে, কারখানাটাকেও খানিকটা বড় করতে হয়, ছোটোর মধ্যে বড়। তখনই কারখানা.... যাক গে....

—তোমার এত লোভ মাস্টারমশাই! তুমি সুদেব শংকরের সঙ্গে দর করে লাভের ভাগ বাড়িয়ে নিয়েছ। এখন এমন কী ঘটল যে তুমি.... তুমি এদের সঙ্গে থাকলে, আমাকে তুমি পাবে না স্যার।

—আমি আর ওদের সঙ্গে নেই উর্বী। আমি কারও সঙ্গে নেই। এমনকী তোমার সঙ্গেও নেই। আমি একা। আমি তোমাকে বলতে এসেছি.... কী বলতে এসেছি.... ও হ্যাঁ.... তোমাকে আমি একটা কথা বিশ্বাস করাতে চাই। বলে কপালে খাড়া করে আঙুল ঠেকিয়ে দুটি চোখ আস্তে করে বোজে শুভেন্দু। কী করে বলবে তাইই যেন ভাবতে থাকে। তাকে কিছুটা উত্তেজিত দেখায়।

—আমি তোমার সঙ্গে নেই শ্রীকৃষ্ণ? ভেজা গলায় জানতে চায় উর্বী।

চোখ খুলে দৃষ্টিকে মাটিতে রেখে কৃষ্ণ কঠিন গলায় উচ্চারণ করল— না।

BanglaBook.org

—তাহলে তুমি কী বলবে বলো!

—তুমি রাগ কেন করছ উর্বী। আমার মতন মানুষ একাই হয়, শেষ পর্যন্ত কেউ তার সঙ্গে থাকে না। প্রকাশও চলে যায়।

—প্রকাশ চলে গেছে?

—হ্যাঁ, চিরকালের মতো। সে-ও একাই গেল। আর ফিরবে না।

—তাই তুমি চলে যাচ্ছ?

—হ্যাঁ। তাইই যাচ্ছি। একাকিত্ব কী, প্রকাশ জানত উর্বী। ওর কেউ ছিল না। সমস্ত পৃথিবী ছিল ওর প্রতিপক্ষ। আজ সেই পৃথিবী আমারও কেউ নয়। তবু আমি শেষ বারের মতো তোমার কাছে এসেছিলাম।

উর্বী এবার তার স্যারের মুখ থেকে দৃষ্টি নামিয়ে নিল। নিচু স্বরে বলল— কারখানা তোমার মনে যে অবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে, তার জন্য আমাকে দায়ী কোরো না কৃষ্ণদা। তুমি আমাকে বিয়ে করো! আমি তোমার সমস্ত পাপ গোপন করে রাখব!

কৃষ্ণ আরও একবার হা হা করে হেসে উঠল। তারপর বলল— শুনেছিলাম প্রেম একটা সাচ্চা জিনিস। এখন দেখছি সেই প্রেমের মুখেও বানানো ডায়ালগ— কি না, আমার পাপ গোপন করবে তুমি, অমরেন্দ্র বসুর ভাগ্নী!

অদ্ভুত কঠিন আঘাতে কেঁপে গেল উর্বী। তার বাক্ রোধ হয়ে আসতে চাইল। সে দূষক পৃথিবীকে মর্মে মর্মে চিনতে পারছিল, এত আঘাতের পরও তার হতভাগ্য স্যারের জন্য সীমাহীন কষ্ট হচ্ছিল।

—তুমি জলের মতোই আজ আমাকে সন্দেহ করছ শ্রীকৃষ্ণ। তবু তোমাকে সেই জলই পান করতে হবে। তুমি যেখানেই যাও, তেষ্টা নিশ্চয় পাবে তোমার। আমাকে মনে পড়বে। বানানো কথার অভ্যেস আমার নেই, ওটাকে আমি প্রকাশের মাছির চেয়ে ঘৃণা করি। আমি খাঁটি শুভেন্দু। আমি শুদ্ধ। এ জীবনে তোমাকে ছাড়া কাউকে আমি জানি না। বলেই ফুঁপিয়ে উঠে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল উর্বী। তারপর কাঁদতে লাগল।

—আচ্ছা বেশ। বলে গলা নরম করে আলতো ভঙ্গিতে কৃষ্ণ উর্বীর একটি কাঁধ স্পর্শ করে। তাতে করে উর্বীর ফোঁপানি আরও বেড়ে যায়।

অতঃপর শুভেন্দু বলে ওঠে একই উচ্চারণে— আচ্ছা, বেশ, বেশ। আমি বুঝেছি।

উর্বী তার চোখের উপর থেকে দু'হাত সরিয়ে মৃদু ফুঁসে উঠে বলল— না, তুমি কিচ্ছু বোঝোনি, কিচ্ছু বোঝো না। শুধু জলেরই বুঝি সাপ্লিলিং দরকার হয়? ভালবাসাকে বুকে ধরবার জন্য তার বুঝি প্রয়োজন নেই?

কৃষ্ণ তৃতীয়বার হাহা করে হেসে ওঠে, কিন্তু এবারের হাসি অতীব প্রসন্ন এবং হালকা। বলে— আজকাল মেয়েদের মধ্যেও প্রেমের ধারণা অনেক বদলে গেছে।

—আমি ওই আলোচনায় যাব না স্যার। ধারণা অনেক বদল হতে পারে, তাতেই যে বস্তুটা বদলে যাবে, তা না হতেও পারে। অনেকেই নানাভাবে ধারণাকে বদলে চলেছে, কিন্তু আসল বস্তুটাকে বুঝতে পারেনি। আমি সেই দলে নেই। তোমাকে ভালবেসে যা পেয়েছি, তাইই আমার কাছে খাঁটি, তুমি না মানতে পার।

BanglaBook.org

—আচ্ছা বেশ।

—তুমি কথা দাও!

—আচ্ছা বেশ তো!

কৃষ্ণের মুখের দিকে চেয়ে বারংবার উর্বীর মনে হচ্ছিল, কৃষ্ণ কোথায় যেন তাকে ছেড়ে চিরকালের মতো পালিয়ে যেতে চাইছে। কৃষ্ণের দুঃসহ একাকিত্বকে ভয় পাচ্ছিল উর্বী। কৃষ্ণের দৃষ্টিতে সব হারানো অদ্ভুত নিঃস্বতা, বিহ্বল আতঙ্ক, পৃথিবী থেকে সরে পড়ার প্রতিজ্ঞা। জীবনের সব অর্থই যেন সে খুইয়ে বসেছে। মানুষকে সে আর বুঝি বিশ্বাসই করে না। তবু সে তার কাছে এসেছে শেষ বারের মতো।

উর্বী বলল— আগে কথা দাও, এই আমাদের শেষ দেখা নয়। তোমাকে বলেছি, প্রত্যেক ভোরে তুমি আমার কাছ থেকে একটি করে প্রণাম পাবে। ভালবাসার এই পূজাটুকুতে আমার ভারী লোভ মাস্টারমশাই। বলো, এই শেষ নয়।

—নয়ই তো।

—তাহলে অমন করে ভয় দেখালে কেন?

—বললাম এই জন্যে যে, পুলিশ আমাকে খুঁজছে। রাত্রে প্রকাশ খুন হয়ে গিয়েছে। আমি তাই পালিয়ে যাচ্ছি। তোমার হাতে দেওয়া স্যারকে লেখা চিঠিটা পুলিশের হাতে পড়ে যাবে উর্বী। বিশ্বাস করো, আমি এই খুন করিনি। আমি খুন করতে পারি না উর্বী। কিন্তু একদিন আমার হাতে অস্ত্র উঠে এসেছিল। কেউ করে না, কিন্তু তুমিও কি বিশ্বাস করো না! বলো তুমি! বলতে বলতে কৃষ্ণ নির্জন পথের উপর দুটি হাঁটু মাটিতে পেতে ভেঙে পড়ল এবং দু'হাত দিয়ে গাছের মতো উর্বীকে জড়িয়ে ধরে উর্বীর দেহে মুখ গুঁজে দিল।

দু'হাতে একটি শিশুরই মতন উর্বীকে জড়িয়ে ধরেছে কৃষ্ণ। তার দেহে ক্রমাগত মুখ ঘষড়াচ্ছে। নিশ্চয় উর্বীর স্যারের চোখে অবাধ্য অশ্রু এসে পড়ছে বারবার। ইরিথিজমের রোগীর মতো থরথর করে কাঁপছে কৃষ্ণ।

অত্যন্ত অসহায় গলায় কৃষ্ণ বলল— প্রকাশের মরা মুখে গ্যাসমাস্ক, চোখে আইপ্রোটেকটিং গ্লাস, হাতে গ্লাভস, পায়ে বুটজুতো— মেরে ফেলার জন্য তাকে এমন করে কে সাজিয়ে দিল উর্বী? কারা এমন পরিহাস করল তার সঙ্গে? বিশ্বাস করো, আমি কিছুই জানি না। আমি তাকে মারিনি। বলো, আমি মারতে পারি? কথা কেন বলছ না?

স্যারের বাহু দুটি ধরে নিজের মুখ আকাশের দিকে তুলে দম নেবার চেষ্টা করে উর্বী। মেঘলা আকাশে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে মেঘ। বুকের মধ্যে তেমনই কোনও মেঘপুঞ্জ পাকিয়ে চলেছে উর্বীর হৃদয়কে।

উর্বীর শরীর থেকে সমস্ত বল কে যেন কেড়ে নিয়েছিল। কৃষ্ণ তাকে ওইভাবে জড়িয়ে ধরে না থাকলে বোধহয় সে মাটিতে পড়ে যেত। এই মুহূর্তে প্রকাশের ভাত খাওয়ার দৃশ্য তার চোখের সামনে ভাসছিল। কীভাবে মাছিটা উড়ছিল দেখতে পাচ্ছিল উর্বী। মনে পড়ে যাচ্ছিল প্রকাশের আর্তচিৎকার। সভ্যতা তাকে কী করে একটি কারখানায় পরিণত করেছিল, দেখেছে উর্বী।

BanglaBook.org

কিন্তু এখন তাকে যে জড়িয়ে ধরেছে, যেন সেও মানুষ নয়। তাকেও গিলে খেয়ে ফেলেছে একটি কারখানাই, সে-ও আর মানুষ নেই। একটি কারখানাই যেন মানুষের মতো আর্তনাদ করছে।

—তুমি কেন কথা বলছ না উর্বী!

চোখ বন্ধ করে আকাশে মুখ তুলে রয়েছে উর্বী। তার চোখ বেয়ে নিঃশব্দে জল গড়িয়ে পড়ছে। ওই অবস্থাতেই সে বলে উঠল— আমি তোমাকে বিশ্বাস করি কৃষ্ণ। তোমার সমস্ত কথা, কাহিনী, স্বপ্ন বিশ্বাস করি।

—আমাদের একটি অস্ত্রাগার ছিল উর্বী।

—বিশ্বাস করি।

—সেটা এখনও লুকোনো রয়েছে।

—বিশ্বাস করি।

—আমি সেখানে যাব, আমার ব্যবহারের অস্ত্রটা নিয়ে আসব। তুমি দেখবে আমার গল্পটা মিথ্যা নয়।

—আমি সমস্ত বিশ্বাস করেছি। বিশ্বাস করেছি সেই কবে থেকে।

—ওই বন্দুকটা সারাজীবন আমাদের সঙ্গে থাকবে উর্বী। তুমি লুকিয়ে রাখবে।

—রাখব।

—রাখবে?

—নিশ্চয় রাখব। তুমি নিয়ে এসো।

গাছ-উর্বীকে ছেড়ে মাটি থেকে হাঁটু তুলে এবার উঠে দাঁড়াল কৃষ্ণ। তারপর চুপচাপ স্টেশনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। তার পিছুপিছু আসতে থাকল উর্বী। সে লক্ষ করে, কৃষ্ণ মুহূর্তে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে।

পিছু পিছু যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে উর্বী বলল— তুমি একটু দাঁড়াবে মাস্টারমশাই! আমি একটা জিনিস ভুল করে এসেছি। ঠিক আছে, তুমি স্টেশনে চলে যাও। প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চে গিয়ে বসো। ট্রেন এসে গেলে ছেড়ে দিও। আমি আসছি। বলে পাগলের মতো বাড়ির দিকে ছুটে গেল উর্বী।

স্টেশনে এসে একা বসে থাকতে ভয় পাচ্ছিল কৃষ্ণের। স্টেশন নির্জন। আজ রবিবার। জিতুর সঙ্গে আর দেখা হল না। মহিমা নিশ্চয় জেগে উঠেছেন। এতক্ষণ সবাই জেনে গিয়েছে, প্রকাশ নেই। মরে পড়ে আছে কারখানায়। নাকি এখনও কেউ জানতেই পারেনি?

দশ মিনিট বসে থাকার পর কৃষ্ণের মনে হল, বেশি দেরি করলে সে ধরা পড়ে যাবে। ধরা না পড়ে অস্ত্রটাকে উদ্ধার করে আনতে হবে। তবে এমন তো হতেই পারে, পুলিশ তাকে ধরল না। প্রকাশের সমস্ত ঘটনা চাপা পড়ে গেল। কিন্তু এই কল্পনার কোনও মানে হয় না। কারণ স্যারের চিঠিটাই তাকে প্রকাশের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে ফেলবে। চিঠিটাকে পুলিশ সন্দেহের চোখেই দেখবে। তা ছাড়া প্রশ্ন উঠবে, রবিবার ভোরে সে এভাবে পালাল কেন?

অথচ না পালিয়ে তার উপায় নেই। সে তো পাগল, তার মনের ব্যাপার কেউ

BanglaBook.org

বুঝবে না, তার স্বপ্নটাও কেউ বুঝবে না। সে খুনি প্রমাণিত হবে। এখন এ মুহূর্তে তার পাগলামি আর সে, আর কেউ নেই। রয়েছে তার অতীতের একটি আশ্চর্য অস্ত্রাগার, অস্ত্রের ব্যবহার নেই। সেই জায়গাটা একবার খালি দেখবে সে।

ট্রেন আসার শব্দ পেয়ে চমকে উঠল কৃষ্ণ। স্নান, প্রাতঃকৃত্য কিছুই হয়নি তার। শুধু মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এসেছে। শেয়ালদায় নেমে হোটেলে ঢুকবে। চান খাওয়া, সব করবে। তারপর আটটার লালগোলা ধরবে। সেই আগের মতো, তার আর চান খাওয়ার ঠিক থাকবে না। মাঠের মধ্যে ঘরবিহীন ফাঁকা আকাশতলে ঝোপের আড়ালে চলবে তার বাহ্যে পায়খানা। ওমর শাহ্ কি তাকে চিনতে পারবে? বিশ্বাস কি করবে, সত্যিই সে কেন গোয়াস বকুলতলায় এসেছে?

ট্রেন এসে স্টেশনে লাগল। পকেটে কৃষ্ণের রয়েছে মান্থলি টিকিট, শেয়ালদা থেকে সুভাষগ্রাম। উর্বীর জন্য অপেক্ষা না করে ট্রেনে উঠে পড়ল কৃষ্ণ। জানলার কাছে বসবা মাত্র চোখে পড়ল উর্বী পাগলের মতো ছুটে আসছে। কৃষ্ণকে দেখতেও পেয়েছে। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে উর্বী একটি মোটা লম্বা সাদা খাম কৃষ্ণের দিকে জানলা গলিয়ে এগিয়ে ধরেছে— এতে কিছু টাকা আছে শুভেন্দু। রেখে দাও, তোমার কাজে লাগবে। বলে হাঁপাতে থাকল উর্বী।

—তবু তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না উর্বী। আচমকা ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তে বলে উঠল কৃষ্ণ।

অতি অসহায়, কাহিল, দুঃখসিক্ত চোখে উর্বী বলল— তোমাকে তবু আমি বিশ্বাস করি। তুমি ফিরে এসো। আমি অপেক্ষা করব। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে।

সোর্স

গোয়াস বকুলতলায় কেউই কৃষ্ণকে চিনতে পারছে না, একটি অত্যন্ত মোটা কাওঅলা কৃষ্ণবকুলের তলায় বাতার মাচার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কৃষ্ণ। ওমরের বাক্স দোকানটা এখনও আগের মতোই ক্ষুদ্র, তবে দোকানটায় মালপত্র বেশ গুছিয়ে সাজানো। এখানে দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপারের সারের দোকানের লম্বা দেওয়ালে চোখ পড়ল শুভেন্দুর। সাদা দেওয়ালে লাল কালির অক্ষরে লেখা রয়েছে, 'দ্বিতীয় চম্বল হরিহর পাড়া, একদিনে আট খুন। মানুষ খুন হচ্ছে কেন জবাব দাও।'

এই দেওয়ালেই ওমর শাহ্ একদিন লিখেছিল, 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস'। এবং লিখেছিল, 'নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হোক, চিনের পথই মুক্তির পথ'। শুধু এই দেওয়াল লিখনের ফলে জায়গাটা হয়ে উঠেছিল পুলিশের চোখে সন্দেহজনক। কারা এই অগ্নিবাক্য লিখে রেখেছে পুলিশ-প্রশাসন হদিস করতে পারছিল না।

বাক্স-দোকানটার দিকে চাইল কৃষ্ণ। বাঁশ-বাতার মাচার এককোণে লাফ দিয়ে উঠে চেপে বসল। দোকানের মালিককে চেনা যায় না। সারামুখটা দাঁড়িগোঁফে এতই আচ্ছন্ন যে মানুষটাকে অদ্ভুত রহস্যময় দেখায়। ঠাণ্ডা চোখে নতুন আসা মানুষটাকে চেয়ে চেয়ে দেখছে বারবার। কোলের উপর কুলো রেখে দ্রুত হাতে দোকানদার বিড়ি বেঁধে

BanglaBook.org

চলেছে।

মাচায় দু'জন গোরুর ব্যাপারি বসে বিড়ি খাচ্ছে। দু'জনের মুখই চকচকে করে কামানো। এরা গঙ্গাপ্রসাদী ব্যাপারি। দু'জনের গালেই লম্বা ছাঁটা জুলফি, হাতে বালা এবং পাঁচন লাঠি। পরনে সেলাইহীন ফাড়া লুঙ্গি। গায়ে বেনিয়ান জ্যাকেট। এরা বাংলাদেশে গোরু চালান দেয়।

ওরাও সার-দোকানের দেওয়ালের দিকে মুখ করে রয়েছে, কিন্তু দেওয়ালের লিখন ওদের মনে কোনও প্রতিক্রিয়া ঘটাচ্ছে না, মনে হচ্ছে, ওরা দ্বিতীয় চম্বল সম্পর্কে যেন কিছুই জানে না অথবা ওই দেওয়াল-লিখন পড়তে পারছে না।

এই দু'জন ব্যাপারি এবং বাক্স দোকানের বিড়ি বাঁধা মালিকের দৃষ্টি তার দিকে আকর্ষণ করার জন্য কৃষ্ণ উচ্চারণ করে করে দেওয়াল-লিখন পাঠ করল।

একজন ব্যাপারি নতুন মানুষটার মুখের দিকে ঝুঁকে দেখে নিল একটু অতিরিক্ত মনোযোগ সহকারে, তারপর মন্তব্য করল— বাসি খবর।

দোকানদার এবার হাহা করে হেসে উঠে বলল—নতুন মানুষ। তাই মন দিয়ে পড়াশোনা করছেন। কোথা থেকে আসা হল আপনের?

দোকানদারের কণ্ঠস্বর শুনে কেমন চকিত হয়ে উঠল কৃষ্ণ। এই গলাটি তার চেনা মনে হল। কিন্তু এই রকম দাঁড়িগোঁফ তো ওমরের ছিল না। আগে সে বিড়িও বাঁধত না। দোকানদারের চোখ কেমন ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। ওই দৃষ্টি অপরিচিত কিনা বোঝার চেষ্টা করে কৃষ্ণ। তারপর জবাব দেয়—আমি আগে এখানে এসেছি। দফাদারের ছেলে মাস্টার আমার বন্ধু ছিল। এই দোকানটায় সে বসত। অনেক কাল আগের ঘটনা।

দোকানদারের বিড়ি বাঁধা হাত থেমে গেল। অবাক হয়ে কৃষ্ণকে দেখতে থাকল দোকানদার।

অন্য ব্যাপারিটি বলে উঠল—আপনি বন্ধুকে চিনতে পারছেন না? ওহে মাস্টার, তুমিও কি পারছ না, নাকি হে!

দোকানদার আবার হাত চালাতে শুরু করে দিল। অনেকক্ষণ কোনও কথাই বলল না। ব্যাপারি দু'জন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। এক সময় হঠাৎ দোকানদার বলে উঠল—আমি ভাবছি, আপনি কে? এ রকম কতই তো আসে। চেনে হয়তো আমাকে। কী নাম আপনের?

—কৃষ্ণ। আমি এই বকুলতলায় এই মাচার উপর শুয়েও থেকেছি। বুকের উপর বকুল ঝরে পড়েছিল, মনে পড়ছে।

—হতে পারে। বকুল তো ঝরেই, শুয়ে থাকলে বুকের উপরই পড়বে। শুনুন, আমি মাস্টার, কিন্তু আপনেকে আমি চিনতে পারছি না। মাফ করবেন, আপনেকে আগে দেখেছি বলে মনে করতেই পারছি না। স্মৃতির দোষ। সময়ের দোষ। ভাব-ভালবাসা মানুষের বেশিদিন মনে থাকে না। আপনি দুঃখ পাচ্ছেন না তো?

—পাচ্ছি বইকী ওমর। তুমি না চিনতে চাইলে আমাকে ফিরে যেতে হবে। আমি কিন্তু তোমার কাছেই এসেছিলাম।

BanglaBook.org

—আমার কাছে?

—স্রেফ তোমার কাছে।

—ওহ্! বলে আবার বিড়ি বাঁধায় মন দেয় মাস্টার। কথাই বলতে চায় না। ব্যাপারি দু'জন মনে মনে কৌতুকবোধ করে।

ব্যাপারি দু'জন ওমরের কাছ থেকে দু'বান্ডিল লালসুতোর বিড়ি কেনে। একজন বাচ্চা মেয়ে কোথা থেকে বয়ামের লজেন্স কিনে নিয়ে যায়। একটি নব্য যুবতী কিনে নিয়ে যায় মাথার সবুজ ফিতে। ওমর হাত দিয়ে মেপে ফিতে দেয়, বিড়িবাঁধা কাচি দিয়ে কেটে নেয়। ওমরের সাদাগেঞ্জিতে নেপালি মশচার গুঁড়ো লেগেছে।

কৃষ্ণ ওমরের তৎপর দু'খানি হাতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলল—তুমি তো আগে বিড়ি বাঁধতে না ওমর!

মাস্টারের তোলা নাম ওমর। ব্যাপারি দু'জন বুঝতে পারল, আগন্তুক মাস্টারের অচেনা নয়, কিন্তু মাস্টার ইচ্ছে করেই ভদ্রলোককে চিনতে চাইছে না।

ওমর বলল—গরজে মানুষ আলকাতরা খায়। আমি তো বিড়ি বেঁধে খাচ্ছি। আপনের আপত্তি আছে?

এই সময় পিচের রাস্তার উপর শেখপাড়াগামী বাস এসে দাঁড়ায়। এটা হল বকুলতলা স্টপ। ব্যাপারি দু'জন ছুটে গিয়ে বাস ধরল। দুপুরের বাস, কিন্তু ভিড় খুব। ভিড় ঠেলেই পাদানিতে পা রাখল, তারপর ব্যাপারিরা বাসের মধ্যে ঢুকে গেল।

বাস ছেড়ে চলে যেতেই জায়গাটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ঘুঘুর ডাক ছাড়া দুপুরের আর কোনও শব্দ কানে আসে না। ঘুঘুর ডাক চিরকালই বিষণ্ণ। গ্রামবাংলার সহস্র দুঃখের প্লুতস্বরা ডাক দেয় এই পাখিটা। এই ডাক শুনতে শুনতে প্রকাশের মুখটা চোখের উপর উঠে আসে কৃষ্ণের।

—বাবা আছেন? ছোট করে শুধায় কৃষ্ণ।

—হ্যাঁ আছে। মরে নাই। দেখে কম, শুনে আরও কম। দফাদারি চাকরিও আর নাই। ইবার কহেন, ইখানে কেন এসেছেন? শুষ্ক গলায় প্রশ্ন করল ওমর।

কৃষ্ণ ঈষৎ আশ্বস্ত হয়ে বলল—তোমার মনে আছে মাস্টার! তোমাদের একটা ঘানির গাছ টানা গাইগোরু ছিল। দুধ দিত না, বাচ্চা দিত না, গাছে জুতে ছিলে। একদিন জবাই হয়ে গেল। তার আগে ঠুলি খুলে নদীর ধারে চরতে দেওয়া হয়েছিল। যেদিন ওটা পৃথিবীর প্রথম আলো দেখল, সেদিনই ওর জবাই হওয়ার দিন, চরতে চরতে নদীর জলে পড়ে গিয়েছিল, বাঁশ দিসে ঠেলে জল থেকে তোলা হল, তারপর কেটে ফেলা হল। গোরুর একচোক কানা ছিল। মনে পড়ে?

—তারপর আর গাছ ঘোরেনি।

—তুমি গোরুর চামড়ায় নুন মাখিয়ে সাইকেলের কেরিয়ারে করে গঞ্জে চলে গেলে। চামড়া বেচে কিনে আনলে নতুন জুতো আর জামা। তাই পরে মিটিঙে এলে, গোপন বৈঠক। আমার পাশে বসে, জানতে চেয়েছিলে, তোমাদের কোনও পাপ হয়েছে কিনা। তোমরা বাউল, গোমাংস খাও না। মনে পড়ে?

—এই সব কথার আজ কী দরকার! আপনি কেন এসেছেন বলুন। আগেই বলে

BanglaBook.org

রাখি, এখানে আপনার শেলটার হবে না। আমি পারব না। আপনি এখনও দল করছেন?

—না।

—কী করছেন?

—ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কাজ নেই।

—তাহলে এসেছেন কেন? জেল থেকে বেরিয়ে কোনও কাজ পাননি? শুনেছিলাম, আপনেকে পুলিশে ধরেছে, জেলও হয়েছে। জীবনটা কী হল, বলুন দেখি? পষ্ট শুনুন, আজকাল আপনাদের দেখলে আমি আর সহ্য করতে পারি না। ভিতরে ভিতরে কী যে হয়, বলতে পারব না।

—তুমি আমাদের সোর্স ছিলে মাস্টার।

—সেই সোর্স ঢুঁড়তে এসেছেন আজ? আজ আর হবে না। যান, ফিরা যান।

ওমরের আবার হাত চলতে শুরু করে। কৃষ্ণ এরপর আর কী বলবে ভেবে পায় না। কৃষ্ণ চুপ করে আছে দেখে এক সময় ওমর বলে উঠল—দেয়াল লিখন আর একবার ভাল করে পড়ে বাড়ি ফিরা যান । ব্যাপারি দুইটাকে দেখলেন। গঙ্গাপ্রসাদী গোরুর দালাল। গঙ্গা প্রসাদে প্রথম কারখানা বসে।

—কারখানা?

—হ্যাঁ। মাস্কেট-বন্দুকের কারখানা। বোমা তৈয়ারির কারখানা, বিহার থেকে লোক এল। একটা লোক আর একটা মেয়েলোক। ওরাই সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিলে। এখন এই জেলায় কয়খানা কারখানা পুলিশ জানে না। বোমা বাঁধাটা এই জেলার কুটির-শিল্প দাদা। বিড়ি আর বোমা। ওই দেয়াল-লিখনে কোনও ভুল নাই।

দেওয়াল-লিখনের দিকে চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল কৃষ্ণ। বিমূঢ়স্বরে বলল—মানুষ খুন হচ্ছে কেন। জবাব চাওয়া হচ্ছে।

—হ্যাঁ, হচ্ছে। কিন্তু জবাব কে দেবে? শুনুন, যারা দেওয়াল লিখেছে, তারাই খুন করেছে। এখানে খুন করার পর দেওয়াল-লিখন করা হয়। খুন করে থানাকে মিট খাওয়াতে হয়।

—মিট?

—হ্যাঁ। চোরা-ব্যবসার টাকা যায় থানাতে। সীমান্ত-জেলা, এখানে চোরা-ব্যবসা হল একটা অর্থনীতি। চাষির একটা অর্থনীতি, চোরা কারবারিদের একটা পাল্টা অর্থনীতি, পাশাপাশি, গলাগলি হয়ে আছে। আপনের আপত্তি আছে?

—খবরের কাগজে, একটু আধটু পড়েছি।

—কাগজে আর কতটুকু লেখে? আপনি বিশ্বাস করবেন, এই আমি মাস্টার, দু'বছর বোমা বেঁধেছি। না বেঁধে থাকা যাচ্ছিল না।

—কেন?

—এখানে বাঁচতে হলে, মাস্কেট-বন্দুক কাঁধে ঝুলিয়ে বাঁচতে হবে। চম্বলের নিয়ম। আমি নিজে চোরা-মালের কারবারিকে শেলটার দিই। সমস্ত গ্রামগুলো পদ্মা পর্যন্ত চোরা মাল বইবার রাস্তা দিয়ে সাজানো হয়েছে। গ্রামগুলো ভাগ করা।

BanglaBook.org

এক-একটা অঞ্চলের মাস্কেট-সর্দার আছে। সে হচ্ছে, হিরো। দরকার হলেই মানুষ জবাই করে। এই হিরোরা বিভিন্ন পার্টির মেম্বার। বি. এস. এফের সঙ্গে এদের বোঝাপড়া আছে। থানা এবং নেতার সঙ্গে আছে। পঞ্চায়েত ভোট করতে হলে দলগুলো এদেরই ধরে। এখানে কালো টাকা দিয়ে রাজনীতি হয়। আচ্ছা, এবার আপনি আসুন। বলেই আবার বিড়ি বাঁধায় মন দেয় ওমর।

—তুমি অনেক বদলে গিয়েছ ওমর শাহ্। বলে ওঠে কৃষ্ণ। এমন সময় পুলিশের জিপের শব্দ ভেসে আসে পাকা সড়কের উপর দিয়ে। জিপটা এসে বকুলতলায় বাক্সদোকান থেকে খানিকটা দূরে একটি ঝাঁকড়া দেবদারুর লম্বা ছায়ায় দাঁড়িয়ে পড়ে। কেমন সতর্ক হয়ে ওঠে ওমর। বিড়ি বাঁধা থামিয়ে দেয়। কোল থেকে কুলো নামিয়ে ফেলে।

দোকান থেকে নেমে জিপটার কাছে চলে যায় ওমর শাহ্। জিপের ভিতর থেকে বেরিয়ে রুল হাতে করে পথের পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছেন থানার বড় দারোগা। ওমর একেবারে দারোগার বুকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর আঙুল তুলে তুলে কী সব দেখাতে এবং বোঝাতে থাকল। দারোগা মাথা নেড়ে নেড়ে কীসের যেন হদিস নিচ্ছিলেন।

মিনিট পাঁচসাত পর কথা শেষ করে বাক্স-দোকানে ফিরে এল ওমর শাহ্। উপরে উঠে বসে কুলো কোলে তুলে নিয়ে মন দিয়ে বিড়ির পাতা জড়াতে থাকল। জিপটা ছেড়ে চলে গেল।

পুলিশ দেখে কৃষ্ণ মনে মনে বেশ খানিকটা শঙ্কিত হয়ে পড়লেও, নিজের কোনও দুর্বলতা প্রকাশ করে না। ফের ওমরকে প্রশ্ন না করেও পারে না। একটা ঢোঁক গিলে জানতে চায়—পুলিশের সঙ্গে তোমার বেশ সদ্ভাব দেখছি, কী জানতে চাইল?

—আমার কাছে আসে। সমাজ বিরোধীদের তল্লাশি নেয়। আমার হাত দিয়ে মিট খায় পর্যন্ত। কিন্তু থানা এখন অনেক সমঝে চলছে। নতুন একজন পুলিশ সুপার এসেছে, তার কাজই হল সমাজবিরোধীদের ধরে নিয়ে গিয়ে ঠ্যাঙানো। কোথায় কোথায় কারখানা রয়েছে তার জোর তল্লাশি চালাচ্ছে। থানা এখন মিট নিতে ভয় পাচ্ছে।

—এক্ষেত্রে তোমার কাজ কী?

—আমি তো সমাজবিরোধীদের মধ্যেই ছিলাম। তাতেও অনেক খেসারত দিতে হয়েছে। আমার বোনের টাটকা বিয়ে হয়েছিল। বউ-ভাতের দিন খানাপিনা হচ্ছে, এমন সময় ফজরের দল এসে হামলা করল। ভগ্নীপতিকে তুলে নিয়ে গিয়ে চরের মাঠে নিকেশ করে দিল। ভাইকে মেরেছিল পুলিশ, ভগ্নীপতিকে মারল অ্যান্টিসোশাল। বোনটার মুখের দিকে আজকাল আর তাওয়া যায় না। বাপ একদিন আবু বকরের লাশ আগলে বসেছিল উঠোনে। লণ্ঠন জ্বলল সারারাত। আমরা কাঁদতে পর্যন্ত পারিনি। ভগ্নীপতি মরল, তা-ও আমরা চুপ করে থেকেছি। বোনটা আমার পাগল হয়ে গেছে। বলে ওমর দু'চোখের অশ্রু পল্লব দিয়ে চেপে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মাথা নিচু করে বিড়ির পাতায় পাক দিতে থাকল।

BanglaBook.org

মাস্টারের কথা শুনতে শুনতে কৃষ্ণের বাক্‌রোধ হয়ে আসে। ভিতরে ভিতরে সে তুমুল বিচলিত হয়ে পড়ে। সে বুঝতে পারে, ওমর আর সেই ওমর নেই। যে মাস্টার একদিন গোরুর খাল বেচা পয়সায় সেকেন্ড সি-সি-র গোপন বৈঠকে নতুন জামা-জুতো পরে এসেছিল এবং জিজ্ঞাসা করেছিল, তাদের পাপ হল কিনা; তারা বাউল—সেই অনুভূতিশীল উদারচিত্ত কিশোর কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। দাদা বকরের মৃত্যুকে একদিন সে শহিদের মৃত্যু ভেবে অশ্রু-সংবরণ করেছিল, আজ সেই মৃত্যুর কোনও অর্থ সে বার করতে পারে না। কৃষ্ণের এতকাল বাদে আবির্ভাবকে মাস্টার অবাঞ্ছিত মনে করছে। সে চাইছে না যে, কৃষ্ণ এখানে থাকে।

কৃষ্ণ স্বল্পস্ফুট গলায় বলল—আমিও পাগল হয়ে গেছি মাস্টার। খুব অসুস্থ আমি। আমাকে সাহায্য করো।

—কোনও সাহায্য হবে না কৃষ্ণদা। আপনি চলে যান। শুনুন, আমি অপারগ। বলে ওমর যথেষ্ট গম্ভীর হয়ে গেল।

দুপুর দুটো নাগাদ বাক্সদোকান বন্ধ করে দিল ওমর। শেকল জড়িয়ে তালা ঝুলিয়ে দিল। তারপর পথের দিকে পা বাড়িয়ে বলল—আমি এখন বাড়ি যাচ্ছি, চান-খাওয়া করতে। আড়াইটায় একটা বাস আছে। সেইটে ধরবেন। আর কখনও এখানে আসবেন না।

কৃষ্ণ অসহায় গলায় বলল—না, আসব না। একটুখানি তোমার বোনটাকে দেখতাম মাস্টার। কত আগে দেখেছি, তখন খুবই বাচ্চা।

—না, না, খবর্দার। আপনে আমার বাপমায়ের সামনে যাবেন না। বকরকে মনে পড়বে, বাপ চেঁচাবে। মা ডুকরোবে। আপনে ময়নাকে দু'বছরের বাচ্চা দেখেছেন। আপনেকে ময়না চিনবে না। পাগলামি রাখুন আপনের। ফিরা যান। কী দরকার? বলে ওঠে ওমর।

কৃষ্ণ বলল—বেশ। তা হলে আমাকে অস্ত্রাগারটা দেখাও।

—অস্ত্রাগার। কারখানা?

—না, না, যেখানে আমরা পুলিশের কাঁধ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া বন্দুকগুলো জমা রেখেছিলাম। আমাকে পাহারা দিতে হয়েছিল। তোমার মনে নেই?

—হাঃ হাঃ হাঃ! আপনে সত্যিই পাগল হয়েছেন কৃষ্ণদা। শুনেছি এই রকম পাগল অনেক মানুষ হয়েছে। ভুল হিংসে, ভুল অস্ত্র আগলানোর চাপ সহ্য করতে পারেনি।

—ভুল নয় মাস্টার। তুমি আমাদের সোর্স। দফাদারের ছেলে তুমি। পুলিশের গতিবিধি সব তুমি জানতে।

—আজও জানি কৃষ্ণদা। আমার ছোটভাই আসগার এখন হোমগার্ড। আমি দালাল। যদি আর একখানা কারখানা উদ্ধার করে দিই, একটা লোককে হাতেনাতে ধরাতে পারি, কনস্টেবলের চাকরি আমার বাঁধা। আমি পুলিশে না ঢুকলে এই হিংসার দরিয়ায় পুরো পরিবার আমার ভেসে যাবে। ফজররা আমার দিকে মাস্কেট তাক করে আছে। আমি পুলিশের চর। আপনের সোর্স কোথায়? হেঁহ্! বলে কি না অস্ত্রাগার!

—আমি বিশ্বাস করি, এখনও আছে।

BanglaBook.org

—আছে তো, ঢুঁড়ে দেখুন! শেষে এই রকম পাগল হয়ে গেলেন কৃষ্ণদাদা! কী করলেন! জেল খাটলেন। তারপর পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! ছিঃ!

এইরকম 'ছিঃ' শুনে মাচা থেকে মাটিতে নেমে পড়ে কৃষ্ণ। ওমরের একটি হাত জড়িয়ে ধরে বলে—অমন করে ছিঃ বোলো না ওমর। প্রকাশ অমনি করে বলত। ও বাঁচল না। তুমি আমার সাক্ষী। তুমি সোর্স। তুমি আমাকে আশ্রয় দাও।

—প্রথমেই আপনেকে বলেছি এখানে শেলটার হবে না। প্রকাশ কে জানি না। কেন মরল জানি না। আমাকে বাঁচতে হবে। আপনে কেন ফালতু হাঙ্গাম করতে এসেছেন? মাটি আর নাই। আপনের মাটি ফুরিয়ে গেছে। সেই গ্রাম নাই দাদা। যান চলে যান। হাত ছাড়ুন। বলে একটা ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ওমর হনহন করে পথে চলে গেল। সড়ক ধরে চলে গেল গ্রামের দিকে।

অনেকক্ষণ অবাক হয়ে ওমরের চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে রইল কৃষ্ণ। কিছুক্ষণ বাদে মাচার কাছে সাতনলা সঙ্গে করে দু'জন কাকমারা এল। এদের আগে দেখেছে কৃষ্ণ, এই কাকমারাদের।

কৃষ্ণ ওদের দেখেই বলে উঠল—কটা মেরেছ কাক? সাতটা। নটা। অনেক।

—জি হাঁ। অনেক। কাকের ডেরা হয়েছে গাঁওগুলান। গাঁয়ে গাঁয়ে মানুষ মরছে। কাক বাড়ছে। ইনসান মরলে কাকপক্ষী বাড়ে। লাশ বাড়লে, এই পক্ষী বাড়ে। কোচ মারি, পক্ষী ফুরায় না। কাক চেঁচালে শকুন নামে। জি, অনেক। বলে গাঁজা টানতে বসল লোক দু'টো।

শিউরে উঠল কৃষ্ণ। প্রচুর কাকের ডাক একসঙ্গে শুনতে পেল। গাঁজায় টান দিয়ে লোক দু'টো হা হা করে হাসতে লাগল। মাচায় উঠে শুয়ে পড়ল কৃষ্ণ। নীচে কাকমারারা আয়েস করছে, মরা কাক ঝুলছে সাতনলায় দড়িবাঁধা অবস্থায়। সেই দিকে চাইলে পৃথিবীর জন্য মায়া হয়। মানুষের পচন কোথাও বাকি নেই। শকুন সর্বত্র আছে। বাউলের ডেরায় হিংসা ঢুকেছে কারখানা ধোয়া জলের মতো। আধ ঘণ্টা মতন বিশ্রাম নিয়ে কাকমারারা চলে গেল। ঘুমোনোর চেষ্টা করেও কৃষ্ণ একফোঁটা ঘুমোতে পারল না। ব্যাগে পাউরুটি-কলা আছে। খিদেও পেয়েছে। চান হয়নি। একখানা নতুন মুর্শিদাবাদি গামছা কিনেছে এবং একখানা লুঙ্গিও। মাচা থেকে ব্যাগ কাঁধে করে নামল কৃষ্ণ।

তারপর নদীর দিকের সেই ছোট জঙ্গলটার দিকে রওনা দিল। সেই অলৌকিক মসজিদটা তার দেখা দরকার।

ছোট নদীর কাছে এসে কৃষ্ণ বিমূঢ় হয়ে গেল। নদী খাঁ খাঁ করছে। একফোঁটা জল নেই। নদীর বুকে কোথাও কোথাও ধানের বীজতলা করা হয়েছে। তাই ছিটেছাটা সবুজ চোখে লাগে। নদীতে নেমে চান করে নেবে ভেবেছিল কৃষ্ণ। হল না। অলৌকিক সেই মসজিদের উদ্দেশে একটি বিশেষ পথ ধরে এগোয় সে। মসজিদের কাছাকাছি একটি পুকুর চোখে পড়ে। তলায় সামান্য জল পড়ে আছে, এতেই কাকচান করে নেয় শুভেন্দু। পাড়ে বসে কলা-পাউরুটি খায়।

পাড়ে বসেই খেতে খেতে মসজিদটার দিকে চেয়ে থাকে কৃষ্ণ। চারিদিকে ধু ধু

BanglaBook.org

নির্জনতা। গাছের পাতা খসলে শোনা যায়। জিয়ালা, বহড়া, গাব, নারকেল, খেজুর গাছের ফাঁক দিয়ে লম্বা ঘাসঢাকা মসজিদটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ওমরের বলা কিছুক্ষণ আগের সমস্ত কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। কৃষ্ণকে প্রথমে ওমর চিনতেই চাইল না। সে এখানে থাকে, কিছুতেই চাইছে না মাস্টার। গ্রামগুলো কাকের আড্ডাখানা হয়েছে, শকুন বসে। ভেবে কৃষ্ণ পাতলা করে আপন মনে হাসে। এবং আরও হাসি পায়, যখন ওমরের উক্তি মনে পড়ে। মাস্টার এখন পুলিশের সোর্স, দালাল। একটি অস্ত্রের কারখানা উদ্ধার করে দিতে পারলে তার কনস্টেবলের চাকরি হবে। ফজররা তার দিকে মাস্কেট তাক করে রয়েছে। এখানে কালো টাকার রাজনীতি হয়। বউভাতে দামাদ গুলি খেয়ে মরে। যেন কৃষ্ণ এখন হিংসার প্রলম্ব ছায়ায় বসে রয়েছে, এ এক অভিশপ্ত চম্বল।

সেই মাটি আর নেই। সেই মাস্টারও আর নেই। ভাবতে ভাবতে খাওয়া শেষ করে মসজিদটার খুব কাছে চলে আসে কৃষ্ণ। ভেতরে যাবে কিনা ইতস্তত করতে থাকে। এই সরু পথটায় উবু হয়ে বসে মাস্টার গোরুর ডাক ডাকত। হাত চোঙা করে ডাকটাকে মসজিদের তলার ফোঁকরের দিকে ঠেলে দিত। তিনবার ডেকে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে গেলে মসজিদের ভেতর থেকে কৃষ্ণ বুঝতে পারত, ঘোর সন্ধ্যাকালে তার জন্য খাবার এনেছে দফাদারের ছেলে। মসজিদের ভেতর থেকে সন্ধ্যা আরও গাঢ় হলে বেরিয়ে আসত কৃষ্ণ। মাস্টারও মসজিদটার দিকে ধাপে ধাপে অনেকখানি এগিয়ে যেত। তারপর দু'জনে মুখোমুখি হত ঘাসের জঙ্গলের ভিতর। কাপড় দিয়ে বাঁধা খাবারের কেরিয়ার কৃষ্ণের হাতে তুলে দিত ওমর শাহ্।

একদিন খাবারের কেরিয়ার কৃষ্ণের হাতে তুলে দিয়ে ওমর বলল—চারপাশে পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে কৃষ্ণদা। এখানকার সব মজুদ মাল গোরুর গাড়ির নাড়ার তলায় ঢুকিয়ে বেঁধে নবগ্রাম চালান হবে। পুলিশ দেখবে গোখাদ্য যাচ্ছে আর রাঢ় থেকে ধান আনতে যাচ্ছে গাড়োয়ান। গাড়ির মোহড়ায় বস্তায় ভরা মিঠা কুমড়াও যাবে। ছেঁড়া বস্তা, যাতে পুলিশ কুমড়ার গা দেখতে পায়। নবগ্রাম আমাদের মুক্ত-এলাকা। তুমিও সেখানেই চলে যাবে। সত্যসনাতন আলি পির ঘুমায়ে আছে থাক। আমরা আর নাড়াব না। ডাক্তারদা বলেছে। তৈয়ারি থাকো, তোমাকে যেতে হবে। এই অঞ্চল এখানে আমরা সামলাতে পারব না।

নবগ্রাম যাওয়ার দিনক্ষণও স্থির হয়ে গিয়েছিল। ঠিক তার আগে সেই মারাত্মক অঘটন ঘটে গেল। বকর নদীর চরে পুলিশের গুলিতে খুন হয়ে গেল। দিন গেলে রাত্রিতে কৃষ্ণের যাত্রা। হল না। সব কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গেল। পৃথিবীর আবর্তনই যেন থেমে পড়েছিল। রাতদুপুরে টর্চের আলো ফেলে ফেলে তারিককে সঙ্গে করে কৃষ্ণ মসজিদ থেকে ঘাসপথ পেরিয়ে দফাদারের বাড়ি আসে। বাড়ির কাঁঠাল গাছের তলায় দাঁড়ায়। উঠোনের এককোণে ডালিম গাছের তলায় একটি শেতল পাটির উপর শুইয়ে রাখা হয়েছে বকরের মৃতদেহ। মৃতদেহের মাথার কাছে মাটির উপর থুতনি হাঁটুর উপর রেখে চোখ বুঁজে বসে রয়েছে দফাদার। লাশের সিথানে লণ্ঠন জ্বলছে। হাঁ মুখের উপর ঝুলে রয়েছে একটি ডালিম। বকর যেন সেটি খেতে চাইছে।

BanglaBook.org

এই দৃশ্যের ধাক্কা সহ্য করতে পারেনি কৃষ্ণ। তারিককে হাত ধরে টেনে নিয়ে রাস্তায় চলে এসে উত্তেজিত গলায় বলেছিল—আমি আর মসজিদে যাব না তারিকুল। তুমিও একা পারবে না। রাত্রে একা থেকো না। বাড়ি গিয়ে শোও। তোমাকে পুলিশে ধরবে না। আমি বাইরের লোক। এখানকার শত্রুরা আমাকেই সন্দেহ করেছে। আজ রাতেই আমার নবগ্রাম যাওয়ার কথা নিশ্চয় জান। আমি চলে যাচ্ছি।

কৃষ্ণ আর দাঁড়ায়নি। বকুলতলা থেকে ধীরুবাবুদের লরি মাঝরাতে কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছিল, সেই লরির পিছনে চুপ করে উঠে পড়েছিল কৃষ্ণ। ওমরই সেই চলে যাওয়ার সাক্ষী। চোখে ওমরের জল। রাত্রির বাতাসে হাহাকার। দপদপ করে আগুনের মাংস ঝরানো একটি নক্ষত্র জ্বলছিল।

কৃষ্ণ ফিরে এল কলকাতায়। ডাক্তারদাকে, অরুণাংশুকে বলে আসা হল না। এ কাজ মোটেও সে ভাল করল না। মাস্টারই কেবল জানল, কৃষ্ণ ফিরে গেছে। আর কখনও হয়তো গাঁয়ে ফিরবে না। ফিরবে না এই বকুলতলায়। কৃষ্ণের চোখেমুখে যে ঠাণ্ডা আতঙ্ক দেখেছে ওমর, তা দেখেই বুঝেছে কৃষ্ণ পালিয়ে গেল। বকর মরল, রইল তার স্ত্রী আর ছোট্ট মেয়েটি, মুনিয়া। ভাইয়ের স্ত্রী আর সন্তান ওমরের কাঁধে সরাসরি না চাপলেও, প্রৌঢ় দফাদারের কাঁধে চেপে পড়ল সেই থেকে। এখন তারা কোথায় জানে না কৃষ্ণ।

লণ্ঠন জ্বলছে, ছেলের লাশ পাহারা দিয়ে রাত্রি জাগছেন বাপ—এই দৃশ্য ক্ষমা করল না কৃষ্ণকে। অপরাধী এই মনকে একা সঙ্গী করে জেল খেটেছে শুভেন্দু। সঙ্গে ছিল আরও একটা মনস্তাপ। সে পার্টিকে না জানিয়ে অস্ত্রগুলি ফেলে চলে এল। বিপ্লব শুকিয়ে গেল পথের উপর। কৃষ্ণের মনে জ্যান্ত হয়ে জেগে রইল একটি নমাজ-না-হওয়া পিরের কবরঅলা মসজিদ। যেখানে ক্রমাগত রব উঠছে, আল্লাহুমা আমেন। ওই অস্ত্রাগারটা কখন রক্তের ভিতরে ঢুকে গেল কৃষ্ণের।

পাগল কৃষ্ণ কেন বিশ্বাস করতে চাইছে না, এই সব গ্রামে কাক ছাড়া কিছু নেই।

দু' হাত চোঙা করল কৃষ্ণ। তারপর সে গোরুর ডাক ডাকার চেষ্টা করল। বাগালরা সন্ধ্যার মুখে ঘাসের জঙ্গলে গোরু ঢুকে মসজিদ পর্যন্ত চলে গেলে গোরুকে ঘরে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য হাত চোঙা করে গোরুর হাম্বা দিত। এই হাম্বাই হয়েছিল মাস্টারের দেওয়া সংকেত।

কৃষ্ণ গোরুর ডাক ডাকতে গিয়ে নিজের গলার আওয়াজ শুনে ভয়ে ইরিথিজমের রোগীর মতো কেঁপে উঠল। তার মনে পড়ে গেল প্রকাশের মুখ। বকরের মৃতদেহ এবং একটি জলপরীকে।

—উর্বী! এ আমি কোথায় এলাম। বলে মহাশূন্যে উত্থিত উৎক্ষিপ্ত আর্তনাদ ভেসে গেল। কৃষ্ণ একা হাউমাউ করে এই ক্ষুদ্র অরণ্য-পথে কেঁদে উঠল।

হাম্বা ডেকে উঠে এই নির্জন ক্ষুদ্র অরণ্যপটে নিজেকে পাগল প্রকাশ ছাড়া কিছুই মনে হল না কৃষ্ণের। তার মাথার মধ্যে কারখানা চলতে লাগল। সহস্র মক্ষিকার একঘেয়ে টানা তীব্র গুঞ্জনে মাথা ভরে গেল।

BanglaBook.org

আকাশ মেঘহীন। তীব্র দাহে পুকুরের জলের রং ইস্পাতের মতো। জলে চাইলে মাথার মধ্যে সূর্য ঢুকে যায়। ভেজা গামছাটা ভাঁজ করে মাথায় চাপায় কৃষ্ণ। তার জিভ বেরিয়ে পড়ে। ডালে ডালে অজস্র কাক বসেছে। ঠোঁট হাঁ করে ধোঁকাচ্ছে। তাদের গলার ধুকধুকানি লক্ষ করে শুভেন্দু। একটি কাক খাঁ করে ডেকে ডাল থেকে মাটিতে পড়ে মরে গেল। সামনেই পড়েছে কাকটা। পড়ে গিয়ে একটুও নড়ল না। কৃষ্ণ ছুটে এল কাকটার কাছে। লম্বা ঘাসের মধ্যে পড়ে রয়েছে; সামান্য কাত হয়ে ঠ্যাং মেলে মুখ হাঁ করে। বুকের কাছটা সাতনলার কোঁচে ফোঁড়ানো, মাংস ঠেলে বেরিয়ে পড়া। মানুষও এইভাবেই মরে।

আমিও কি এইভাবে মরে যাব উর্বী, হে সত্য পির, আমার অস্ত্রটা কোথায়? আমার জীবনের এখনও একটি নৈশ-অভিযান বাকি রয়ে গেছে। আমি যা ফেলে গেছি, আমাকে আজ তা বয়ে নিয়ে যেতে হবে।

মসজিদটার এদিকের দেওয়ালের ফোঁকরটার কাছে এসে দাঁড়ায় শুভেন্দু। মাথা নিচু করে ভেতরে গলিয়ে দেয় নিজেকে। ছাদ নেই। রোদে স্পষ্ট সমস্ত মেঝে এবং ভেতরের দেওয়াল। দোলনা-সমাধি অস্ত্রে সুসজ্জিত। কিন্তু সমস্ত অস্ত্রই অন্য রকমের। একটা একটা করে প্রত্যেকটা অস্ত্র স্পর্শ করতে থাকে কৃষ্ণ। হঠাৎ এক সময় মনে হয়, এই একটি অস্ত্র পুলিশের কাঁধ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া। এটি এখানে থেকে গেল কী করে?

এ স্থান তা হলে কী? অস্ত্রাগার নাকি কারখানা! এখানেই প্রস্তুত হয় এই সব গ্রাম্য মাস্কেট? বুকটা শুকিয়ে গেল কৃষ্ণের। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার আশ্চর্য উৎকট সংঘাতে সে চিৎকার করে উঠল—আমি এখানে আসতে চাইনি উর্বী। কিন্তু এই বন্দুকটা তো আজকের নয়, এ তো এই কারখানায় তৈরি নয়। বন্দুকটাকে আলাদা করে হাতে তুলে নেয় কৃষ্ণ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। দেখতে দেখতে মেঝের উপর বসে পড়ে। বারবার মনটা বলে ওঠে—এ আজকের নয়। এর শরীর আলাদা, চিহ্ন আলাদা, সিস্টেম আলাদা, রং ভিন্ন, এর ট্রিগারও ভিন্ন, এর সমস্ত ছাপ পুরনো। অতএব এটাই কৃষ্ণের বন্দুক।

মেঝে থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় কৃষ্ণ। কাঁধে ঝোলায় বন্দুকটাকে। এটি থ্রি নট থ্রি জাতীয় ভারী জিনিস। লাইট মেসিন গান নয়, পাবলিক এই জবর অস্ত্র ব্যবহার করে না। সময়ের স্পর্শও লেগেছে এর শরীরে। লুম্পেন ইন্ডাস্ট্রি কোনও জঙ্গলের বড় খাদে বসে এই বস্তুটাকে বানায়নি, এ প্রস্তুত হয়নি অলৌকিক মসজিদটার অভ্যন্তরে। এটি সেই গাঢ় কালসীমায় অন্ধ হিংস্র প্রশাসনের স্কন্ধ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এ কৃষ্ণেরই বন্দুক। কিন্তু কী করে এখানে রয়ে গিয়েছে বোঝা যায় না।

কৃষ্ণ সে কথা বুঝতেও চায় না। সে শুধু উর্বীর জন্য বন্দুকটা বয়ে নিয়ে যাবে। বয়ে নিয়ে যাবে এই জন্য যে তার বয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। মধ্য রাতে গোরুগাড়ির খড়গাদার মধ্যে লুকিয়ে এ যেতে পারত নবগ্রাম। পাগল যখন কোনও কিছুকে সাব্যস্ত করে, এই ভাবেই করে। তার অতীত স্মৃতিকক্ষে অপরাধী এভাবে ফেরে। যা

BanglaBook.org

সে করেনি, করতে পারেনি, অথচ করতে চেয়েছিল, তাকে সে সমাচ্ছন্ন স্মৃতির ধূসর কোষে জাগিয়ে তোলে। সে দেখে না এই নিকষ কল্পনার বাস্তব, দেখে না এ দিয়ে আসলে কী হয়! মানুষের কাজ দিয়ে তার কাজকে মাপা যায় না। ক্রমশ কৃষ্ণ বিশ্বাস করতে শুরু করে এ তারই আলো ঝলসিত অস্ত্র, সে একজন কল্পনার ইমাম মেহেদি অথবা পাহাড়বন্দি আবু হানিফা। অকস্মাৎ কৃষ্ণ একটি হয়দরি হাঁক দিয়ে ওঠে।

তারপর গলা খাদে নামিয়ে কৃষ্ণ বলে— দ্যাখো শুভেন্দু, এই জায়গাটা আমরা নির্বাচন করেছিলাম। অলৌকিককে আমরা বিশ্বাসযোগ্য করেছিলাম। আত্মত্যাগের জন্য এসেছিলাম এখানে। এই মসজিদটার মতোই গড়ে উঠেছিল রাতারাতি একটি অসম্পূর্ণ যুদ্ধ। শ্বেতসন্ত্রাসের সেই যুগ আজ কারও মনে নেই। প্রজা-উৎপীড়ক কালা-কানুন কারও মনে নেই। আমাদের বাক-স্বাধীনতা ছিল না। ভূ-ভারত সেদিন কষাইখানায় পরিণত হয়েছিল।

শুভেন্দু বলল— কিন্তু তোমার এই আর্তনাদ কে শুনবে? অতীতের কানে এই সব ত্যাগের মহিমা জপ করছে হে। তুমি বুঝে দ্যাখো এটা অস্ত্রগার নয়, এ একটা রুরাল লুম্পেন গান-ইন্ডাস্ট্রি, স্মলস্কেল মাস্কেট-কারখানা। এই দিয়ে পঞ্চায়েত ইলেকশনে এ বছর বুথ দখল করা হবে। তোমার মাথার মধ্যে যেমন রয়েছে আরবান কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, মাস্টারের মধ্যে রয়েছে তেমনি মজুদ একটি রুরাল মাস্কেট-ইন্ডাস্ট্রি। তুমি এখানে এসে সবই গুলিয়ে ফেললে। স্মৃতির এত বড় বিপর্যয় কারও হয় না। এই বন্দুকটাই যে তোমার, তা কী করে বুঝছ, এর পাশে শুয়েছিল অগুনতি গ্রাম্য দুর্বৃত্ত এবং তাদের মাস্কেট। এই মাস্কেটগুলো এক একটা মানুষ হবে।

কৃষ্ণ অবাক গলায় বলল— এরা মানুষ। অস্ত্রগুলো মানুষ?

শুভেন্দু বলল— হ্যাঁ। এখানে এখন বন্দুকের পাশে মাস্কেট। পুলিশ-মিলিটারিরর পাশে মানুষ ঘুমায়। মাস্কেট মানে মানুষ থ্রি নট থ্রি মানে যেমন পুলিশ-মিলিটারি। পুলিশ হল লুম্পেনের ভাই। থানা হয় গ্রাম্য লুম্পেনের বৈঠকখানা। গ্রাম এখন শকুনের খাদ্য হয়ে গেছে। গ্রাম হল শুধুমাত্র কাকের চিৎকার।

কৃষ্ণ বলল— এ বন্দুক তবু আমার। দ্যাখো, এই বন্দুকের মেকিং ইয়ার ১৯৭৬। এর গায়ে তখনকার সময়ের পুলিশ-ইউনিটের নাম পর্যন্ত উল্লেখ আছে। এতে ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানির নাম আছে। এ হল ইমারজেন্সি গান, এ দিয়ে একটি রাষ্ট্র যুবক হত্যা করত। এ জিনিস আমি চিনব না, হতে পারে না।

শুভেন্দু বলল— বেশ। কিন্তু নিয়ে যাবে কীভাবে?

কৃষ্ণ বলল— ধীরুবাবুদের লরি যাবে মাঝরাতে। আমি লরির খালাসিকে পটাব। টাকা দেব। দাঁড়াও দেখি, উর্বী আমাকে কত টাকা দিয়েছে।

শুভেন্দু বলল— থাক। পরে দেখো।

কৃষ্ণ বলল— না, তা কেন। এখনই দেখতে হবে। কত টাকা আছে না আছে, না বুঝে খালাসিকে প্রস্তাব দেব কী করে! ভালই হল উর্বী, তুমি তবু তোমার টিউশনের জমানো টাকা এভাবে হাতে তুলে দিলে।

BanglaBook.org

শুভেন্দু খামের মুখটা হালকা এবং সরু করে ছিঁড়ল। ভিতর থেকে বেরিয়ে এল অদ্ভুত তিনটি জিনিস। একশো টাকার পাঁচটা নোট। একটি সাদা কাগজে লেখা ভাঁজ করা উর্বীর চিঠি এবং অসংখ্য ছেঁড়া টুকরো কাগজ। কাগজের টুকরোগুলো মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ল। খুব সহজেই কৃষ্ণ বুঝতে পারল, কোনও একটা লিখিত পত্রকে এভাবে ছেঁড়া হয়েছে। ছেঁড়া টুকরো অংশে কৃষ্ণেরই হস্তান্তর চিনতে পারে শুভেন্দু।

টুকরোগুলোর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখে কৃষ্ণ উর্বীর চিঠিটা ভাঁজ খুলে চোখের সামনে মেলে ধরল।

স্যার,

তোমার স্যারকে লেখা স্বীকারোক্তিমূলক চিঠিটা আমি এইভাবেই ছিঁড়ছি। পৃথিবী যেন আমাকে ক্ষমা করে। তুমি ফিরে এসো।

ইতি উর্বী।

আমি কেউ নই

প্রত্যেক নিরীহ নিরস্ত্র মানুষ জীবনের কোনও না কোনও মুহূর্তে একখানা গুপ্ত অস্ত্রের অভাব বোধ করে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই রয়েছে একজন সুপ্ত সন্ত্রাসবাদী। মানুষের বিবেকের একাংশ সব সময়ই সশস্ত্র। যারা অস্ত্র বুকে করে আত্মত্যাগ করে, মানুষের জন্য সেই তারা সশস্ত্র বিবেককেই বহন করেছে কোনও এক নবগ্রামের দিকে। নিরস্ত্র বিবেক আসলে একটি নিস্তরঙ্গ নিদ্রাবিভূত মাংসপিণ্ড। দাবানো মানুষ অস্ত্র হাতে করেই জাগে। অহিংসার অস্ত্রও শেষ পর্যন্ত রক্তাক্ত না হয়ে যায় না। অস্ত্রের হাত বদল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা তার চেহারা বদল করে নেয়, অস্ত্রই ক্ষমতার উৎস শেষ পর্যন্ত। কোনও সভ্যতা কখনও অহিংসার দ্বারা নির্মিত হয়নি। গণতন্ত্র একটি চমৎকার সভ্যতা, কিন্তু তা-ও এসেছে রক্তের পথ ধরে এবং অবশেষে তারই গর্ভে জন্ম নিয়েছে দুর্বৃত্ততন্ত্র, সে মানুষের হাতে অস্ত্র দেয় না, দেয় শয়তানের হাতে।

ধাতুবিষ সভ্যতার শেষ বিলয়ভূমি, নগর থেকেই সভ্যতার পতন শুরু। সেই বিষের শেকলে বাঁধা হবে গ্রামের ওমরদের, শহরের কৃষ্ণদের হিংসার প্রলম্ব ছায়ায় ঘেরা হবে সমস্ত সমাজ। ধর্ষক এবং দূষকের হাতে তুলে দেওয়া হবে সভ্যতার রথের রশি।

পারমাণবিক বোমা নিয়ে খেলা করবে হিংস্র রাষ্ট্রগুলি, গ্রাম খেলা করবে মাস্কেটে মাস্কেটে, গুপ্ত বোমায়, নগরের সব সোপপিট উপচে পড়বে বিষস্রাবের ধোঁয়ায়। পৃথিবীর করুণার কাব্য গাভিগুলি হবে বিষাক্ত। সাধের গ্রহ এই পৃথিবী একদিন আশ্চর্য গরলদ্রবে গ্যাসে মিলিয়ে যাবে। তখনও কি তোমার অপরিজ্ঞাত পাপকে বুঝে উঠতে পারবে না সত্যসনাতন পির ?

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল কৃষ্ণ। আকাশে একখণ্ড মেঘ এল সূর্যের মুখে। কৃষ্ণের মুখে এসে পড়ল ঘুমন্ত ছায়া।

BanglaBook.org

ঘুমের মধ্যেই হঠাৎ এক সময় এক গোরুর ডাক শুনতে পায় কৃষ্ণ। স্বপ্নে কেউ ডাকছে কি না, নাকি বাস্তবে, স্থির করতে পারে না। ঘুম ভেঙে গেছে। চোখ মেলে আকাশে চেয়ে থাকে শুভেন্দু। মেঘ এখনও সূর্যের মুখ থেকে নড়েনি, বরং তা আরও গাঢ় এবং প্রশস্ত হয়েছে।

মেঝেয় উঠে বসে কৃষ্ণ। আবার গোরুর ডাক কানে আসে। সচকিত হয়ে ওঠে এবং দ্রুত দোলনা-সমাধির উপর বন্দুকটা রেখে দেয় শুভেন্দু। শুইয়ে দেয়। ফোঁকর গলে বাইরে চলে আসে। বেরিয়েই সে হতবাক বিস্ময়ে যা দেখে, তার কোনও তুলনা নেই। মসজিদের গা ঘেঁষে তড়বড় করে লাফাচ্ছে একটি শুচিস্মিতার হাসির মতো পবিত্র সাদা বকনা। মেঘের বাইরে চলে আসে সূর্য, এখন বিকেলের আলো খেলে উঠছে বকনার শরীরে। কী কালো চোখ, পৃথিবীর সমস্ত সরল বিশ্বাস অঞ্জন মেখে দিয়েছে বকনার চোখে, কী শান্তির ছায়া ঘনিয়ে উঠেছে চোখ দু'টিতে।

একবার স্পর্শ করতে সাধ হয় কৃষ্ণের। হাত বাড়ায় সে। লাফিয়ে চলে যায় বকনাটা খানিক তফাতে। কৃষ্ণ এগোয়, হাত বাড়ায়। তখনই আবার গোরুর মাতৃধ্বনি সামনের ওই দিক থেকে কানে আসে। চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে কৃষ্ণ। ঘাসের আড়াল সত্ত্বেও একটা মানুষের অস্তিত্ব রাস্তায় দেখা যায়। তাকেও নিশ্চয় দেখেছে লোকটা।

বকনাটা আরও লাফাতে লাফাতে ঘাসের মধ্যে পড়ে যায় এবং উঠে দাঁড়ায়। অতঃপর রাস্তারই দিকে ছুট লাগায়। পিছুপিছু ছুটে আসে কৃষ্ণ। মুখে চুকচুক শব্দ করে আসগার বকনাটাকে ধরে ফেলে। তার পরনে হোমগার্ডের পোশাক।

কৃষ্ণকে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয় আসগার। বিস্ময়ের ঘোর অনেকক্ষণ কাটতে চায় না। তারপর চিনতে পারে। আসগার ওমরের চেয়ে ক'বছরের ছোট মনে পড়ল না। বিস্ময়মাখা গলাতেই আসগার মন্তব্য করে— আপনি কৃষ্ণদা! পুরনো জায়গায় ঢুকেছিলেন? কী দেখলেন? কখন এসেছেন? মাস্টারের সঙ্গে দেখা হয়েছে? কী আশ্চর্য! আসুন।

বকনার গলা ধরে সামনে সামনে এগিয়ে চলল আসগার। বকুলতলায় ফিরে এল কৃষ্ণ। ওমরের দোকান খুলে গেছে।

দোকানে ওমর নেই। একটা বাচ্চা মেয়ে বসে আছে। নিশ্চয় বকরের মেয়ে। হঠাৎ মনে হল, বকরের মেয়ে এতটুকুনই বা হবে কেন! কত বড় হয়েছে কে জানে! নিশ্চয় তার বিয়ে হয়ে গেছে।

সহসা ঝড়ের স্মৃতির মতন নিজের বয়সের কথা ভাবে কৃষ্ণ। উর্বীর কাছে সে দু'-তিনটি বছর লুকিয়ে রাখে। বলে, সে হয়তো চল্লিশ। কিন্তু চল্লিশের সঙ্গে আরও অন্তত তিনটি বছর যোগ করা যায়। উর্বী বাইশ, হয়তো তেইশও হতে পারে। কী জানি, কত বয়েস হল, ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কৃষ্ণ। জেলে সাত-আট বছরের বেশি কেটেছে তার। কে জানে, কত সময় কেটে গেছে। শুধু বুঝতে পারে, সময় সরে গেছে, মাটি সরে গেছে। একটি অস্ত্রাগার পরিণত হয়েছে একটি কারখানায়। অস্ত্র হাত বদল করেছে।

BanglaBook.org

আসগার এল দোকানে। বাচ্চা মেয়েটিকে কোলে নিয়ে বলল— দাদা আসছে।

বলে চলে গেল আসগার। সন্ধ্যায় দোকানে কিছু বিক্রিবাটা চলে। ওমর সেকালে ওল্ড হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছিল কি না মনে পড়ছে না। হয়তো করেছিল। ওমর সম্বন্ধে নানা কথা ভাবতে থাকে কৃষ্ণ। সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়। ওমর এসে দোকানে বসে।

এক সময় হঠাৎই ওমর জানতে চায়— খাওয়া দাওয়া কিছু করেছেন?

সন্ধ্যায় ওমরের গলা কেমন বদলে নরম হয়ে এসেছে লক্ষ করে কৃষ্ণ অবাক হয়। মাথা নেড়ে কৃষ্ণ যে খেয়েছে জানিয়ে দেয়।

—কী খেয়েছেন?

—পাউরুটি-কলা।

—ভাত?

—রাতে হোটেলে খাব। ধীরুবাবুদের হোটেলে।

—শোবেন কোথায়?

—মাচায়।

বেশ বিস্মিত দৃষ্টিতে কৃষ্ণকে দণ্ডভর চেয়ে দেখল ওমর। এই প্রথম ওমরের মনে হল, মানুষটা বাস্তবিকই অসুস্থ। মাথার চুল সাদা। মাঝে মাঝে কাপড়ের থলে থেকে চশমা বার করে নাকে চড়াচ্ছে এবং সেটা কিছুক্ষণ চোখে রেখে খুলে নিয়ে খাপে ঢুকিয়ে থলেয় চালান করে দিচ্ছে। পুরো পাগলের লক্ষণ, আপনমনে হাসছেও মানুষটা।

কৃষ্ণের হাতের মুঠোয় একটা কীসের ছিপি। সেটি কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল। এইভাবে কে ছিপি সংগ্রহ করে রাখে, পাগল ছাড়া! ব্যাগের ভিতর থেকে একটি সাদা কাগজ বার করে ভাঁজ খুলে কী যেন বিড়বিড় করে পড়ছে অথবা মুখস্থ করছে।

কৃষ্ণ আপন মনে বলল—ফোর সেভেন সেভেন টু থ্রি ফোর সিক্স। এস টি ডি নম্বর পর্যন্ত আছে। এ নিশ্চয় ছোটমামার নম্বর।

ওমর বলল—ধীরুবাবুদের গদিতে গিয়ে ফোন করতে পারেন।

—তাহলে করে আসি। বলে মাচা থেকে নেমে পড়ে কিছু দূর হেঁটে গিয়ে ফিরে আসে।

—গেলেন না?

—না। দুনিয়ায় এত কমিউনিকেশন বেড়ে গেছে ওমর। পুলিশ-মিলিটারির হাতের তালুর উপর গোটা দেশকে বসানো হয়েছে। কোথাও লুকোনোর জায়গা নেই। গেরিলাযুদ্ধ আর হবে না পৃথিবীতে। লং মার্চ হবে না। আমি সহজেই ধরা পড়ে যাব। ইস্, কী করলাম আমি! এভাবে চলে এলাম কেন! বলে দু'হাতে কৃষ্ণ মুখ ঢাকে।

ওমর এবার স্পষ্ট বুঝতে পারে, কৃষ্ণ মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে, মাঝে মাঝে স্মৃতির মধ্যে চলে গিয়ে কথা বলছে। মানুষটার জন্য মায়াই হচ্ছিল ওমরের।

—আচ্ছা, তোমাদের এখানে মাছি কেমন। লাশের উপর বসে? দুম করে বলে

BanglaBook.org

উঠল কৃষ্ণ।

মাচায় বসা কে একজন কৃষ্ণের ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলে বলল—লাশে মাছি বসবে না, তাই কি হয় দাদা!

—না, তাই বলছি। বলল কৃষ্ণ।

চারখানা মাথার কাঁটা বেচল ওমর। দাম নিয়ে ক্ষুদ্র কাঠের বাক্সে ফেলে সশব্দে বাক্স বন্ধ করে কৃষ্ণের দিকে চোখ তুলে বলল—আবু বকরের লাশের উপর মাছি বসেছিল কৃষ্ণদা। রাতমাছি। আপনের চোখে পড়ে নাই?

এবার রেগে উঠে কৃষ্ণ বলল—আমার সব চোখে পড়ে ওমর শাহ্। সমস্ত আমি দেখতে পাই। আমি অস্ত্রাগারটা দেখে এলাম।

—চুপ করুন। কথা বলবেন না। যান, বাড়িতে ফোন করে আসুন। এখানে সর্বক্ষণ মাছি ঘোরে। ফেউ লাগে। ধমক দিয়ে উঠল ওমর।

-আমি ধরা পড়ে যাব বলছ। বলে ওঠে পাগলের হাসি।

—ধরা তো দিতেই এসেছেন! বলে মাস্টার খদ্দেরের দিকে মন দেয়।

মাচার লোকেরা হা হা করে হেসে ওঠে। কে একজন বলে—তোমার কাছে জোটেও ভাল মাস্টার! শিক্ষিত পাগল। কোথাকার হে?

মাচা থেকে ঝপ করে নেমে পড়ে শুভেন্দু। হন হন করে ধীরুবাবুদের গদির দিকে ছুটে যায়। তারপর কোথায় কোথায় ঘুরতে থাকে। একটি ভয়ানক কালো রঙের গাছের তলায় একলা দাঁড়িয়ে গাছটাকেই উদ্দেশ করে কৃষ্ণ বলতে থাকে— আমাকে এরা ঠাট্টা করছে উর্বী। মাছি মানে যে পুলিশ, তা কি আমি জানি না! ফেউ লাগা কাকে বলে জানি না ভাবছে। আমি ধরা দিতে কেন আসব উর্বী! তুমি আমাকে ফিরে যেতে বলেছ, কিন্তু খালি হাতে তো বলনি!

মাঝ রাতের আগেই পাকা ব্যবস্থা করে ফেলে কৃষ্ণ। লরির খালাসির সঙ্গে তার কথা হয়ে যায়। টাকাও দেয়। খালাসি তাকে বলেছে, চিন্তা করবেন না।

দোকান বন্ধ করে দিচ্ছিল ওমর। এমন সময় তার পিছনে এসে দাঁড়াল কৃষ্ণ। বলল—সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছি মাস্টার।

—কীসের ব্যবস্থা! বলে পিছনে ঘাড় ফেরাল ওমর। দোকানের শেকলে তালা ঝুলিয়ে দিল।

—আমার বন্দুকটা আমার সঙ্গেই যাচ্ছে।

— আপনের বন্দুক মানে! শুনুন, আপনি যেখানে ঢুকেছিলেন, আপনি চলে যাওয়ার পর সেখানকার সব অস্ত্র পার্টি তুলে নেয়। আপনি পালিয়ে গেলেন, বকরের লাশ পড়ে রইল উঠোনে। আমিও সেই রাতে গা ঢাকা দিলাম। বছর খানেক আমিও আর বকুলতলায় আসিনি। সাতাত্তরে ভোট হয়ে গেল, তারপর ফিরে এলাম। ওই মসজিদে তারপর কেউ আর ঢোকেনি, অমনিই পড়ে আছে।

— ওখানে অনেক অস্ত্র মজুদ দেখলাম। বোধহয় মাস্কেট।

— কী বলছেন!

— আমাকে পাগল মনে কোরো না ওমর। আমি পাগল নই।

BanglaBook.org

— আপনি আপনার বন্দুকটা আনতে পারবেন?

— নিশ্চয় পারব। কালই আমি ফিরে যাচ্ছি।

— কখন যাবেন?

— তুমি আমাকে সাহায্য করবে তো মাস্টার? দ্যাখো, আমি তোমার সম্মুখ দিয়ে ধীরুবাবুদের নাইট-ট্রিপ লরির পেছনে উঠব। তুমি বিদায় জানাবে। আমি যা ফেলে গিয়েছিলাম, তাই-ই আমি কাল নিয়ে যাব। তুমি দেখবে, আমি কাজটা করে গেলাম।

—ওটা তাহলে কারখানা। আপনার রক্ত উঠল না মুখ দিয়ে!

— কেন উঠবে। আগে কখনও উঠেছে?

—ফজরদেরও ওঠে না। তাহলে বলছেন, পুলিনদা, গুঞ্জদা, কেউই ওই অস্ত্র উঠিয়ে নেয়নি?

— না, সব অস্ত্র অন্য হাতে চলে গিয়েছে।

— বেশ তাহলে আপনি, আমার সঙ্গে চলুন। মাচায় থাকবেন না।

— তোমার বাড়ি যাব?

— হ্যাঁ, আসুন।

— না হে মাস্টার। আমি এখানেই থাকব। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না। তুমি যাও। বলে কৃষ্ণ মাচায় উঠে শুয়ে পড়ল।

কোনও কথা না বলে ওমর ঘাড় নিচু করে হেঁটে চলে গেল বাড়ির দিকে।

তারপর শুরু হল কৃষ্ণের নিশীথ-অভিযান। ধীরুবাবুদের লরির পিছনে কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে উঠে পড়ল কৃষ্ণ। রাত্রি একটা নাগাদ গাড়ি ছাড়ছে। আকাশে মেঘ। আকাশের তারারা লুপ্ত, চাঁদ নেই। বাতাসে গাঢ় অন্ধকার।

কৃষ্ণ গাড়ির ছাদের উপর চড়ে বসেছে। শরীরের পাশে শুইয়ে রেখেছে বন্দুকটাকে। নীচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে ওমর।

—শুনছেন কৃষ্ণদা? সাবধানে যাবেন। বেশি ওঠানামা করবেন না। আজ পাহাড়পুরে চার-চারটে লাশ পড়েছে, পুলিশের জিপ ঘোরাফেরা করছে। গাড়ি ছাড়ার আগের মুহূর্তে ওমর শাহ্ বলে উঠল।

গাড়ির মাথায় চড়ে কৃষ্ণের মনে হচ্ছিল যেন সে উদ্ধত কোনও মিনারে বসে পৃথিবীর হিংস্র তমিস্রাকে প্রত্যক্ষ করছে। অতীতের কোনও গূঢ় ইতিহাসের মঞ্চে সে একজন অভিনেতা।

সহসা নদীর দিক থেকে একটি পুলিশের জিপকে উঠে আসতে দেখা যায়। তীব্র টর্চের ছড়ানো আলো লরির মাথায় এসে লেগে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে যায়। তারপর নিবে যায়।

কৃষ্ণ লক্ষ করে জিপটা প্রধান রাস্তায় পড়ে একটি প্রগাঢ় ছায়ায় গাছের তলায় দাঁড়িয়ে পড়ল। তার দু'টি চোখ নিবে শান্ত হয়ে গেল। লরিতে এসে ড্রাইভার উঠে পড়েছে। কৃষ্ণের বুকটা ঢিবঢিব করে ওঠে। গাড়ি ছাড়তে দেরি কেন করছে?

হঠাৎ চড়া গলায় ডাক শোনা যায়।—'ওমর শাহ্!'

ওমর অন্ধকারে জিপের দিকে ছুটে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই জিপের চোখ দু'টি

BanglaBook.org

জ্বলে ওঠে। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে সার্চ লাইটের মতো মস্ত পুলিশি টর্চ।

লরি গর্জে উঠে দেহ কাঁপিয়ে চলতে শুরু করে। পিছুপিছু চলে আসতে থাকে জিপটা।

লরি ধীরে ধীরে যাচ্ছে, জিপটারও কোনও তাড়া নেই। চক-ইসলামপুরে এসে লরিটা কিছুক্ষণের জন্য থামে। জিপটাও থেমে যায়।

টর্চের আলো কৃষ্ণের মুখের উপর সরাসরি পড়ল। লরির পিছনের রডের উপর উঠে দাঁড়িয়ে খাঁকি পোশাকের পুলিশ গম্ভীর গলায় বলে উঠল— নেমে এসো হীরালাল!

কৃষ্ণ চমকে উঠল। স্বল্পস্ফুট স্বরে বলল—আমি হীরালাল নই স্যার!

—বেশ, তাহলে তুমি খায়রু পাঠান, গঙ্গাপ্রসাদী? তুমি যেই হও, নেমে এসো। সঙ্গে যা যা আছে, নাও। শোনো, কেরদানি করবে না। বন্দুক তাক করা আছে। না, তুমি হাত তোলো। হ্যান্ডস আপ। যা আছে, হুডের উপর পড়ে থাক। তুমি নেমে এসো।

দু'হাত আকাশে তুলে যেন আকাশেই মাথা ঠেকিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে কৃষ্ণ। তারপরই তার মাথার মধ্যে বিদ্যুচ্চমকের মতো কী একটা গ্যাসীয় পদার্থ বিস্ফোরিত হয়। সে তার গলার সুউচ্চ স্বর আকাশে ঠেলে দিয়ে পুরো দস্তুর পাগলের মতো হাহা করে হেসে ওঠে।

হাসতে হাসতে কৃষ্ণ চেঁচিয়ে ওঠে—আমি হীরালাল নই স্যার। আমি খায়রু পাঠান নই। আমি ইমাম মেহেদি।

—ওহ্, তুমি মেহেদি সেখ? বিচ্ছেদী সেখের ভাইপো? সাকিন মোল্লাডাঙ্গা, হিকমপুর, চাঁচোরে কারখানা ছিল তোমার? অল রাইট, নামো নামো। ভাল ছেলে, নেমে এসো।

—টর্চ সরাও, চোখে লাগে। বলে পায়ের কাছের বন্দুকটা উঠিয়ে নেবার জন্য আকাশে তোলা হাত নামিয়ে ফেলে কৃষ্ণ। তাই দেখে আরও একজন পুলিশ অফিসার লরিতে লাফিয়ে উঠে পড়ে। লরির মেঝেয় বুটের আচমকা শব্দ হয়। কৃষ্ণের চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। সে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। বন্দুকটা নেওয়া হয় না। মাথার ভেতরে কঠিন রুগ্ণতা পাক দিয়ে ওঠে। শরীর তার কাঁপছে। মাথার মধ্যে কারখানা চলছে।

মধ্য রাত্রির মেঘলা আকাশে পুলিশ গুলি ছুঁড়ে দেয়। সেই শব্দ মহাশূন্যে প্রতিধ্বনির মতো মিলিয়ে যায়, তটস্থ অসহায় ভীত আত্মসমর্পিত ভঙ্গিতে আকাশে দু'হাত ফের তুলে ধরে শ্রীকৃষ্ণ। অতি তীব্র আলোয় তার মাথার চুলগুলি সম্পূর্ণ সাদা দেখায়, দু'টি চোখ বুজিয়ে ফেলে শুভেন্দু কাতর গলায় বলতে থাকে—আমি মেহেদি সেখ নই স্যার। খায়রু পাঠান নই স্যার। আমি হীরালাল নই। আমি কেউ নই। আমাকে ছেড়ে দিন। দেখুন, আমার কোনও ছায়া নেই। এত আলো আমি সহ্য করতে পারছি না। বলতে বলতে ডুকরে ওঠে রাত্রির আকাশ। ইতিহাসের মঞ্চে যবনিকা নেমে আসে। মেঘ ডাকে। বৃষ্টি শুরু হয়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG